মধ্যযুগের সাহিত্যে
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

আহমদ শরীফ

সময় প্রকাশন

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ
আহমদ শরীফ

সময়
সময় ২৩৩
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০০

প্রকাশক ॥ ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ ॥ কাইয়ুম চৌধুরী
কম্পোজ ॥ ওয়াটার ফ্লাওয়ার
২৮/এ, কাকরাইল (৩য় তলা), রুম নং-১২, ঢাকা
মুদ্রণ ॥ সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ঢাকা

শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহকে
এবং
আর যাঁরা সত্যকে, স্বদেশকে ও মানুষকে ভালোবাসেন
তাঁদেরকে

ভূমিকা

বাঙলাদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎ-এর প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে সম্ভবত ড. আহমদ শরীফ-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সকলের কাছে প্রিয় হওয়ার দূর্বলতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলেন। পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী ড. আহমদ শরীফ চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদন্ডী গ্রামে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সনে ঢাকায় প্রয়াত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সনে বাঙলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও ১৯৬৭ সনে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কলেজে অধ্যাপনার (১৯৪৫-৪৯) মধ্য দিয়ে পেশাগতজীবন শুরু। পরে এক বছরের কিছু বেশি সময় তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সহকারী হিসেবে থাকার পর ১৯৫০-এর শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগ দিয়ে একটানা ৩৪ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৮৩ সনে অধ্যাপক হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে তিনি বাঙলা বিভাগের চেয়ারম্যানসহ সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, শিক্ষকদের ক্লাবের সভাপতি ও কলা অনুষদের চারবার নির্বাচিত ডিন ছিলেন। সেই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম রূপকার ছিলেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রথম "কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক" পদে ১৯৮৪-১৯৮৬ পর্যন্ত নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

দেশ-কাল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথাগত সংস্কার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সবসময় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানুষের আর্থ-সমাজিক মুক্তিসহ সমাজতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। ভাববাদ, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের যৌগিক সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর চিন্তা চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণে, বক্তব্যে ও লেখনীতে। তাঁর রচিত একশতের অধিক গ্রন্থের প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। পঞ্চাশ দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন। দ্রোহী সমাজ পরিবর্তনকামীদের কাছে তার পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়, তাঁর রচিত পুস্তকরাশির মধ্যে বিচিত চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, বাঙলার সুফি-সাহিত্য, বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা নির্বাচিত প্রবন্ধ. প্রত্যয় ও প্রত্যাশা এবং বিশেষ করে দুখণ্ডে রচিত 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, পিতৃব্য, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর অনুপ্রেরণায় মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণা কর্ম তাঁকে কিংবদন্তী পণ্ডিতে পরিণত করেছে। উভয় বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অদ্যাবদি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বিশ্লেষাণাত্মক তথ্য-তত্ত্ব ও যুক্তি সমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন, যা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর গাঁথা হয়ে থাকবে। তিনি জীবৎকালে বেশ কিছু পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদকসহ পশ্চিম বঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সম্মান সূচক ডি লিট" ডিগ্রি পেয়েছিলেন।

মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার প্রাগ্রসর ড. আহমদ শরীফ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২), লেখক সংগ্রাম শিবির (১৯৭১), বাঙলাদেশ লেখক শিবির (১৯৭২), স্বদেশ চিন্তা সংঘ (১৯৮৩), সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি (১৯৮১), মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি (১৯৯২), সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘ (১৯৯৯) সহ অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনের সাথে জড়িত থাকাসহ উভয়বঙ্গে বহুবার সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

তাঁর বিশাল পুস্তকরাশির মধ্যে যেমন মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির কথা রয়েছে তেমনি তৎকালীন পাকিস্তানের বেড়াজাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খান-এর নেতৃত্বে ১৯৬২ সনে গঠিত "নিউক্লিয়াস"-এর সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৫ সনে রচিত "ইতিহাসের ধারায় বাঙালী" প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে "বাঙলাদেশ" এবং "আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। এছাড়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি দেশের সব ক্রান্তিলগ্নে কখনো এককভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে তা প্রশমনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

উপমহাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসামান্য পণ্ডিত, বিদ্রোহী, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, দার্শনিক, বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধির ও নির্মোহ চিন্তার ধারক ড. আহমদ শরীফকে ধর্মান্ধরা শাস্ত্র ও প্রথা বিরোধিতার কারণে "মুরতাদ" আখ্যায়িত করেছিলেন। কথা ও কর্মে অবিচল, অটল, দৃঢ় মনোভাবের নাস্তিক সবরকমের প্রথাসংস্কার শৃঙ্খল ছিন্ন করে ১৯৯৫ সনে লিপিবদ্ধ করা "অসিয়তনামা"-র মাধ্যমে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে গেছেন। অসিয়তনামায় উল্লেখ ছিল "চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্রাণ প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরের কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই তো বাঞ্ছনীয়।"

পরিশেষে বলতে হয় যে, বর্তমান গ্রন্থটি ১৯৭৭ সনে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম সংস্করণ বহু বছর পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আগ্রহী পাঠকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ও সর্বপরি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করা হল। পূর্বের ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের উৎসুক পাঠকদের মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করছি।

বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করার ব্যাপারে জনাব মাহমুদ করিম-এঁর উৎসাহ, এডভোকেট যাহেদ করিম স্বপন-এর উৎসাহ ও সহযোগিতা এবং সময় প্রকাশন-এর জনাব ফরিদ আহমেদ-এর একান্ত আগ্রহের জন্য গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে পৌছাতে পেরেছে। তাঁদের সবাইর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৮ আক্টোবর, ২০০০

নেহাল করিম
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন ধারা- ৯
বাঙলার মৌল ধর্ম- ৪৩
বাঙলায় সুফি প্রভাব- ৫১
বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ- ৬০
মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ- ৬৮
নীতিশাস্ত্রগ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ- ৮২
ক. সত্যকলি বিবাদসম্বাদ- ৮২
খ. নীতিশাস্ত্র বার্তা- ১১৩
গ. শরীয়তনামা- ১১৯
ঘ. তোহফা- ১৩৮
ঙ. বাঙলার সুফিসাহিত্য- ১৪৮
চ. সঙ্গীতশাস্ত্র- ১৬২

প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৬ শতক)- ১৬৭
ক. ইউসুফ জোলেখা- ১৬৭
খ. নবীবংশ- ১৭৭
গ. মনোহর মধুমালতী- ২১০
ঘ. লায়লী মজনু/ইমামবিজয়- ২১২
ঙ. গোরক্ষ বিজয়- ২২৫
চ. বিদ্যাসুন্দর/রসুল বিজয়/হানিফার দিগ্বিজয়- ২৩১
ছ. রসুল বিজয়- ২৩৩

প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৭ শতক)- ২৩৫
ক. সতী ময়না-লোর-চন্দ্রাণী- ২৩৫
খ. চন্দ্রাবতী- ২৪০
গ. পদ্মাবতী- ২৪৩
ঘ. সিকান্দার নামা- ২৬১
ঙ. সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামান- ২৬৫
চ. লালমতি-সয়ফুল মুলুক- ২৮২
ছ. জেবল মুলুক-শামারোখ- ২৯৯
জ. জেবল মুলুক-শামারোখ- ৩০১

প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৮ শতক)- ৩০৩

ক. গুলে বকাউলি- ৩০৩

খ. গদা-মালিকা সম্বাদ- ৩১৩

গ. গোপীচাঁদের সন্ন্যাস- ৩২১

ঘ. নসিয়ত নামা- ৩২৮

ঙ. ফকির গরীবুল্লাহর- ৩৩০

চ. বিবাহ মঙ্গল- ৩৩৩

ছ. তমিম গোলাল চতুর্থ ছিলাল- ৩৪১

জ. সত্যপীর- ৩৪২

ঝ. শমসের গাজীনামা- ৩৪৪

ঞ. তামাকুপুরাণ- ৩৪৪

উদ্ধৃতাংশের বিষয়পঞ্জি- ৩৫৩

সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন ধারা

এই সৌরজগৎ ও পৃথিবী কত লক্ষ কোটি বছরের পুরোনো তার সঠিক অনুমান সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় আট কোটি বছর আগে থেকেই অঙ্গ এবং মস্তিষ্ক একধারায় বিবর্তন শুরু করে। আর অন্তত পাঁচ-ছয় লাখ বছর আগে থেকেই আজকের মানুষের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। সেসব জটিল তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে জানা-বোঝা সহজ নয়, তাই শুনেও বিশ্বাস-বিস্ময়ের দ্বন্দ্ব ঘোচে না। তবে কিছুটা প্রমাণে এবং অনেকটা অনুমানে আজকের বিদ্বানেরা স্বীকার করেন যে মোটামুটি গত দশ হাজার বছরের বুনো, বর্বর ও ভদ্র মানুষের বিচ্ছিন্ন, কঙ্কালসার ও আনুমানিক একটা আবছা ইতিহাস খাড়া করা সম্ভব। যদিও আজকের মানুষের পূর্ণাঙ্গ পূর্বপুরুষের উদ্ভব ঘটেছে অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে।

তা ছাড়া বিজ্ঞানীরা গত দশ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের তত্ত্বও জ্ঞানগত করেছেন বলে দাবি করেন। বরফ বা তুষার-যুগ হিমবাহ-যুগ ঐ দশ লাখ বছরে অন্তত চারবার এসেছে। ফলে জীব-উদ্ভিদজীবনেও ঘটেছে শ্রেণীগত জন্ম-মৃত্যু-উন্মেষ-বিনাশ। গত দশ হাজার বছরের মানুষের জীবন-জীবিকারীতির ধারণাও আমাদের স্পষ্ট কিংবা নিশ্চিত নয়। তবে গত ছয়-সাত হাজার বছরের ভাঙা-ছেঁড়া, টুটা-ফাটা জীবন-জীবিকা-চিত্র নানা সূত্রে কিছু কিছু মিলেছে, এখনো মিলছে। তাতে বাস্তবের কাছাকাছি একটা সমাজচিত্র তথা রৈখিক নকশা তৈরি করা চলে। মানুষের জীবন, মনন ও জীবিকার আঞ্চলিক বিবর্তনধারা মোটামুটিভাবে জানবার-বুঝবার জন্যেই এর গুরুত্ব অশেষ।

জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের বিকাশ-বিস্তারধারায় তার ভাব-চিন্তা-কর্মের কতখানি তার প্রাণিসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রসূন, আর কতখানি তার মননলব্ধ তথা অর্জিত ও সৃষ্ট, তা পরখ করে দেখার জন্যেও স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশধারা অনুধাবন করা আবশ্যিক।

মানুষের পুরাতত্ত্ব জানতে হলে প্রকৃতিবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর উদ্‌ঘাটিত ও অনুমিত তত্ত্বেও আস্থা রেখে, ঐগুলো স্বীকার করে ও ভিত্তি করেই সন্ধানে, বিশ্লেষণে ও সমন্বয়ে এগুতে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়।

নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মনন-উৎকর্ষ জীবিকা-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। জীবিকা-পদ্ধতি আবার প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রসূন। আমরা জানি, দুনিয়ার সর্বত্র সে-প্রতিবেশ অভিন্ন নয়। উত্তর মেরুর বরফ-ঢাকা এলাকায় এস্কিমোরা যেমন আজও তুষার-যুগ অতিক্রম করতে পারে নি, তেমনি সৃষ্টিশীল

কিংবা গ্রহণকামীও নয় বলে সভ্যদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিম বুনোমানুষও দুর্লভ নয়। আফ্রিকা এবং এশিয়া-য়ুরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ছোট-বড় দ্বীপে বাস করেছে, তারাও উদ্ভাবন-আবিষ্কার-প্রয়াসের অভাবে কিংবা খাদ্যাভাব ও জনবৃদ্ধিপ্রসূত প্রয়োজন প্রেরণার অনুপস্থিতির ফলে আদিমানবের তথা পুরোপোলীয় যুগের জীবন-জীবিকা স্তরেই রয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রের মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-নিয়ন্ত্রিত জীবিকাপদ্ধতি-প্রসূত প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণবিধি এবং ঐহিক-পারত্রিক চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে। জীবিকা অর্জন সর্বদা ও সর্বত্র কখনো সহজ, সরল ও সুসাধ্য ছিল না। কেননা অজ্ঞ-আনাড়ি-অসহায় মানুষ তখন ছিল একান্তই প্রকৃতির আনুকূল্য-নির্ভর। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-শৈত্য-খরা-কম্পন ছাড়াও ছিল অপ্রতিরোধ্য শ্বাপদ-সরীসৃপ আর নিদানবিহীন লঘু-গুরু নানা রোগ। গা-পা যেমন ছিল নিরাবরণ, মন-মেজাজও তেমনি ছিল আত্মপ্রত্যয়বিহীন। এমন মানুষ ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রবণ হয়, আর বিশ্বাস-ভরসা রাখে ও বরাভয় খোঁজে অদৃশ্য অরিমিত্র দেবশক্তিতে। তার চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতির ও ব্যর্থতার এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির কিংবা বিকলতার অভিজ্ঞতা থেকেই এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের ও প্রভাবের ধারণা অর্জন করে সে। তখন থেকেই তার জীবন-জীবিকা ইহ-পরলোকে প্রসারিত। স্বায়ত্ত নয় বলেই জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্যের কামনা তাকে দৈবাশ্রিত হতে বাধ্য করেছে।

প্রাণী হিসেবে মানুষেরও কিছু সহজাত বুদ্ধি, নিরাপত্তা-প্রয়াস, জীবিকা-চেতনা ও জ্ঞাতিত্ববোধ ছিল অর্থাৎ প্রাণিসুলভ একটা জীবনোপায়বোধ ছিলই। কিন্তু তার আঙ্গিক সৌকর্যপ্রসূত অনন্যতা এবং অনন্য মননশক্তি তাকে একান্তই বৃত্তি-প্রবৃত্তি-নির্ভর প্রাণী রাখে নি। তার অনন্যতার কারণ ছয়টি—প্রত্যঙ্গের বিশিষ্টতা, মস্তিষ্কের বিশেষ বিকাশ-শক্তি, বিশেষ যৌথজীবন-প্রবণতা, বাকশক্তি, হাতিয়ার ব্যবহারের সামর্থ্য ও মননশক্তি। আসলে সবটাই তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপজাত। ফলে শীঘ্রই সে নিশ্চয়ই অস্পষ্ট-অবচেতন মনে আত্মশক্তির অনুভবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রকৃতিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার সমস্ত বিকাশ-বিস্তারের মূলে রয়েছে ঐ আত্মপ্রত্যয়প্রসূত দ্রোহ। তাই মানুষমাত্রই প্রকৃতি-দ্রোহী। আঙ্গিক সুষ্ঠুতা ও সৌকর্য তাকে দিয়েছে হাতিয়ার ব্যবহারের প্রবর্তনা। কাজেই হাতিয়ারবিরহী মানুষ কল্পনাতীত। হাতিয়ারবিহীন মনুষ্য-জীবিকা তাই আমাদের ধারণায় অসম্ভব। অতএব মানুষ বলতে সহাতিয়ার মানুষই বোঝায়। ফলে মানুষের ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতি-জিগীষু, যুধ্যমান, জয়শীল, হাতিয়ারস্রষ্টা এবং জীবিকার উৎকর্ষ ও প্রসারকামী মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা-বন্ধ ও পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর পথ অতিক্রমণের বহু বিচিত্র দীর্ঘ ইতিকথা। কাজেই শ্রম, হাতিয়ার ও মনন প্রয়োগে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন এবং আনুষঙ্গিকভাবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগমন তথা জীবনপ্রবাহে সার্বিক পরিস্রুতি আনয়নপ্রয়াসই মনুষ্যজীবনচর্যার ইতিবৃত্ত। আগেই বলেছি, নানা কারণে এ কারো পক্ষে হয়েছে সম্ভব, কারো কাছে রয়েছে আজও আয়ত্তাতীত। বিকাশের এক স্তরে মনুষ্য ইতিহাস ও সমস্যা সংহত হয়ে মুখ্যত জীবিকা-সম্পদ-প্রতীক বিনিময়মুদ্রার অধিকারে তারতম্যপ্রসূত শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়। এবং সে-মুহূর্ত থেকেই জীবিকা অর্জন ও জীবনধারণ পদ্ধতি জটা-জটিল হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তখন জীবন-জীবিকা দুঃসহ, দুর্বহ,

যন্ত্রণাময় হয়ে পড়ে। একালে দুনিয়াব্যাপী সেই যন্ত্রণামুক্তির উপায় উদ্ভাবনে, প্রয়াসে, সংগ্রামে, দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে-সংঘাতে মানুষ কখনো মত্ত, কখনো আসক্ত, কখনো-বা পর্যুদস্ত। জয়-পরাজয়ের আবর্তে কখনো আর্ত, কখনো আশ্বস্ত। প্রবহমান জীবনে যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সমাধান, বর্জন ও অর্জন, দ্বন্দ্ব ও মিলন, বিনাশ ও উন্মেষ চিরকাল এমনি দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান করবে। চলমান জীবনস্রোতে নতুন দিনে নতুন মানুষের নতুন পথের নতুন বাঁকে নতুন সমস্যা ও সম্পদ, যন্ত্রণা ও আনন্দ থাকবেই। কেননা চলমানতার এসব নিত্য ও চিরন্তন সঙ্গী।

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে যা-কিছু অভিব্যক্তি পায়, তার কিছুটা প্রাণিসুলভ সহজাত, আর কিছুটা মননলব্ধ তথা অর্জিত। এ দুটোর সংমিশ্রণে অবয়ব পায় মানুষের চরিত্র, অভিব্যক্ত হয় জীবনাচরণ। অনুশীলন-পরিশীলনের স্তরভেদে কোনো বিশেষ স্থানে ও কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আচার-আচরণে কখনো প্রাণিসুলভ স্থূল-অসংযত স্বভাব প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, কখনো-বা অর্জিত আচরণ প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কখনো অবিমিশ্র বা অনপেক্ষ কোনো আচরণ সম্ভব নয়। তাই আজকের সভ্যতম সংস্কৃতিবান মানুষেও আদিম মানুষের আচার-আচরণের ছিটেফোঁটা মেলে—কখনো আদিরূপে, কখনো-বা রূপান্তরে।

বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ব্যবহারিক-বৈষয়িক প্রয়োজনে ও মানসিক কারণে নানা স্থানের নানা গোত্রীয় মানুষের সম্পর্কজাত নানা পারস্পরিক প্রভাবে মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা বহুমুখী, বিচিত্রধর্মী ও দুর্লক্ষ্য জটিল হয়ে উঠেছে। কারা কাদের প্রভাবে কী পেয়েছে কিংবা কী হয়েছে, তা আজ নিঃসংশয়ে বলা-বোঝা অসম্ভব। তবু আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে হয় এবং সন্ধানে, নিদর্শনে, বিশ্লেষণে, প্রমাণে ও অনুমানে যা মেলে, তা দিয়েই মনোময় উত্তর তৈরি করে আমাদের কৌতূহল মিটাই এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো কোনো মানবিক সমস্যার মূলানুসন্ধানে, কারণ-করণ নিরূপণে ও সমাধানচিন্তায় সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই।

জগৎ ও জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যেমন নানা তথ্য উদঘাটন ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে বিভিন্ন পদার্থের ও জীব-উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিকাশের নানা স্তরবিন্যাস করেছেন, তেমনি নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও মানুষের ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের নানা স্তর আবিষ্কার ও অনুমান করেছেন। সাধারণভাবে বন্য, বর্বর ও ভব্যকালে ও শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত করে মনুষ্যজীবনপ্রবাহের ক্রমোন্নতি নিরূপণের চেষ্টা হলেও দীর্ঘকাল পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে কালিক স্তর ও হাতিয়ারের উপকরণ ও উপযোগ অনুসারে যুগবিভাগ করার স্বীকৃত রীতি-নীতিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাতিয়ারের উপকরণ অনুসারে হাতিয়ারবিহীন ফল-মূল-পাতাজীবী আদিম মানুষের যুগ, খাদ্য সংগ্রহে কাঠ-ঢিল-পাথরখণ্ড ব্যবহারকারী পুরোপোলীয় যুগ বা পুরোনো পাথর-যুগ, অস্ত্ররূপে ঘষা-মাজা পাথর প্রয়োগকারী নব্যপোলীয় বা নবপাথর যুগ, তামা আবিষ্কারের ও ব্যবহারের তাম্রযুগ, পিত্তল আবিষ্কারের ও ব্যবহারের পিত্তল বা ব্রোঞ্জ-যুগ, লৌহ আবিষ্কারের ও প্রয়োগের লৌহ-যুগ। এর মধ্যেও নানা বস্তুর আবিষ্ক্রিয়া কৌশলের উদ্ভাবন এবং বস্তুর ও কৌশলের উপযোগ সৃষ্টিভেদে ও ক্রমবিকাশে নানা উপস্তুর তৈরি হয়েছে। হাতিয়ার তথা যন্ত্র মানুষের আঙ্গিক শক্তির বহুল বিস্তৃতিতে ও সুনিপুণ, সুষ্ঠু, সুপ্রয়োগে অপরিমেয় সহায়তা দিয়েছে। আধুনিক বৈদ্যুতিক-আণবিক যন্ত্র সেই যন্ত্র বা হাতিয়ার আবিষ্কার-

উদ্ভাবনের প্রবণতা ও প্রয়াসেরই ক্রমপরিণত রূপ।

এই যন্ত্র-চর্চা কেবল অগ্নি-অন্ন, আসবাব-তৈজস, অস্ত্র-শস্ত্র, বস্ত্র-বর্ম, কাস্তে-কোদাল, জাল-জাহাজ নির্মাণে অবসিত হয় নি, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ও জল-বায়ুর গতিবিধি ও মেজাজ-মর্জি জানা-বোঝার প্রবর্তনাও দিয়েছে। এভাবে মানুষ আকাশ ও মাটির এবং এদের মধ্যেকার সমস্ত গুপ্ত ও ব্যক্ত পদার্থকেই কেজো সম্পদে পরিণত করার সাধনায় হয়েছে নিরত।

মানুষের ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত করেছে যেসব আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন সেসবের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ভাষা, আগুন, টাকা, লিপি, লোহা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও সম্পদ-প্রতীক বিনিময়-মুদ্রা। মানুষের জীবনপদ্ধতি আর প্রাকৃত রইল না, হল কৃত্রিম ও স্বসৃষ্ট।

কালপ্রবাহে ময়াটি-ক্ল্যান, ফ্রাটি-ট্রাইব, সম্প্রদায়-সমাজ, দেশ-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে জীবন-জীবিকার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে। সহজে কিংবা সরলভাবে নির্বিঘ্নে কিছুই হয় নি। কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আজও মানুষ ক্ল্যান স্তরেই রয়ে গেছে।

মননের ক্ষেত্রেও অনেক মানুষ আজও সর্বপ্রাণবাদের, জাদু-বিশ্বাসের, টোটেম-টেবু তত্ত্বের, প্রেত-সংস্কারের ও প্যাগান-বোধের নিগড়ে নিবদ্ধ। এভাবে পাথর-মাটি-দূর্বা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, কূর্ম-কুমির-মকর-হাঙর-মৎস্য ফুল-ফল-তরুলতা থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র এবং অদৃশ্য অনেক কল্পিত শক্তি মানুষের ভয়-ভরসার কারণরূপে পূজ্য ও আরাধ্য হয়েছে। পরে প্রমূর্ত প্রতিমা হয়ে কেবল মনে হয়, ঘরে-সংসারেও ঠাঁই পেয়েছে। এ বিচিত্র বিবর্তন-বিকাশ হতে সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। মননশক্তির বিকাশে, যুক্তি-বুদ্ধির ও রুচির উন্মেষে টোটেম পেয়েছে স্রষ্টার ও দেবতার মর্যাদা, সংস্কার উন্নীত হয়েছে শাস্ত্রে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ধ্রুব সত্যে। টোটেম-টেবু তত্ত্বের উদ্ভব হয়তো খাদ্য ও নিরাপত্তার অনুকূল ও প্রতিকূল চেতনাপ্রসূত।

প্রচলিত ধর্মের মধ্যে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম নানা কারণে বিশিষ্ট। দুনিয়ার আর আর ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তি-প্রবর্তিত ধর্ম, আর ব্রাহ্মণ্যধর্ম হচ্ছে বিবর্তিত ধর্ম। সুদীর্ঘকালের পরিসরে লোকহিতকামী বহু জ্ঞানী মনীষীর কালিক অনুভব,-প্রয়োজন-চেতনা, শ্রেয়োবোধ ও মননপ্রসূত তথ্য, তত্ত্ব, নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য-নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বুদ্ধি থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় এর স্বাভাবিক-উদ্ভব ও প্রসার। তাই এতে মনুষ্য-চেতনার ও আচারের আদিম রূপ যেমন মেলে, মনুষ্য-মননের সূক্ষ্মতম বিকাশ ও উচ্চতম বোধও তেমনি এতে দুর্লভ নয়। টোটেম যুগের কূর্ম-বহরা-অশ্ব-অশ্বতর, যক্ষ, কুকুর, রক্ষঃ, পেচক, গরুড়, হনুমান, সাপ, মকর, গজ, গরু, মহিষ, বিল্ব, অশ্বত্থ, তুলসী, শিলা প্রভৃতি দেবকল্প কিংবা দৈত্যকল্প জীব-উদ্ভিদ ও পদার্থ যেমন বধ্য কিংবা পূজ্য রয়েছে, রয়েছে টোটেম কিংবা টেবু হয়ে, তেমনি ঔপনিষদিক তত্ত্বচিন্তা এবং নিরীশ্বর দার্শনিক চেতনাও সমভাবে আদর-কদর পেয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে, সংহিতায়-পুরাণে যেসব ইতিবৃত্ত বিধৃত রয়েছে, সেগুলো দিয়েই ভারতীয় মানুষের বুনো-বর্বর-ভব্যস্তরে ক্রমোন্নয়নধারার ইতিকথা রচনা করা সম্ভব।

খাদ্য-সংগ্রাহক যাযাবর মানুষ, খাদ্যশিকারি যাযাবর মানুষ, পশুপালক যাযাবর মানুষ, কৃষিজীবী অর্ধ-যাযাবর মানুষ, কৃষি-শিল্পজীবী স্থায়ী বস্তির মানুষ, পণ্যবিনিময় স্তরের মানুষ, মুদ্রাবিনিময় স্তরের নাগরিক মানুষও-যে সর্বত্র সমান কুশলী, মননশীল কিংবা উন্নত সামাজিক ও সংস্কৃতিবান মানুষ ছিল, তা নয়— যেমন আজকের পৃথিবীর

বুনো কিংবা শহুরে মানুষ আজও সমস্তরের নয়। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে দেশ কাল ও মানুষভেদে তারতম্য থেকেই যায়। তবু মানুষের জীবনপ্রয়াস-যে অন্য প্রাণীর মতোই খাদ্যভিত্তিক তা মিথ্যা হয়ে যায় না। খাদ্যের আহরণে, সংরক্ষণে ও সুলভতায় নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাদান প্রয়াসেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়োজিত। এই প্রয়াসের মুখ্য ও গৌণ কারণ এবং ফলস্বরূপ এসেছে মানুষের আর আর আনুষঙ্গিক আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন যা ব্যবহারিক, বৈষয়িক কিংবা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। অতএব খাদ্য উৎপাদন-লক্ষ্যে শ্রম ও হাতিয়ার প্রয়োগই মানুষের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের মূল। খাদ্য-সংগ্রাহক ও শিকারি মানুষ খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানত না বলে উদার ছিল, উদরপূর্তির পর উদ্বৃত্ত খাদ্য অপরকে দিতে দ্বিধা করত না। কিন্তু পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষ সঙ্গত কারণেই সম্পদ-সচেতন ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তখন থেকেই বৈষম্যবীজ ও শ্রেণী-চেতনার অনির্দেশ্য ও নিরুদ্দিষ্ট উন্মেষ।

নৃবিজ্ঞানীরা যেমন মানুষের আঙ্গিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শ্রেণীনিরূপণ করেন, সমাজবিজ্ঞানীরা তেমনি মুখ্যত জীবনচর্যার মাপে মানুষের বিকাশধারা বুঝতে চান। নৃবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন চোখ-চুল-নাকে, মাথা-চোয়াল-কপালের গড়নে, আর আদিম জীবনাচরণ ও মননধারার নমুনায়। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য, উৎপাদন-বণ্টন, মন-মনন, প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির গঠন-বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণপ্রবণ। তবু নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রায় অভিন্ন। কেননা একটা ছেড়ে অন্যটা অচল। বলতে গেলে, এগুলো মানব-পরিচিতির একাধারে তিনটে দিক ও স্তরমাত্র এবং সব কয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামষ্টিক জীবনধারায় অভিব্যক্ত জীবনচর্যার স্বরূপ নিরূপণ।

ব্যক্তি হিসেবেও মানুষের জৈবিক, নৈতিক, বৃত্তিক, বৌদ্ধিক, শাস্ত্রিক ও শ্রেণিক বা সামাজিক আচরণ তার বলনে-চাহনে-চলনে কিংবা ক্রীড়ায়-কর্মে-ভঙ্গিতে, হাসি-ঠাট্টায়-ক্রোধে-ক্ষোভে, দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-সেবায়-সমবেদনায়, ঈর্ষায়-অসূয়ায়, লিপ্সায়-নিষ্ঠুরতায় নিত্য প্রকাশমান। ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি, সেই সামষ্টিক আচরণে একটা সমাজসত্তার বা জাতিসত্তার সামান্যীকৃত আচরণ বা অভিব্যক্তি নিরূপণই নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের সন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য।

মানুষের মনন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় জন্মসূত্রে লব্ধ পারিবারিক-সামাজিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রভাবে। এদিক দিয়ে কোনো মানুষই স্বাধীন ও স্বসৃষ্ট নয়, হাজার অদৃশ্য 'বাগে' ও বাঁধনে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত। অতএব সামাজিক আচরণমাত্রই কৃত্রিম তথা অর্জিত, অনুশীলিত ও পরিস্রুত।

এই বহু ও বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, প্রথা-পদ্ধতি, দারু-টোনা-ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-মাদুলি-বাণ-উচাটন প্রভৃতির সম্ভাব্য উৎস নির্দেশ, তার আদি ও রূপান্তর নিরূপণ, টোটেম-টেবু-জাদুর জড় আবিষ্কার প্রভৃতি আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা প্রায় অসাধ্য বটে, তবে আমাদের তথ্য পরিবেশনা বিদ্বান-বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব নিরূপণের ও মূলানুসন্ধানের সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের এ প্রয়াস এবং প্রয়াসের সার্থকতাও এখানেই।

আমরা প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের শ্রেণী ভাগ করেছি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-

ঐতিহাসিক এই উপকরণগুলো প্রায় পাঁচশ বছরের পরিসরে রচিত গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। সে-যুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলের যন্ত্রগুলো আবিষ্কার-পূর্ব যুগে সমাজের বিবর্তনের গতি ছিল স্থবিরপ্রায় মন্থর। আবর্তনই ছিল স্বাভাবিক। পাঁচশ বছরেও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য। বরং সে-যুগে মনন-বিবর্তন যত সহজ ছিল, তত স্বাভাবিক ছিল না ব্যবহারিক- বৈষয়িক-জীবনধারার পরিবর্তন। তাই জন্ম-মৃত্যু শাসিত জীবনস্রোত তথা লোকপ্রবাহ ছিল, কিন্তু তেমন ক্রমবিবর্তন ছিল না— জীবনযাত্রার ধারায় কেবল আবর্তিত প্রবাহই ছিল স্বাভাবিক। জন্মসূত্রে পাওয়া সংস্কার ও ধর্মশাস্ত্রই-যে মানুষের মনন ও আচরণ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, তা কেউ অস্বীকার করে না। সেজন্যেই আমরা কেবল মুসলিম-রচিত বাংলাসাহিত্য থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছি যাতে দেশজ মুসলমানের শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণের একটা সার্বিক ও সামগ্রিক রূপ মেলে এই প্রত্যাশায়।

সঞ্চয়বুদ্ধিই যৌথজীবনের প্রবর্তনা দেয়। তাই মানুষ ছাড়াও উই-পিঁপড়ে-মৌমাছির মধ্যেও এ যৌথজীবন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি! এমনকি সন্তান জন্মানোর ও লালনের জন্যে নীড় নির্মাণ করতে হয় বলে কাক-কবুতর-বক-বাবুই প্রভৃতি অনেক পাখির মধ্যেও সাময়িক দাম্পত্য বা যৌথজীবনাসক্তি দেখতে পাই। কোনো কোনো পশু-পাখির মধ্যেও সর্বগণমান্য দলপতি বা গোষ্ঠীপতি, তথা পরিচালক বা নেতা, অগ্রগামী খাদ্যসন্ধানী দল এবং রক্ষক প্রহরী ও রক্ষাব্যূহের ব্যবস্থা দেখা যায়। সংগৃহীত খাদ্যবস্তু বাইরে সঞ্চয় করে রাখার সামর্থ্য নেই বলে ছানার জন্যে সংগৃহীত খাদ্য এরা উদরেই রাখে কিছুক্ষণ। গরিলা-শিম্পাঞ্জি-গিবনদের মধ্যেও রয়েছে দাম্পত্য। তা ছাড়া তোতা-কাক-শকুন-হাঁস-শিয়াল-বানর-ভেড়া-শূকর-হাতি-বেবুন-গিবন-গরিলা-শিম্পাঞ্জি-ওরাংওটাং প্রভৃতি বহু বহু প্রাণীও জ্ঞাতিত্ববোধে, যৌথজীবনে এবং একপ্রকারের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত। কাজেই প্রাণী হিসেবে হয়তো আদি মানুষও যূথবদ্ধ হয়েই থাকত। তবে তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও মননশক্তি তার যৌথজীবনে উৎকর্ষ ও বিকাশ দান করেছে দ্রুত। যূথবদ্ধ থাকতে হলে নেতা ও নীত ভাগে স্বীকৃতি দরকার, তার সঙ্গে আবশ্যিক সমস্বার্থে বা স্ব স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতার স্থায়ী অঙ্গীকার। যৌথজীবন এ না হলে চলতেই পারে না। এ বোধ থেকেই পালনীয় ও বর্জনীয় নিয়মনীতিস্বরূপ আইন এবং প্রয়োগকারী সংস্থা সরকারের ক্রমোদ্ভব। তাই আমরা আদিমানুষে পাই দৃঢ় ক্ল্যান-চেতনা, তা থেকে ক্রমান্বয়ে ফ্রাটি, ময়াটি ও ট্রাইব। এই ট্রাইব বা গোত্রীয় জীবন বন্য, বর্বর ও ভব্য জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তারপর সর্বপ্রাণ-টোটেম-টেবু-জাদু-প্যাগান তত্ত্ব-চেতনার ক্রমোন্নতিতে যখন বিবর্তিত বা প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় ধর্মে উত্তরণ ঘটল, তখন সহ ও সম-মতবাদীর দল বা সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এভাবেই পরে কালপ্রবাহে অগ্রসর মানুষের পরিচয় দেশ-গোত্র-জাত-বর্ণ-ধর্ম-বৃত্তি-শ্রেণী-সম্পদভিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। অনগ্রসর বুনো ও বিচ্ছিন্ন মানুষ আজও ক্ল্যান-ফ্রাটি ময়াটি-ট্রাইব স্তরে আটকে রয়েছে। কিন্তু আজকের অগ্রসর মানুষেও কিন্তু সেই কওম-চেতনা মুছে যায় নি, আদিরূপে কিংবা বিবর্তিত রূপে তা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক আচরণে কখনো কখনো প্রকট হয়েই প্রকাশ পায়।

জীবনচর্যার উৎস প্রতিবেশ-প্রভাবিত জীবিকা হলেও হাতিয়ার ও নৈপুণ্যের বিবর্তনধারায় তা জটিল পথে মুখ্য-গৌণ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ হয়ে পড়ায় কারণ-ক্রিয়ায়

বোধসূত্র লোকস্মৃতিতে গেছে হারিয়ে। তাই অনেক আচার-সংস্কারই হয়ে পড়েছে আপাত নিরুদ্দিষ্ট ও তাৎপর্যহীন। ফলে সম্পর্ক-স্বরূপ নির্ণয় হয়েছে দুঃসাধ্য। যেমন নাচ-গান-চিত্র—এগুলো ছিল আদিতে শিকার-সাফল্যের, অনুকূল রোদ-বৃষ্টি আবহসৃষ্টির ও বিপদমুক্তির প্রাকৃত বা দৈবিক আবহসৃষ্টির বাঞ্ছাপ্রসূত উদ্ভাবন। এখন নাচ-গান-চিত্র আমাদের মানসিক-নান্দনিক বিলাসক্রিয়া মাত্র।

যখন মানুষ খাদ্যরূপে ফল-মূল সংগ্রাহক মাত্র ছিল, যখন খাদ্য সংগ্রহকালে সঙ্গী-সহচর থাকলেও ঐ কার্যে সহযোগী-সহকারীর প্রয়োজনই ছিল না, তখনো কিন্তু জৈবিক কারণে নারী-পুরুষের মিলন কাম্য ছিল। তখনো হয়তো ব্যক্তিক বিবাদের কারণ ঘটত নারীসম্ভোগ নিয়ে—জীবজগতে আমরা যেমনটি দেখতে পাই। তা ছাড়া মনুষ্যস্মৃতিতে কামই বিপদ-বিবাদের উৎস। আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতি ঘটে কাম-চেতনা জাগার ফলেই। প্রথম পার্থিব বিবাদ ও নরহত্যার মূলে ছিল নারীর লাবণ্য। কাবিলের হাবিল-হত্যা দিয়েই শুরু ভ্রাতৃ-হননের তথা নরনিধনের। গ্রিক-হিন্দু পুরাণেও রয়েছে দেব-দানবের নারীকেন্দ্রীয় বিবাদ-বিগ্রহের কাহিনী। হোমার-বাল্মীকি-ব্যাসের কাব্যে নয় কেবল, দুনিয়ার রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথার মূলেও রয়েছে পুরুষ-ভোগ্য নারী।

কাজেই 'জমি'র আগে 'জরু'ই ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস। তারপর পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষের জীবনে বিবাদ-বিগ্রহের কারণ দাঁড়াল দুটো—জরু ও জমি। আরো অনেক পরে যুক্ত হল আরেকটি কারণ—তা হচ্ছে 'জওহর'।

সংস্কারমুক্ত স্বৈরিণী নারীর যে-কোনো পুরুষকে দেহ দানে হয়তো আপত্তি ছিল না, কিন্তু সন্তানধারণ ও লালনের জন্যে সে নিশ্চয়ই সহকারীর প্রয়োজন অনুভব করত। সেই আদি জৈব-জীবনে কে করবে কার সহায়তা! তাই বোধহয় সামাজিকভাবে নারী এক বিশেষ পুরুষের প্রতিই প্রীতি রাখত সাহায্য-সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশায়। আজকের মতো এত সচেতন কিংবা সূক্ষ্ম না হোক, নারী কিংবা পুরুষ একেবারে দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য না হলে সেদিনও হয়তো অবচেতন রুচিরও একটা প্রেরণা ছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তা হলে মানতেই হবে যে পুরুষ ও নারীমাত্রই অবিচারে একে অপরের কাম্যজন ছিল না। সেদিনও হয়তো পুরুষে পুরুষে বিরোধ-বিবাদের কারণ ঘটত যৌবনবতী স্বাস্থ্যসুন্দর নারীর রূপ-যৌবন উপভোগের দাবি নিয়েই। নারীও হয়তো ঝুঁকে পড়ত সবল-সুরূপ-পৌরষদৃপ্ত পুরুষের প্রতি। তাই আপ্তবাক্যে 'জরু ও জমি বীরভোগ্যা'।

অতএব নারী-সমস্যাই মনুষ্যজীবনের আদি ও গুরু সমস্যা—এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তাই নিয়ন্ত্রিত কামচর্চার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে আদিসমাজ। আদম-ইভের প্রতিবারের সন্তান হত বিপরীত লিঙ্গের যমজ। তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারত না। আদিম বুনো বর্বর সমাজে যখন ব্যক্তি-বিয়ে চালু হয় নি, তখন যে নির্বিচার সঙ্গমের রেওয়াজ চালু ছিল, তাতে দেখা যায় স্ব-ক্ল্যান সঙ্গম ছিল টেবু বা নিষিদ্ধ। দুই ভিন্ন ক্ল্যানের নারী-পুরুষে হত কামচর্চা—এরই নাম যৌথ বিয়ে। দ্রৌপদীকে পাঁচ ভাই বিয়ে করলেন বটে, কিন্তু বিরোধ-বিবাদ এড়ানোর জন্যেই ভাইদের মধ্যে পালাভাগ ছিল। আজও হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞাতি বিয়ে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ জাতক মতে রাম-সীতা ছিলেন ভাই-বোন। চার ভাইয়ের এক সুন্দরী বোন থাকলে ভ্রাতৃবিরোধ ও ভ্রাতৃহন্তা এড়ানো অসম্ভব দেখেই কেবল ভাই-বোনে নয়, বিশেষ বিশেষ নিকটাত্মীয় বিয়ে আদিসমাজেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবু আগে যাদের মধ্যে সঙ্গম-সম্পর্ক

হতে পারত, পরবর্তীকালে তা অনভিপ্রেত হলেও, আজও ঠাট্টা-মস্করার মধ্যে সে-সম্পর্ক-স্মৃতির রেশ মেলে। উনিশ শতকেও আরাকানে বর্মায় রাজা 'মা' ছাড়া সব পিতৃপত্নীর সম্ভোগ-অধিকার পেত উত্তরাধিকার সূত্রেই। কোনো কোনো বুনোমানুষ সসম্পত্তি বিধবা মামিকে পত্নীরূপে পায়। কোথাও কোথাও মামা-ভাগ্নী বিয়ে করতে পারে। অনেক সমাজেই নিজের পিতা-মাতার সন্তান ছাড়া, ভাই-বোন সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ইসলামে চৌদ্দ রকম সম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্বে বিয়ে নিষিদ্ধ। যখন মাতৃকেন্দ্রী ক্ল্যান ছিল তখনো হয়তো রানী মৌমাছির মতোই সঙ্গমের কিছু প্রাকৃত বা উদ্ভাবিত বিধি-বিধানের বেড়ার বাধা ছিল। নানা কারণে মনে হয়, আদিমানুষের মধ্যেও কামচর্চা ছিল কোনোরকমের বিধি-নিয়ন্ত্রিত—তা গোত্রপতির নির্দেশেই হোক কিংবা জাদু-সংস্কারবশেই হোক। মানতেই হবে যে-সমাজে যেদিন ব্যক্তিক বিয়ে চালু হল, সেদিন থেকেই সে-সমাজে আধুনিক সংজ্ঞার পরিবার-পরিজনও গড়ে ওঠে। সভ্যতা-সংস্কৃতির পত্তন সে-মুহূর্ত থেকেই। যথার্থ আত্মীয়, আত্মীয়তা ও আত্মীয়-সমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তিক-বিয়ে ভিত্তি করেই। জরু নিয়ে নিত্য বিবাদের আশঙ্কা এভাবেই ঘুচল। কিন্তু জমি নিয়ে বিবাদ বৃদ্ধির কারণও বাড়ল।

ব্যক্তিক বিয়ে থেকেই সামাজিক স্বীকৃতির উদ্দেশ্যেই হয়তো বিয়ের উৎসব ও ভোজ চালু হয়। আর নারী যখন প্রবল পুরুষের ভোগ্যা, তখন রূপ-গুণ-যৌবনবতী নারীও বেচা-কেনার পণ্য হল। পণ আভরণ ও নামান্তরে বিক্রি কিংবা ভাড়ামূল্যই। এই দাম্পত্যলব্ধ সন্তানই নন্দন-নন্দিনী। কাজেই তেমন সন্তানের জন্মে আনন্দ-উৎসবের এবং কল্যাণে নানা আচার-সংস্কারের উদ্ভব। অতএব স্থায়ী দাম্পত্য মানবিক বৃত্তি-বিকাশের ও মানব-সমাজ-সংহতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও স্তর। দাম্পত্য-ভিত্তিক পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-কুটুম্বের পারস্পরিক প্রীতিপ্রসূত বিশ্বাস-ভরসা ও নির্ভরতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ব-চেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও আচার-আচরণকে মিলনমুখী ও কল্যাণধর্মী করতে সহায়তা করেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে এসবের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। অবাধ কামচর্চা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বলেই হয়তো অবৈধ কামচর্চা আজও গুরুতর পাপ, লজ্জা, নিন্দা ও শাস্তির বিষয়। বন্ধু-সখী মহলে এমনকি দাম্পত্যজীবনেও রতিক্রিয়ার আলোচনা অশ্লীল, অনভিপ্রেত ও লজ্জাকর।

ঘুমে-অচেতন মানুষ স্বপ্ন দেখে। তা থেকেই সে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে, দেহ ও চৈতন্য পৃথক সত্তা। তা ছাড়া স্বপ্নে মৃতমানুষকেও সে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পায়, সে-কায়াধারী মৃতমানুষ অশনে-বসনে-আসনে-কথায়-কাজে অবিকল জীবিত মানুষের মতো। এর থেকেই মানুষের ধারণা ও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে আত্মা নামে জীবচৈতন্য অবিনশ্বর-অমর। কাজেই আনুষঙ্গিকভাবে পরলোক-প্রেতলোক-আত্মালোক, দেবলোক, স্বর্গ-নরকলোক কল্পনা করা ও সেগুলোর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বিদেহী আত্মার অমরত্বে আস্থা রাখলে সে-সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা এড়ানো যায় না। পারলৌকিক দায়িত্ব-কর্তব্যও বর্তায় এবং তাতে দেহ-মনের কাজ বাড়ে। নিজের জন্যে তো বটেই, মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও কিছু করতে হয়। জীবিতমাত্রেই খাদ্য চায়, কাজেই জীবিত আত্মারও খাদ্য দরকার। এর জন্যে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি জীবিতের যাবতীয় আবশ্যিক বস্তুর ব্যবস্থা করতে হয়। আবার

আত্মা যেহেতু অমর এবং কায়াহীন আত্মার স্থিতি এখনো ধারণাতীত, সেহেতু মমি করেও দেহ রাখার ব্যবস্থা। মৃতের সৎকার, প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ, ভোজ, মমি, পিণ্ডি, জানাজা, জেয়ারত, পিতৃপুরুষ পূজা, প্রেত পূজা, শোকপ্রকাশ প্রভৃতি আচার-প্রথা-পদ্ধতি তাই স্বরূপে কিংবা রূপান্তরে আদিম এবং সর্বজনীন। শব কেউ কবর দেয়, কেউ পোড়ায়, কেউ শকুনকে বিলায়, কেউ ভাসায়। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত (১৬০,০০০ বছর আগে উদ্ভূত এবং ৪০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত) Neanderthalers জাতীয় আদিমানুষেরা পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর য়ূরোপে বাস করত। তাদের মধ্যে প্রাণিপূজা, জাদু ও মৃতের শাস্ত্রীয় সৎকারের রীতি চালু ছিল। শিকার-সহায় 'ভালুক' টোটেমরূপে অবলম্বন ছিল—পরে নব্যপোলীয় যুগের য়ূরোপে দেখি ষাঁড়, ইরাক-ইরান-মহেনজোদারোতেও পাই ষাঁড়। উত্তর ও পশ্চিম য়ূরোপে ও সাইবেরিয়ায় টোটেমরূপে পিতৃপুরুষ প্রতীক 'ভালুক' পূজার রেওয়াজ ছিল। স্মৃতিরক্ষার জন্যে চিতায়-কবরে সৌধ রচনাদি নানা ব্যবস্থা আজও অবিরল।

আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব ঐহিক জীবন থেকে কাল্পনিক পারত্রিক জীবন কখনো অধিক কাম্য হতে পারে না। তাই মৃত্যু ও মৃত দুই-ই বিনাশপ্রতীক ও ভীতিপ্রদ। ন্যায়-অন্যায়, সুকর্ম-দুষ্কর্ম, শাপ-বর ও পাপ-পুণ্য চেতনা ক্রমে সেই ভয় বৃদ্ধি করেছে। আগে থেকেই তো জগৎ ও জীবন-নিয়ন্ত্রী একটা বা একাধিক সার্বভৌম অদৃশ্য-অলৌকিক শক্তির ধারণা ছিলই, শাস্ত্রীয় যুগে তা তত্ত্ব-দর্শনের বিষয় হয়ে সুসমঞ্জস, সুসংহত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অমিত শক্তির আধার এবং দান-দয়া ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিকরূপে চিরন্তন স্থিতি পেল। কাজেই মানুষের জন্ম-জীবন-জীবিকা, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রভৃতির মালিক, নিয়ন্তা ও বিচারকরূপী স্রষ্টা বিধাতাও উপাস্য হলেন। তাঁকে বা তাঁদের এড়ানো সরানো চলে না বলেই তাঁর বা তাঁদের শাসন-লালন মানতেই হয়। তাই সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, লাভে-ক্ষতিতে আনুগত্য অবিচল রাখতে হয়—বিদ্রোহ কেবল বিপদ-যন্ত্রণাই বৃদ্ধি করবে—এ বিশ্বাস মানুষের জীবনে এত গভীর যে তার প্রভাবে কোনো আস্তিক মানুষই আত্মিক শক্তিতে আস্থা রেখে কোনো কাজেই সাফল্য সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। তাই আস্তিক মানুষ মাত্রেই দেবনির্ভর। ধর্মের মূল্যের, গুরুত্বের ও ধর্মে আনুগত্যের কারণ এ-ই। গোত্রীয় মানুষকে মতবাদভিত্তিক ঐক্য ও সংহতি দান করে ধর্মমত সেইদিন দুশমন ও দূরের মানুষ নিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও সম্প্রদায় গঠনের কারণ হয়েছিল এবং মনুষ্য-সভ্যতার ক্রমোন্নতি ত্বরান্বিত করেছিল। গোত্রীয় জীবনধারার অবসানের পরেও পশুপালন এবং কৃষিকার্য দুটোই সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে যৌথ প্রয়াস ও কর্মসাপেক্ষ ছিল। জীবিকা উৎপাদন ও বণ্টন যখন জনবৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক সমতা রক্ষায় ব্যর্থ হয় তখনই শক্তিবৈষম্য ও জীবিকা সম্পদে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকট হয়ে ওঠে। কায়িক শক্তিতে-বুদ্ধিতে-কৌশলে ও সম্পদে যে দুর্বল, সে-ই প্রবল দুর্জনের দৌরাত্ম্যের শিকার হল। জীবিকার জন্যেই বাহুবল, ধনবল, বুদ্ধিবল যার বা যাদের ছিল, তারাই অনন্যোপায় দুর্বলকে বশ বা দাস করতে পারল। দাসদের খাটিয়ে মালিকের পক্ষে তার পশুর বৃহৎ পাল পোষণ ও চাষের জমির সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভব হল। এমনি করে ধনী আরো ধনী ও গরিবরা দাসে পরিণত হচ্ছিল; পরিণামে তা-ই সামন্তসমাজের উদ্ভব ঘটাল। গোত্রীয় জীবনের অবসান-মুহূর্তে যদি বিনিময় প্রতীক মুদ্রা চালু থাকত, তা হলে হয়তো দাসপ্রথা এমন সর্বব্যাপী ও দীর্ঘস্থায়ী হত না। কারণ সে-ক্ষেত্রে এখনকার

মতো মুদ্রামূল্যেই মজুর মিলত।

ক্রমবিকাশের ধারায় যেখানে যেখানে জীবিকার সৃষ্টি ও অর্জনপদ্ধতি বৈচিত্র্য লাভ করেছিল এবং জীবনধারণে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যসামগ্রী বা বিলাস-ব্যসন বস্তু নব নব আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল; তখন সেই বহু ও বিচিত্র দ্রব্য ও পণ্য নির্মাণে, উৎপাদনে কিংবা অন্যপ্রকার উপযোগ সৃষ্টির কাজে বর্ধিত হারে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ আবশ্যিক হয়ে ওঠে অর্থাৎ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং ধোয়া-মোছা-কাটা ছাড়াও ঘর-ঘট, বাট-মাঠ-মন্দির নির্মাণ, পূজা-শিন্নি, পঠন-পাঠন, রোগ-নিদান-চিকিৎসা-শুশ্রূষা প্রভৃতি হাজারো রকম প্রাত্যহিক কর্তব্য ও কাজ দেখা দিচ্ছিল। তখন দায়িত্ব ও কর্মভাগ আবশ্যিক হল। ক্রমে উচ্চ-তুচ্ছ, লঘু-গুরু, শক্ত-সহজ, কুশল-অকুশল, প্রয়োজন-বিলাস ও ক্ষয়-অর্জন ভেদে শ্রমিকেরও ধন-মান-যশও গুরুত্বভেদ হল, এবং পরিণামে পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র ধর্মভেদে জাত-জন্ম-মান-বর্ণভেদ দেখা দিল। তাই দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র মানুষের সমাজে নানাপ্রকারের বৈষম্য-বিভেদ-বিরোধ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-পীড়ন-পোষণ-শাসন-শোষণ আজ অবধি রয়েছে, কেবল তা কোথাও গণমানবের অজ্ঞতা-অসহায়তার দরুন গুরু, কোথাও-বা নানা কারণে লঘু। সেটার আধুনিক নাম শ্রেণীদ্বন্দ্ব। সুবিধাভোগী ধনী-মানীরা স্ব-স্বার্থেই স্রষ্টা, শাস্ত্র ও সমাজের দোহাই দিয়ে সেই বৈষম্যকেই চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছে, এখনো চায়। ফলে যারা পীড়ক-শোষক তারাও যেমন এর মধ্যে অন্যায়-অবিচার দেখে না, যারা পীড়িত-শোষিত তারাও ঐ বঞ্চনা দুর্ভোগকে অদৃষ্ট বলেই মানে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এদের জীবন-মনন চিত্র স্বল্প কথায় সঠিক অভিব্যক্ত :

স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া, বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।...
ওই যে দাঁড়ায়ে নত শিরে
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চ'লে মন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে; নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

সাহিত্যও শিল্প—জীবন-শিল্প। জগৎ-পরিবেশে জীবিকা-সম্পৃক্ত এবং মনন ও অনুভবপুষ্ট জীবনের উদ্ভাস, প্রতিচ্ছবি কিংবা অনুকৃতিই সাহিত্য। অতএব সাহিত্য হচ্ছে জগৎ ও জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনানুকৃতি। জীবনে যা ঘটে, যা চাওয়ার ও পাওয়ার, যা সম্ভব ও সম্ভাব্য, যা প্রাপ্য ও প্রত্যাশার, যা অনভিপ্রেত ও পরিহারযোগ্য, তার সবটাই

পাই সাহিত্যে। তাই সুখ-দুঃখ-আনন্দ-যন্ত্রণা, সম্পদ-সমস্যা, স্নেহ-প্রীতি-প্রেম, ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসা, লোভ-ক্ষোভ-তেজ-তিতিক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা, রাগ-বিরাগ প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত জীবনের চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যকর্ম। জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনাচরণই তথা ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে জীবনের সার্বক্ষণিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। অন্য কথায়, মনুষ্যজীবনের অর্জিত স্বভাবের সার্বিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। তবু সূক্ষ্ম, পরিস্রুত ও সুন্দর-শোভন অভিব্যক্তিকেই আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলি। কাজেই সংস্কৃতি ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে প্রকটিত জীবনেরই লাবণ্য। এই তাৎপর্যে সাহিত্যও সংস্কৃতিরই প্রসূন। সাহিত্যেও সংস্কৃতিরই প্রকাশ। প্রাণধর্মের তাগিদেই জীবন সর্বক্ষণ প্রকাশ ও বিকাশপ্রবণ—নানা ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে জীবনের বাস্তব ও মানস অভিব্যক্তি ঘটছে। অর্থাৎ তার সৃষ্ট ভাব-জগৎ, তার আচারিক ব্যবহারিক জীবনাচরণপদ্ধতি এবং তার নির্মিত ও ব্যবহৃত বস্তু-জগৎ তার সংস্কৃতির নিদর্শন। অতএব জীবনধারণের ও উপভোগের প্রয়াসপ্রসূত মানবক্রিয়ামাত্রই সংস্কৃতি। তাই সামাজিক জীবনের আচার-ব্যবহার, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নীতি-আদর্শ, উৎসব-পার্বণ থেকে ব্যবহারিক জীবনের ঘর-ঘাট-হাট-বাট, তৈজস-আসবাব, অশন-বসন-আসন কিংবা মানবজীবনের দারু-চারু-কারুশিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ইতিহাস-দর্শন-গণিত-বিজ্ঞান সবটাই কোনো বিশেষ দেশ-কালের ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক, সার্বিক ও সামগ্রিক সংস্কৃতি এবং যুগপৎ সাংস্কৃতিক নিদর্শন—যাকে বলা চলে বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত। সবটাই চলমান জীবনে তার অনুভব, মনন ও ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের প্রসূন।

যাহোক, আমাদের সংস্কৃতির কোথাও মর্মে, কোথাও-বা অবয়বে আদিম সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও অনুকৃত সংস্কৃতির ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। ভাব-চিন্তাকৃতির যে-অংশ হিতকর ও গৌরবের তা-ই যেমন ঐতিহ্য বলে খ্যাত, তেমনি জীবনচর্যার যে-অংশ সুন্দর-শোভন ও কল্যাণকর তা-ই সংস্কৃতি, বাদবাকি কৃতি বা আচারমাত্র। এ তৌলে যাঁরা মাপেন তাঁদের কাছে জীবনচর্যার কিংবা জীবনযাত্রার সবটাই সংস্কৃতি নয়। তাঁদের সংজ্ঞায় নগরবিহীন সভ্যতাও নেই। আমাদের ধারণায় সংস্কৃতির উৎকর্ষে সভ্যতার উদ্ভব। সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসসম্ভূত অবদানপুষ্ট জীবনপদ্ধতির সার্বিক ও সামগ্রিক উত্তরাধিকারই সভ্যতা।

২

মধ্যযুগের মুসলিমরচিত বাঙলাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন আমরা এ-গ্রন্থে সংগ্রহ ও সংকলন করেছি। বিষয়ানুসারে গুচ্ছবদ্ধ করলে স্থান, কাল ও কবি গুরুত্ব হারাত, তাই সে চেষ্টা করি নি।

কোনো দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান অতি বড় জ্ঞানী-মনীষী গবেষকের পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। দেশে-কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ সমাজ-সদস্য হলেও মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-রুচি-আচরণের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা থাকেই এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে অনুকরণ করার প্রবণতা অন্য মানুষের সাধারণ স্বভাব। এতে অতি মন্থর গতিতে এবং অলক্ষ্যে সামাজিক আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি ও

প্রতিষ্ঠান বদলায়।

বহুমুখী মানস-শিকড় দিয়ে মানুষ আহরণ করে জীবনরস। তার মন-মননের পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ। কখন কোন্ বিশ্বাস, সংস্কার, আদর্শ বা অভিপ্রায়ের প্রেরণায় মানুষের কোন্ ভাব, চিন্তা অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া সমকালের সব পরিবেশ, ঘটনা ও আচার সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। মানস-গড়ন, রুচি, প্রবণতা, প্রয়োজন-বুদ্ধি প্রভৃতি থেকেই জাগে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা—তাই কেউ ক্রীড়া-জগতে, কেউ বাণিজ্য-জগতে, কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে মানস-বিচরণ করে; কেউ কৃষি-উৎপাদনে, কেউ শিল্প-উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামায়। কেউ সাহিত্যে, কেউ সঙ্গীতে, কেউ চিত্রকলায়, কেউ নৃত্যকলায়, কেউ সংস্কৃতিতে, কেউ নৃতত্ত্বে, কেউ সমাজতত্ত্বে, কেউ ধনবিদ্যায়, কেউ-বা বিজ্ঞানে, কেউ-বা দর্শনে, কেউ ইতিহাসে, কেউ গণিতে, কেউ জ্যোতির্বিদ্যায়, কেউ জীব-উদ্ভিদবিজ্ঞানে আগ্রহী। এজন্যেই কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তে, কোনো জীবনীগ্রন্থে, কোনো ইতিহাসগ্রন্থে কোনো দেশের বিশেষ স্থানের ও কালের জীবনযাত্রার, কর্ম ও নর্ম প্রবাহের, ধন-ধর্ম-আচার-আচরণ-সংস্কৃতির একটা সার্বিক বর্ণনা মেলে না। কেউ ধর্মের কথা, কেউ বাজারদরের কথা, কেউ খাদ্যবস্তু ও রান্নার কথা, কেউ খেলাধুলার কথা, কেউ তরুলতা-ফুল-ফল-মূলের কথা, কেউ পশু-পাখির বর্ণনা, কেউ উৎসব-পার্বণের কথা, কেউ শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বর্ণনা রেখে গেছেন বা রাখেন বটে, কিন্তু দেশকালগত সামষ্টিক তথা সামাজিক জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দান কোনো একক জ্ঞানী-মনীষী-পর্যটক, ঔপন্যাসিক, কাব্যকার বা ইতিবৃত্তকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আল্‌বেরুনী-আবুল ফজলরা তাই চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন।

জীবনের সর্বতোমুখী চেতনা কোনো একক মানুষের চিন্তা, কর্ম কিংবা আচরণে ধরা দেয় না। এ-যুগেও পরিবেশ কিংবা জীবনসচেতন কোনো মহৎ কথাশিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাজনীতিকের রচনায় সমকালীন জীবনের ও ঘটনার সব খবর মেলে না। মনের প্রবণতা অনুসারে তুচ্ছ ঘটনাও কারো কাছে গুরুত্ব পায়, আবার গুরুতর বিষয়ও পায় অবহেলা। তা ছাড়া দৃষ্টি আর বোধেও থাকে ভঙ্গি ও মাত্রাভেদ। জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে কেউ প্রত্যক্ষ করতেও পারে না। বিদ্যা-বুদ্ধি, বোধি-প্রজ্ঞা, বিশ্বাস-সংস্কার, আদর্শ-নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানাকিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি ও বোধ নিয়ন্ত্রিত। কেউ অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ নয়, সবারই রয়েছে রঙিন চশমা, আপেক্ষিক বোধ ও বিচারপদ্ধতি।

আমাদের আলোচিত পাঁচালি কাব্যগুলো মুখ্যত রাজপুত্র-রাজকন্যার কাহিনী। সে-সূত্রে উজির-কোটাল-সওদাগরের কথাও কিছু রয়েছে। ক্বচিৎ মালিনী-পরিচারিকার কথাও মেলে। আর অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে উপস্থিত রয়েছে দেও-দৈত্য-রাক্ষস, ক্বচিৎ সাপ-বাঘ-পাখি। কারণ, এ হচ্ছে সামন্তযুগের সাহিত্য। তখনো ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে কৌতূহল জাগে নি। মনোসমীক্ষণরীতি তখনো অজ্ঞাত। স্থূল চেতনায় আকাশচারিতাতেই চরম দার্শনিকতা ও কল্পনা-বিলাসিতা সীমিত। দেবলোক ছেড়ে সবেমাত্র মর্ত্যে নেমেছে মানবকল্পনা ও কৌতূহল। বাহ্য জাঁকই কৌতূহল জাগার আর কৌতূহল নিবৃত্তির অবলম্বন। গোত্রীয় ঐক্য, আঞ্চলিক সংগতি, ধর্মীয় একাত্মতা এবং রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দির ভিত্তিতে সমাজ রচিত এবং জীবন নিয়ন্ত্রিত। প্রবল দুরাত্মাই শাসন-শোষণ ও পোষণ-পেষণের মালিক।

তখন রাজা-শাসক-সামন্তরূপ মালিক-প্রভুর ঐশ্বর্য, সুখ, বিলাস, মান-যশ, প্রভাব, প্রতাপ, প্রতিপত্তিই শাসিত জনগণের সুখ-যশ-মান ও ঐশ্বর্যের প্রতীক ও প্রতিভূ। তাই রাজা ও রাজপুত্রই সাহিত্যে নায়ক। সে-সমাজে ছিল ছিটেফোঁটা কৃপাভোগী মন্ত্রিপুত্র ও সওদাগর, দুরাত্মা-দুর্বৃত্ত কোটাল আর দর্প ও দাপটপ্রবণ বিলাসী সামন্তমানস। এবং যশ-মান-প্রতাপলিপ্সু ভোগ-প্রিয় ছিল সে-জীবন। তাই বাহুবল, মনোবল ও বিলাসবাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ; সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠাই সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায় সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই সাধারণত সামন্তযুগের সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত।

সে-কালে সাধারণের কাছে ভবনের বাইরের ভুবন ছিল অজ্ঞাত। স্বল্প চাহিদার অজ্ঞ মানুষের গ্রামীণজীবন ছিল স্বনির্ভরতার প্রতীক। কুয়োর মাছের মতোই সংকীর্ণ পরিসরে তাদের কায়িক জীবন হত আবর্তিত। নানা সূত্রে শোনা যেত মহাসমুদ্রের কল্লোল ও তার তটস্থ দিগন্তপারের পৃথিবীর কথাও। কল্পভ্রমণে মিটিয়ে নিত বিশাল পৃথিবী পরিভ্রমণের সাধ। তাই অলৌকিক অস্বাভাবিক-ভৌতিক-দৈবিক চেতনাই ছিল তাদের সম্বল। ঝঞ্ঝা-সংকুল সমুদ্রই ছিল দূরযাত্রার একমাত্র পথ। ডাক কিংবা তার-বেতারের ব্যবস্থাও ছিল না। তাই স্বপ্ন, ছবি ও পক্ষীর দৌত্যে জাগত পৃথিবীর নাম-না-জানা প্রান্তের রাজকন্যার প্রতি প্রেম। তাই জাদুতে ও দৈবশক্তিতে আস্থা রাখতেই হয়েছে। দৈত্য-রাক্ষস যেমন হয়েছে অরি, তেমনি কখনো কখনো পশু-পাখি হয়েছে নায়কের সহায়। প্রকৃতির সঙ্গে মননের ও হৃদয়ের যোগ হয়েছে ঘনিষ্ঠ।

সে-যুগে কিছুই সহজে পরিবর্তিত হত না। যান্ত্রিক যানবাহনের অভাবে তখনো পৃথিবীর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ঘোচে নি। বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধ তখন সহজে গড়ে উঠত না। তাই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম কিংবা বস্তুর আবিষ্কার ও উপযোগ উদ্ভাবন ছিল মন্থর। জ্ঞান-বিদ্যা-মননেরও এমন বিচিত্র ও বহুধা বিকাশ-বিস্তার হত না। তাই পাঁচশ বছরেও সমাজে আচারে চিন্তায় কিংবা ব্যবহারসামগ্রীর লক্ষণীয় পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। শাস্ত্র-শাসিত জীবনে-সমাজে স্বাধীন চিন্তার অবাধ সুযোগ ছিল না, সমাজানুগত্যও ছিল ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। ফলে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক শাসনের কঠোরতা সমাজ-চিন্তা ও আচারকে রেখেছিল স্থিতিশীল তথা গতিহীন ও অপরিবর্তিত। এজন্যে কালিক ব্যবধানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য দেখা যেত সামান্য।

যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা ছিল না বলে একই দেশে অভিন্ন শাস্ত্রীয় সমাজের মধ্যেও অঞ্চল-ভেদে সামাজিক-সাংস্কারিক-আচারিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকত। যন্ত্রযানের বদৌলতে এ-যুগে পৃথিবী অখণ্ড, সংহত ও ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। পৃথিবীব্যাপী মানুষ পারস্পরিক অনুকৃতির মাধ্যমে অথবা উন্নতদের অনুকৃতির ফলে, ঘরোয়া জীবনযাত্রায় তৈজসে-আসবাবে, আহার্যে-আচারে, অস্ত্রে-বস্ত্রে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক আদব-কায়দায় প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ভাব-চিন্তা-আদর্শে, বিদ্যা-বিজ্ঞানে, কৃৎকৌশলে ও যন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ আজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে।

সে-যুগেও অবশ্য স্বল্পমাত্রার বাণিজ্যিক, পরাক্রান্ত জাতির সাম্রাজ্যিক এবং শাস্ত্রীয় সম্পর্ক বিভিন্ন দূরাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠত। সে-সূত্রে বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মীর সাংস্কৃতিক, ভাষিক, প্রশাসনিক ও আচারিক প্রভাব স্বীকার করতেই হত। কিন্তু

যন্ত্রবিজ্ঞানের বিকাশ ছিল না বলে সে-প্রভাব এ-কালের পর-প্রভাবের মতো তেমন ত্বরায় প্রকট হয়ে উঠত না—সর্বজনীন বা সর্বব্যাপীও হত না।

৩

এ কারণেই দেশজ মুসলমানের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু পিতৃপুরুষের আচার-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, তত্ত্ব-চেতনা ও মনন-ধারা থেকে গিয়েছিল। নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষ সুফি-দরবেশের ব্যক্তিত্ব ও কেরামত প্রভাবে ইসলামে দীক্ষিত হল বটে কিন্তু প্রতিবেশ ছিল প্রতিকূল। শাস্ত্রটি ছিল দূর দেশের এবং অবোধ্য ভাষায়। তার আচারিক কিংবা তাত্ত্বিক আবহ ছিল না এদেশে। তাই ব্যবহারিক ও মানস-চর্যায় বৌদ্ধ-হিন্দুর আচার-সংস্কারই রইল প্রবল। দেশী মুসলমানের এই ধর্মাচরণকে বুঝবার সুবিধের জন্যে বিদ্বানেরা চিহ্নিত করেছেন 'লৌকিক ইসলাম' নামে। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম বাঙালি নির্বিশেষের মর্মমূলে রয়েছে সেই ঐতিহ্যিক কায়াসাধন তত্ত্ব। যোগতান্ত্রিক বামাচারী কিংবা বামাবর্জিত সাধনা বাঙালির মজ্জাগত ধর্মসাধনা। রজঃ-বীর্য সংযত, ধারণ ও ঊর্ধ্বায়ন করেই চলে সাধনা। কৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনও ঐ কাল কামবিষ দমনেরই রূপক। চন্দ্রাণীর সর্পদংশনও ঐ কামবিষের প্রতীক।

এ-সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে সংখ্যালঘু মানুষ শাসক, সামন্ত কিংবা প্রভু হলেও সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে সংখ্যাগুরুর প্রভাব এড়াতে পারে না। সংখ্যালঘু যে আচারে-সংস্কারে, রুচি-সংস্কৃতিতে কিংবা ভাষায় স্বাতন্ত্র্য ও স্ববৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে না, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারতের শাসক তুর্কি-মুঘলের (প্রথম যুগের ইংরেজদেরও) জীবনে। সংখ্যাগুরুদের প্রভাবে তারা তাদের ভাষা-খাদ্য, আচার-সংস্কার ও জীবন-ধারণপদ্ধতির প্রায় সবই হারিয়েছিল। অবশ্য প্রভুকে অনুকরণ করার শাসিতসুলভ হীনমন্যতা-প্রসূত আগ্রহের ফলে শাসকদেরও খাদ্যের, পোশাকের ও দরবারি ভাষার এবং বস্তুসংলগ্ন ও মানস-সম্ভূত সংস্কৃতিও কিছুটা রয়ে গেল।

দৈশিক প্রতিবেশে দেশজ মুসলমান মাতৃভাষায় দৈশিক রীতি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অনুসরণে সাহিত্য-চর্চা করেছেন; এজন্যে তাদের রচনায় দেশী আবহই বিশেষ করে বর্তমান। আগেই বলেছি, যে-ধর্মশাস্ত্রের তারা অনুসারী, তাতে পুরো আনুগত্য রক্ষা করার মতো সে-শাস্ত্র জানা-বোঝা বা শোনার সুযোগ-সুবিধে তাদের ছিল না। তাই স্বশাস্ত্রীয় অপূর্ণ জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করেছে তারা দেশী বৌদ্ধ-হিন্দু সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র, দেহতত্ত্ব, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণকাহিনী ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দিয়ে। ফলে মুসলিম শাস্ত্রকথায়ও দেশী পুরাণ ও সংস্কারের প্রভাব পড়েছে। আর মুসলিম অধ্যাত্মতত্ত্বে ও মারফত-মরমিয়া সাধনায় যোগতন্ত্র ও বাউল প্রভাব প্রকট। তা ছাড়া বৌদ্ধ গুরুবাদ তথা পিরবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদও নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে। তাই বৌদ্ধ-হিন্দু বিষয়ভিত্তিক (নাথ-সাহিত্য, গোরক্ষবিজয়, হরগৌরীসম্বাদ, রাধাকৃষ্ণ, যোগতত্ত্ব) সাহিত্য-রচনায় কিংবা অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনায় মুসলিম তাত্ত্বিক-দার্শনিক-অধ্যাত্মবাদীর উৎসাহ লক্ষণীয়।

মুসলিম-রচিত বাঙলাসাহিত্যের প্রায় সবটাই হিন্দি-আওধি-ফারসি-আরবি গ্রন্থের কায়িক, ছায়িক বা ভাবিক অনুবাদ। অনুবাদকরা সর্বত্র ইচ্ছেমতো গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজনের

স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। প্রণয়োপাখ্যানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম কাহিনী হলেও মুসলিম-কবির নীতিবোধের বা সামাজিক রীতির পরিপন্থি ছিল না। দেবপূজাদির কথা ছাড়া অন্য ব্যাপারে রীতি-নীতি ও সংস্কারে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য ছিল না হয়তো। বিদেশী-বিভাষা থেকে অনুবাদ হলেও নৈতিক সামাজিক আচার-আচরণে দৈশিক আবহ ও সংস্কার রক্ষিত হয়েছে। আবার হিন্দু নায়ক-নায়িকার কাহিনী বর্ণনায় কবি অজ্ঞাতে মুসলিম রীতি-নীতির প্রয়োগ করেছেন, কিংবা সুদূর অতীতের প্রথা প্রয়োগ করেছেন— যেমন লোরকরাজ কর্তৃক বামন-বউ চন্দ্রাণীহরণ ও স্ত্রীরূপে গ্রহণ।

এখনকার দিনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ-সুরুচি, দেশপ্রেম,মানবপ্রীতি, মানবতা, সুনাগরিকতা প্রভৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের বিবেকবুদ্ধি, নীতিবোধ ও সদাচারবোধ জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় নৈতিক চরিত্র।

সে-যুগে মানুষের জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই মানুষের নৈতিক চেতনার মুখ্য উৎসও ছিল ধর্মবিধি ও শাস্ত্রানুশাসন। ফলে নৈতিক জীবনবোধ জাগানোর লক্ষ্যে রচিত হত সাহিত্য। নীতিকথা-নিরপেক্ষ কাব্য-উপাখ্যান কিংবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক রচনা ছিল বিরল প্রয়াসে সীমিত। অবশ্য ডাক-খনার আপ্তবাক্য, চাণক্য-শ্লোক ও প্রবচনাদির মতো বিচ্ছিন্ন তত্ত্বকথা বা জ্ঞানগর্ভ বাণী ছিল গুরুত্বে ও প্রভাবে ধর্মশাস্ত্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এগুলোও ছিল ধর্মশাস্ত্রের মতো অদৃশ্য অপার্থিব বিশ্বাস-সংস্কারের প্রলেপে আবৃত।

পূর্বপুরুষের বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের ধারক বাঙালি মুসলিমরা আল্লাহর পরিভাষা হিসেবে ধর্ম (সগীর ও দৌলত উজীরের কাব্যে), নাথ, নিরঞ্জন এবং হিন্দু-ঐতিহ্যের প্রভাবে করতার (কর্তার) ব্যবহার করেছেন। আরবের আল্লাহ ইরানে হয়েছেন 'খুদা' এবং ইসলামের মৌলিক তত্ত্বপ্রতীক শব্দগুলোও ইরানি রূপান্তর পেয়েছে। ফলে সালাৎ, সিয়াম, মল্‌ক, জান্নাৎ, জাহান্নাম, নবি-রসুল যথাক্রমে নামাজ, রোজা, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ, পয়গাম্বর হয়েছে। ফারসি দরবারি-ভাষা ছিল বলেই তার প্রভাবে ক্রমে ফারসি প্রতিশব্দগুলো জনপ্রিয় হয় মুসলিম-সমাজে। দেশজ মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলায়ও সংস্কারে-বিশ্বাসে, ঐতিহ্যে ও পুরাণে গড়ে উঠেছে দেশী শব্দের বাকপ্রতিমা। তাই মুসলিম-রচিত সাহিত্যের ভাষায়-ভঙ্গিতে, উপমাদি-অলঙ্কারে, বাকপ্রতিমা নির্মাণে মুখ্যত দেশী উপাদান-উপকরণ, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিই বক্তব্য প্রকাশের বাহন হয়েছে।

৪

প্রেম সম্পর্কে ইসলামে তেমন কোনো স্পষ্ট শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। মুসলিম-কবি প্রণয়কাহিনী রচনা করতে গিয়ে রূপজ প্রেম তথা দর্শন-শ্রবণজাত পূর্বরাগ-অনুরাগ দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন; মিলনের পথে দুস্তর বাধাই স্মরণ-চিন্তন মাধ্যমে প্রেমাকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, বিরহবোধ গভীর ও মিলনপ্রয়াস তীব্র করে তুলেছে। অবশেষে নায়ক-নায়িকার যখন গোপন মিলন হচ্ছে তখন সঙ্গম বা রমণ ছাড়া চুম্বন আলিঙ্গনাদি বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে (আবদুল নবির 'আমীর হামজা' কাব্য)। কাজেই পরপুরুষ কর্তৃক দেহ-স্পর্শ মাত্রই নারীর সতীত্ব নষ্ট হওয়ার মতো রামায়ণী সংকীর্ণতাকে এঁরা প্রশ্রয় দেন নি। কেবল মৈথুনেই, অর্থাৎ রতিরমণেই সতীত্ব নষ্ট হয়—এ-ই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। অ-মুসলিম নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে সত্য-সাক্ষী করে মালাবদল করলেই গান্ধর্ব বিয়ে

হয়ে যায়। অবশ্য সতীত্ব দেহে কিংবা মনে তা আজও তত্ত্বের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয় নি। নারীর সতীত্ব-যে পুরুষভোগ্য বস্তুর ধারণা থেকে অর্থাৎ ব্যক্তি-পুরুষের একাধিপত্যের বা একক-পুরুষ নিষ্ঠারই সামাজিক স্বীকৃতিমাত্র—তার বেশি কিছু নয়, বড়জোর সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আরোপ করার জন্য পিতৃত্ব নির্দিষ্ট রাখার প্রয়োজনপ্রসূত, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার গরজে এ-সত্য কখনো স্বীকৃতি পায় না। যদিও প্লেটো থেকে কার্ল মার্কস অবধি অনেকেই বিয়ের তথা সতীত্বের গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। পুরাণে মহাভারতেও সতীত্বের এমন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কোনো কোনো বুনো সমাজে অন্তত পার্বণিক উৎসবে মা-মেয়ে প্রভৃতি কিছু রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয় ব্যতীত যে-কোনো নারীর সঙ্গে সঙ্গম করা শাস্ত্র ও সমাজসম্মত রীতি। একে 'গণ-সঙ্গম' পার্বণও বলা চলে। পুরাণে মহাভারতে ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক, বিরোচন প্রভৃতির উক্তিতে ও কাহিনীতে বোঝা যায় পরস্ত্রী সম্ভোগ একসময় সামাজিক সদাচার বহির্ভূত ছিল না।

৫

দুনিয়ার সব আদিম মনুষ্যসমাজে জীবন-জীবিকার ও নিরাপত্তার অবলম্বন ছিল জাদু-বিশ্বাস। জাদু ঐন্দ্রজালিক শক্তির জনক। মন্ত্রেই তার আবাহন। আনুষঙ্গিক কিছু মুদ্রাভঙ্গি ও উপচারও থাকে। এই আদিম বিশ্বাস-সংস্কার আজও উন্নত সভ্যতা ও উঁচু সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ধারক-বাহকদের মধ্যেও অবিরল রয়ে গেছে। ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জিন-পরি প্রভৃতি মন্দশক্তির প্রতীক আজও শঙ্কা-ত্রাসের কারণ হয়ে সাধারণ মানুষের মনোলোকে বেঁচেবর্তে রয়েছে।

বৌদ্ধ প্রাবল্যের যুগে অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ ও নারী ডাক-ডাকিনী, যোগী-যোগিনীর প্রভাবে এ বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার গভীর ও ব্যাপক হয়। বৈদিক মন্ত্র কিংবা যজ্ঞও ঐ জাদুনির্ভর—ঐন্দ্রজালিক শক্তির উদ্বোধনই লক্ষ্য। এসব জাদুমন্ত্র-প্রসূত তুক-তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-উচাটন, বাণ-ফোঁড়, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি মঙ্গোল-গোত্রীয়দের প্রভাবে বহু ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গে কামরূপ-কামাখ্যার সম্পর্ক ও ঐতিহ্য এভাবেই গড়ে উঠেছে এবং লোকস্মৃতিতে তা আজও অম্লান। তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচারও তিব্বতি-চীনা মঙ্গোলীয়দের দান। তুক-তাক-মন্ত্রের জগৎ একটি দুর্ভেদ্য রহস্যলোক। মানুষকে মারা-বাঁচানো ছাড়াও মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-ব্যাধি, রূপান্তর-দেহান্তর, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দৃশ্যে বা অদৃশ্যে বিচরণ অবধি সার্বিক জীবন-নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে ঐ যোগসিদ্ধি বা কায়াসিদ্ধি। গোরক্ষবিজয়ে ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদের গানে এই চৌরাশি আঙ্গুল পরিমিত দেহ-সাধনায় সিদ্ধ 'চৌরাশিসিদ্ধার'য় তথা কায়াসাধক বৌদ্ধ নাথ-সহজিয়াদের কেরামতির কথাই বিবৃত হয়েছে।

আধুনিক প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও ঔষধ এদেশে চালু হবার আগে সেই আদিম বা বুনো মানুষের মতো এদেশী মানুষও রোগমাত্রকেই দৈব-নিগ্রহের কিংবা অরি-অপদেবতার কুনজর বলেই বিশ্বাস করত। বিশেষ করে যেসব রোগের নিদান ছিল না, সেগুলো সম্পর্কে বদ্ধমূল ছিল এ ধারণা। দেশী কলেরা-বসন্ত-প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর তো বটেই, আয়ুর্বেদে তথা দেশী চিকিৎসাশাস্ত্রে কিংবা ইউনানি তিব্বিয়ায় সব রোগের

চিকিৎসা-নিদান ছিল না, আজকালের মতো আশু উপশমদানের ব্যবস্থাও ছিল স্বপ্ন। দ্রব্যগুণ-নির্ভর টোটকা চিকিৎসাই ছিল বাস্তব ব্যবস্থা। কাজেই কলেরা-বসন্ত-শিশুরোগ প্রভৃতির জন্যে ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী প্রভৃতি অপদেবতা তো ছিলই, অন্য অনেক দুরন্ত দুশ্চিকিৎস্য অনির্ণীত অনির্দেশ্য রোগমুক্তির জন্যে ঐসব মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ-কবজ, পূজা-শিন্নি, মানত-ধর্না, বলি-সদ্কা, কাঙাল-মিসকিন-ভোজন প্রভৃতিই ছিল ভরসা।

তাই তুক-তাক, দারু-টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র, উচাটন-বশীকরণ, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজে মানুষের আস্থা ছিল প্রবল, ভরসা ছিল অপরিমেয়। সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে কিংবা ময়নামতীর গানে দেখি মন্ত্রবলে মানুষ ইচ্ছেমতো কীট, মাছি, পশু, পাখি, সাপ, ব্যাঙ সবকিছুতে রূপান্তরিত হতে পারত, অপর মানুষের রূপ গ্রহণ করে আত্মগোপন কিংবা ছলনা করতেও ছিল না কোনো বাধা। এমনকি মন্ত্রবলে দর্পণে নারী সৃষ্টি করা, মৃতে ও জড়বস্তুতে প্রাণ-সঞ্চার করা, অন্য মানুষের উপর অদৃশ্যে 'ভর' করা প্রভৃতি সহজ ছিল। 'পরঘট সঞ্চারিতে আহ্মি মন্ত্র জানি' (সত্যকলিবিবাদ)। তবে এসব ছিল যোগতান্ত্রিক কায়াসাধন সাপেক্ষ—ভূতসিদ্ধি, খেচর সিদ্ধি, কায়াসিদ্ধি প্রভৃতি ছিল কঠোর সাধনালভ্য।

মন্ত্রবলে স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সর্বত্র থাকত অবাধগতি। যুদ্ধে অস্ত্র জোড়ার সময়েও মন্ত্রপূত অস্ত্রের লক্ষ্য হতো অমোঘ। 'নানামন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্রবাণ' (সত্যকলি)। রামায়ণ-মহাভারতেও আমরা অগ্নি-বায়ু-সর্প-চন্দ্র প্রভৃতি বহু বিচিত্র বাণের ব্যবহার দেখি। ভূত-প্রেত-জিন-পরি-দেও-দানুর প্রভাবেও লোকের বিশ্বাস ছিল অবিচল। ভূত-প্রেত-দেও-দানব-জিন-পরি ছাড়াবার তাড়াবার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র ও বিবিধ, তাতে অমানবিক নির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হত। তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-স্বস্ত্যয়ন, দোয়া-কোরআনখানি, পূজা-শিন্নি,দান-সদকা, বলি-কুরবানি অনুষ্ঠানেও ধূপ-ধূনো-লোবান, সোনা-রুপা-লোহা প্রভৃতির ধোয়াজলে ও লোহা ধারণে ছিল অপদেবতার হামলাভীত মানুষের নির্ভর ও ভরসা। এমনি হাজারো ঘরোয়া, নৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের ভাব-কর্ম-আচরণ। এগুলো-যে নিরাপত্তাকামী আদি মানবগোষ্ঠীর ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রসূত জাদু-বিশ্বাস ও আচারের ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সংস্কার ও রূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে ননা। এমনি রূপান্তরে আদিম বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার দুনিয়ার সভ্যতম সমাজেও জগদ্দল হয়ে আজও টিকে আছে।

নানা শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মে ছাড়াও গৃহ-নির্মাণে ও গৃহ-প্রবেশে, স্নানে, বিশেষ করে পার্বণিক স্নানে, নববস্ত্র পরিধানে কিংবা পরিহারকালে মাস-দিন-ক্ষণ-গ্রহ-নক্ষত্র-রাশিনির্ভর শুভাশুভ জানতে ও মানতে হত; এখনো হয়। অনেক রোগই ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জিন-পরির কুদৃষ্টির ফল, তাই রোগ এড়ানোর জন্যেও কথায়, কাজে, চলায়-ফেরায় কালাকাল মানতে হয়। মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে', আলাউলের 'তোহাফা'য়, মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা'য় এবং আরো অনেক গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রহ-নক্ষত্র-রাশির প্রভাব কিংবা অপদেবতার অপদৃষ্টি কুনজরের লক্ষণ, নিদান এবং তা এড়ানোর উপায় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

যেমন শ্রাবণ-ভাদ্রে নতুন ঘর করলে সে-ঘর সর্বদা রোগ-শোক-আপদে আকীর্ণ থাকে। স্পষ্টত বর্ষাকালে নির্মিত ঘর স্যাঁতসেঁতে হবে এবং তজ্জাত রোগও অবশ্যম্ভাবী, তেমনি আশ্বিনেও ঝঞ্ঝা-বন্যার আশঙ্কার সঙ্গে গৃহ-উপকরণও দুর্লভ-দুর্মূল্য হবে।

সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবারে স্নান করলে ধন বাড়ে। শুক্রবারে স্নানও উত্তম। মঙ্গলবারে স্নান করলে আয়ু কমে এবং দুশ্চিন্তা বাড়ে। গাছতলায় দিগম্বর মানে নেংটা হলে রোববারে রোগে ধরে এবং মানুষের কুদৃষ্টি পড়লে কিংবা ভূতে ভর করলে হাঁস বা ছাগল দান করে আরোগ্য লাভ করা যায়। বুধবারে যে-রোগের শুরু তা থেকে আরোগ্যের উপায় হচ্ছে কালো মুরগি দান। ভূতদৃষ্টিজাত রোগের নিরাময়ের জন্যে ছাগ-বৃষ দান করতে হয়। অশ্বের কপালের লোম পুড়ে ধুঁয়া দিলে ও ময়ূরের পুচ্ছ নিয়ে তালপাতা বা ছাতার মতো ধরলে দেও-এ ভর-করা মানুষ নিষ্কৃতি পায়। হিঙ্গুল, কস্তুরী, শস্যধূম, জতুর গুঁড়ো, কালো-মাটি, গাভীর হাড়, মাছের পিত্ত, হরিদ্রা, চিলের মাংস, প্যাঁচার নখ, কালো বিড়াল ও কালো মুরগির বিষ্ঠা, গন্ধক প্রভৃতিও বিভিন্ন চিকিৎসার উপকরণ। শুক্রবারে নববস্ত্র পরিধান এবং রোববারেই নববস্ত্র ছেঁড়া বিধেয়।

বিবাহ ও অন্য পুণ্যকর্ম শুক্রবারে, শনিবারে মৃগয়া, রোববারে গৃহ-নির্মাণ, বাণিজ্যোদ্দেশে শনিবারে বিদেশ যাত্রাই শুভ আর যুদ্ধ মঙ্গলবারে শুরু করাই ভালো।

৬

আগেই বলেছি, সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রই তৈরি করেছে বাঙালির অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তি। এ-ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা মুসলিমে ভেদ মতগত নয়, আচার-পদ্ধতিগত। সবাই দেহসাধনায় আস্থা রাখে। দেহতত্ত্ব সবারই অবশ্য জ্ঞেয়। নির্বাণকামী বিকৃত বৌদ্ধদের দেহবাদ, ঈশ্বরবাদী হিন্দু-মুসলিমে দেহাত্মবাদে রূপান্তর পেয়েছে। বৈরাগ্য-সন্ন্যাসের ঐতিহ্য আরো পুরোনো, নাস্তিক আজীবিক, জৈন শ্রাবক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বজ্রযানী-সহজযানী-তান্ত্রিক-কাপালিক-বীরাচারী-বীভৎসাচারী-চীনাচারী নানা তান্ত্রিক-ব্রহ্মচারী, যোগী-সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সহজিয়া-বাউল-বৈরাগী আকীর্ণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলায় যোগীর আদর-কদর ছিল অসামান্য। বৈরাগ্যে, সেবায়, সততায়, সুচিকিৎসায়, অলৌকিক শক্তিধর সাধনসিদ্ধ নির্গৃহ যোগী ছিল লোকচক্ষে আদর্শ মানুষ। বাঙলাসাহিত্যের গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক অবধি আমরা এজন্যেই বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভর করবার মতো আদর্শ-চরিত্র মানুষ হিসেবে পাই কেবল যোগী-সন্ন্যাসীকেই। ঘর-সংসার করেও বৈষয়িক মানুষ-যে আদর্শনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ, সত্যসন্ধ ও ত্যাগপ্রবণ হতে পারে, তা যেন আমাদের দেশের মানুষের কাছে সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি অজ্ঞাত। তাই আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে (বঙ্কিম-সাহিত্য অবধি) পরহিতব্রতী উপচিকীর্ষু, ঈর্ষা-অসূয়ামুক্ত, সেবা-সততা-ত্যাগ-তিতিক্ষাসুন্দর মানুষমাত্রই যোগী-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী। তাই সাধু আমাদের চেতনায় বেনে নয়, সন্ন্যাসী। সংসারী বিষয়ী মানুষের সততায় ও মনুষ্যত্বে এদেশের মানুষ চিরকাল এমন আস্থাহীন যে এদেশে রাজনীতির নেতা হতেও বৈরাগ্যের ভান ও ভেক দরকার।

গায়ে ছাই, কানে কড়ি, গলে মালা, হাতে নড়ি ও খাপর, কাঁধে কাঁথা ও ঝুলি—এমন যোগীর সাক্ষাৎ মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্যের সর্বত্র মেলে। বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলিমের মারফত-সাধনায়ও যোগ ও যোগ-পন্থাই হয়েছে অবলম্বন। শাহ শরফুদ্দীন বুআলি কলন্দর, গউস গোয়ালিয়র থেকে সৈয়দ সুলতান, ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ, শেখ চাঁন্দ, আবদুল হাকিম, আলি রজা প্রমুখ সবাই যোগভিত্তিক সুফি সাধনাতেই আস্থা রেখেছেন। এ সাধনাতত্ত্বের প্রাপ্ত উৎস হচ্ছে ভোজবর্মণ রচিত

'অমৃত-কুণ্ড'। 'বাঙলার সুফী সাহিত্য' গ্রন্থে এসব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের 'নবীবংশ'-প্রণেতা পির মীর সৈয়দ সুলতান বলেছেন, 'হযরত মুহম্মদ ও উমর যোগপন্থ শিখাইলা, শিখাইলা জ্ঞান।' কিংবা 'ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা।' এই-ই হচ্ছে নবি ও খলিফা প্রচারিত ইসলাম! মারফত ও মরমিয়া সাধনার ক্ষেত্রে সুফিবাদের আবরণে মুসলমানরা সাংখ্যতন্ত্র ও যোগতত্ত্ব বরণ করলেও কিন্তু তারা সচেতনভাবে পৌত্তলিকতাবিরোধী ও বিদ্বেষী। যদিও হজব্রত উদ্‌যাপনকালে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ (তা'য়াব) করা, পাথর চুম্বন করা, অদৃশ্য শয়তানের প্রতি পাথর ছোড়া, হযরত হাজরার স্মৃতির সম্মানে ছুটোছুটির অভিনয় করা প্রভৃতি মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য এবং গুরুজনে কদমবুসি, পির-পূজা, দরগাহ জেয়ারত ও কবর সালাম করা, খিজির কিংবা সত্যপীরে শিন্নিদান, ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী-বনবিধি ও হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত জলে-ডাঙায় হাঙর-কুমির-সাপ-বাঘ-হাতি প্রভৃতিকে অরি-দেবতা জ্ঞানে মান-মানতে বশ করা প্রভৃতি তাদের অনেকেরই জীবনাচরণের অঙ্গ, তবু এসব তাদের চোখে পৌত্তলিকতা নয়। এসব সংস্কার-বিশ্বাস-আচরণ মিলে বাঙালি মুসলমানের আচরণীয় মুসলমান ধর্ম বা লৌকিক ইসলামের উদ্ভব।

৭

বিবাহে পণ-প্রথা চালু ছিল; হিন্দুসমাজে বরপণ এবং মুসলমানসমাজে ছিল কন্যাপণ। বাল্যবিবাহ জনপ্রিয় ছিল। ধনীরা সাধারণত বহুপত্নীক এবং গরিবেরা একপত্নীক থাকত। নজর, শিকলি, যৌতুকদানও সামাজিক রেওয়াজের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। পণ ও নির্ধারিত অলঙ্কার প্রভৃতির দেনাপাওনার ব্যাপারে অভাবে কিংবা স্বভাবদোষে পারস্পরিক প্রতারণার ঘটনা বিরল নয়, সুলভই ছিল। তাই বিয়ের আসরে ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি, বিয়ে-ভাঙা প্রভৃতি প্রায়ই ঘটত। বিয়ের প্রস্তাব-পয়গাম পাঠানো থেকে বিয়ের পরের কয়দিনও উভয়পক্ষের মধ্যে ভোজ-উৎসব চলত নানা অজুহাতে—যেমন ঘর-বাড়ি দেখা, বর-কনে দেখা, পাকাকথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়ের ভোজ, কনে-ভোজ, বর-ভোজ প্রভৃতি। বিবাহোৎসবে বা খৎনা, কান-ফোড়ন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, নাম-রাখা, গায়ে হলুদ ও হাতে-মেহদি প্রভৃতিতে বাদ্য-বাজি, নাচ-গান, আবির-ফাগ, সোহাগ, কেশর-অগুরু-চুয়া, আতর, রঙ মাখা-ছোড়া, কাদা-ছোড়া, মেয়েলি নাচগান, পুতুল নাচ, জাদুকরের খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা আর্থিক সাচ্ছল্যানুসারে থাকতই।

ঘরজামাই বরের বা শ্বশুরঘরে বউয়ের তেমন কোনো মর্যাদা ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুরবাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি বা সংসার থাকত না। বধূর উপর পীড়ন-আশঙ্কায় বিবাহিতা মেয়ের মা-বাপ-ভাই-বোন সবসময় বর-পরিবারের সঙ্গে তোয়াজের ভাষায় ব্যবহার করত অর্থাৎ বরপক্ষের মন যুগিয়ে চলতে হত তাদের। কন্যার পিতা হিসেবে এ-ক্ষেত্রে রাজা ও ভিখারির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। 'পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে।'—এটি শিশু বালিকারাও জানত-বুঝত, পুতুল-খেলায় তা ছিল সুপ্রকট। পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল নর-পোষ্য, তাই অসহায় ও স্বাধীনসত্তাবিহীন। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর, মাতারূপে সন্তানের আশ্রয়ে ও অভিভাবকত্বে জীবন কাটে তার। এ-কারণেই হয়তো

অপরিচিত মনিববাড়ির বালক-ভৃত্যের মতো পরকে আপন করার, অনাত্মীয় নিয়ে ঘর করার, এবং নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার মতো মনের জোর, স্বভাবের ঐশ্বর্য ও মানস-প্রস্তুতি থাকে তার বালিকা-বয়স থেকেই। স্বয়ম্বরের কাল তখন অপগত বটে, কিন্তু জামাতা (গদা-মালিকা দ্রষ্টব্য) নির্বাচন কালে তার শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-চেতনা প্রভৃতির পরীক্ষা হত। অশিক্ষিতের মধ্যে হত হেঁয়ালিধাঁধা দিয়ে। বর-ঠকানো নানা হেঁয়ালি তখন খুব চালু ছিল। বিয়ের সময় দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন মানা হত। বিবাহানুষ্ঠানের জন্যে সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হত, কলাগাছ পোঁতা হত, আমের ডাল জলপূর্ণ মঙ্গলঘট তথা কলসির মুখে বসানো হত। উপরে থাকত চাঁদোয়া— এই আচ্ছাদনের অপর নাম আলাম বা ছত্র। মেঝে আলপনা আঁকা হত। ঐ মঞ্চের নাম ছিল মারোয়া। এর মধ্যেই বর-কনের চারিচোখের মিলন হত। দুইপক্ষের সখি-বন্ধু-আত্মীয়রা তখন হর্ষধ্বনি ও শুভ কামনার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা ও নানা রঙ্গরস করত। এর নাম জুলুয়া বা জোলুয়া (জলুস?)— 'জলুয়া দিলেন্ত দীয়া (দীপ) করি হুড়াহুড়ি'। বর-কনের মধ্যে তখন পাশাদি ক্রীড়া চলত। বর-কনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষরূপে ফুলের স্তবক দিয়ে ছোড়া-লোফা খেলাও খেলত। পদাবলীর সেই 'ফুলের গেরুয়া (স্তবক) সঘনে লোফএ' ক্রীড়াও এ-রকমেরই। এ খেলার নাম ছিল গেরুয়া খেলা। এ যেন বিবাহোত্তর Courtship। শরম-সঙ্কোচ ভাঙার জন্যেই হয়তো এ ব্যবস্থা [কবি আইনুদ্দীনের গেরুয়া খেলা দ্রষ্টব্য]। বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকত। এর নাম 'গস্‌ত্‌ ফিরানো।' নিরক্ষর গরিব মুসলিম ধুতি পরেই বর সাজত। অন্যদের তখনো বর-পোশাক ছিল ইজার-পাগড়ি, তাঞ্জাম-চৌদোল ও শিবিকা বা পালকিই ছিল বর-কনের বাহন।

সাধারণের বিয়েতে মেয়েমহলে বাঁদীশ্রেণীর ভাড়া-করা নারী কিংবা গৃহস্থঘরের বৌ-ঝিরা নাচ-গান করত। ধনীগৃহে উৎসবকালে নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে বেশ্যা আনা হত। বেশ্যারা সমাজে খুব ঘৃণ্য ছিল না। 'বাইজি' সম্বোধন ও পরিচিতির মধ্যেই রয়েছে সামাজিক স্বীকৃতির আভাস। তা ছাড়া ধনীলোকের 'নজরী'রূপে দাসীসম্ভোগ ও উপপত্নী রাখা নিন্দার কিংবা অগৌরবের ছিল না।

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নানা রীতি-রেওয়াজ ও আচার-সংস্কার রয়েছে। কালো অস্ট্রিকরা হলুদ মেখে স্নান করে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। আলপনা-আঁকা কুলা বা ডালায় ধান, দূর্বা, দীপ, হলুদ ও জলপূর্ণ ঘটের মুখে আম্রপত্র রাখে, ঘরের দ্বারে কলাগাছ পুঁতে, বিয়ের পূর্বদিনে বর-কনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠায়, বর-যাত্রার সময় বরের কোলে একটা শিশু বসায়। এসব হচ্ছে আদিম জাদু-সংস্কার। ধান খাদ্য-সম্পদ ও সন্তানবৃদ্ধির প্রতীক, দূর্বা জীবনীশক্তির, কলাগাছ ও আম্রপত্র দীর্ঘ আয়ু ও প্রাণশক্তির, হলুদ সৌন্দর্যের, মাছ প্রজননশক্তির, বরের কোলে শিশু সৃষ্টিশীলতার, ও দীপ আশার প্রতীক। পৃথিবীর আদিম ও বুনোসমাজে এগুলো নানাভাবে ও বিভিন্ন আকারে রয়েছে। জরু-যে জমির মতোই বীরভোগ্য, অর্থাৎ বাহুবল ও পৌরুষ দিয়ে আয়ত্ত করতে হয় এবং আদিযুগে-যে নারীকে হরণ করেই বরণ করার প্রথা চালু ছিল, তার রেশ রয়ে গেছে দরজায় বর আটকানো প্রথায়। পূর্বে কনেপক্ষ সত্যি বাধা দিত; এখন ছদ্ম বাধা সৃষ্টি করে আর্থিক ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়; এখন তা ঠাট্টা-সম্পর্কিত-জনদের আমোদ-ফূর্তির উপলক্ষমাত্র। পাঁচ পুকুরের পানি মিশিয়ে পাঁচ হাতে স্নান

করানো, পাঁচ হাতে মেহদি লাগানো, শুভকর্ম বন্ধ্যা ও বিধবা-ভীতি প্রভৃতি আমাদের বিস্মৃত আদিম পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য, আচার ও উত্তরাধিকার। সংস্কার-যে মর্মমূলে কীভাবে চেপে বসে, তার প্রমাণ বেহুলা-লখিন্দরের বাসররাতের দুর্ভাগ্যভীত বাঙালি হিন্দুরা বিয়ের প্রথম রাত 'কালরাত্রি' হিসেবেই মানে।

৮

সাড়ে চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ের লেখা-পড়ার জন্যে 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান হত। এতে উৎসবের আয়োজন হত। ভোজ-পায়েস-শিন্নি-গুড়-বাতাসা-মিষ্টি এবং পান ও তেল (তেলোয়াই) যোগে উপস্থিত জনেরা অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও শাস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে রতিশাস্ত্রও কখনো কখনো কোথাও শিক্ষা দেয়া হত। বাৎসায়নের 'কামসূত্র' কিংবা 'নায়িকা লক্ষণ' প্রভৃতি সে-যুগে তেমন লজ্জাজনক গুহ্যবিদ্যা ছিল না। তাই কাব্যে-উপাখ্যানে রতি-রমণের ও নারীরূপের বিস্তৃত বর্ণনা থাকত। সামন্ত-ঘরে চিত্রাঙ্কন ও সূচীশিল্পেরও চর্চা ছিল। তবে সাধারণের শিক্ষাসূচিতে শাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাধারণ গণিত (জল, জমি ও বস্তুর মাপ ও হিসাব সংক্রান্ত আর্যাদিই ছিল প্রধান), কাব্য, অলঙ্কার ও পত্র-দলিল-দস্তাবেজ রচনা প্রভৃতিই থাকত। সামাজিক উৎসবে-পার্বণে, নাচ-গান-বাদ্য-প্রমোদের জন্যে ছিল নীচজাতীয় গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-নাটুকে বৃত্তিজীবী। উচ্চবিত্তের অভিজাত সামন্ত ও রাজ-পরিবারের লোকেরা কলা-চর্চা করত নিজেদের বা অন্তরঙ্গজনের চিত্তবিনোদনের জন্যে। নারীশিক্ষাও একেবারে বিরল ছিল না।

শিক্ষা বলতে সে-যুগে ধর্মশিক্ষাই মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ও হিন্দু-মুসলমানের বিদ্যালয় পৃথক ছিল। সাধারণত পণ্ডিতের ঘরে টোল ও আলিমের ঘরে বা মসজিদে মক্তব থাকত। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাদের কাছে পড়ত। কিছু দক্ষিণা বা নজরানা দিত, তা-ও সবসময় কড়িতে নয়—ফসল তোলার মৌসুমে ধানাদি শস্য কিংবা ফলমূল তরকারির আকারে ও বার্ষিক বরাদ্দে। সাধারণ শিক্ষার জন্যে কোথাও কোথাও পাঠশালা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্যে ক্বচিৎ কোথাও সরকারি বা সামন্ত-সাহায্যে পরিচালিত টোল-মাদরাসা থাকত। সে-যুগে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সে অধিকারও ছিল না। নিম্নবর্ণেরও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলিম সমাজেও ঐতিহ্যাভাবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ ছিল না। কাজেই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ই বেশি ছিল এবং পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল নগণ্য। গুরু-ওস্তাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারপ্রসূত মর্যাদা ও সম্মান ছিল। শাপে সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে পড়ুয়ারা তো বটেই অন্যেরাও গুরু-ওস্তাদকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করত, তা ছাড়া বিদ্বান ও জ্ঞানী বলেও তাঁরা সম্মানিত ছিলেন। হিন্দুপণ্ডিত পৌরোহিত্য, পাঁতিদান, কোষ্ঠী তৈরি, ভাগ্যগণনা ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় সামাজিক ও পার্বণিক অনুষ্ঠানে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে অর্থোপার্জন করতেন।

মৌলবি-মুনশি-ওস্তাদ-মোল্লা-খোন্দকারেরাও গাঁয়ের শাস্ত্রীয় উৎসবে-পার্বণে, বিবাহে-মৃতসৎকারে শাস্ত্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন। মুরগি জবেহ, ফাতেহা পাঠ, জানাজায়

ইমামতি, মসজিদে মুয়াজ্জিন ও ইমামের কাজ প্রভৃতি ছিল তাঁদেরই। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিঠুর শারীরিক পীড়নের শিকার ছিল :

শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।

কভু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়
উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয়।

(দয়াময়ের সারদামঙ্গল)

এখানেই শেষ নয়, নাড়ুগোপাল করা (হাত-পা জড়ো করে রাখা), ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল চিরে রক্ত ঝরানো, সূর্যের দিকে মুখ করে বসানো, বিছুটি পিঁপড়ে প্রভৃতি গায়ে লাগিয়ে দেয়া ছিল স্বাভাবিক শাস্তির অঙ্গ। কলম ছিল কঞ্চি কিংবা হাঁসের, শকুনের বা ময়ূরের পালকের। বালকেরা কলাপাতায়; অন্যেরা লিখত তুলোট কাগজে, তালপাতায়। কালি তৈরি হত বিভিন্ন পদ্ধতিতে। ছাত্রশিক্ষকেরা বসতেন চাটাই, মাদুর, পাটি, কুশাসন ও ফরাশ প্রভৃতির উপর। ছাপাখানা ছিল না বলে সব গ্রন্থ ছিল হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি। পেশাদার লিপিকার থাকত।

৯

গান-বাজনা সমাজে লোকপ্রিয় ছিল। শরিয়তপন্থিরাও যেন তখন তেমন রক্ষণশীল ছিল না। তাই সর্বপ্রকার উৎসবে-পার্বণে নাচ-গানের আসর বসত দেখা যায়। চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলিম রচিত রাগ-তালের বহু গ্রন্থ ষোলো-শতক থেকেই মিলছে। বিশেষত সঙ্গীত (হালকা-দারা-সামা) কলন্দরিরা, চিশতিয়া ও কাদিরিয়া সুফিদের সাধন-ভজনের অঙ্গ। প্রায় সব মুসলিম-কবিই গান রচনা করেছেন, কেউ-কেউ রাগ-তালের গ্রন্থও। কবি আলাউল তো প্রথম জীবনে সঙ্গীতশিক্ষকই ছিলেন। গাইয়ে-বাজিয়ে তো ছিলেনই, তিনি সঙ্গীত রচনা ছাড়া 'রাগতালনামা'ও রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সবার সব সঙ্গীতই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-রূপকে রচিত। ব্যতিক্রম ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

১০

ঘরে-সংসারে একরকমের নেশা চালু ছিল। উননের কাছে জলভরা ঘড়ায় প্রতিদিন এক মুষ্টি ভাত রেখে কয়েক দিন পর ভাতপচা পানি ছেঁকে নিয়ে পান করত তারা, এর নাম আমানি বা ঘড়া কাঁজি। এতে সামান্য নেশা ধরত। ভেতো মদের আরাকানি নাম 'সিফত'। তা ছাড়া ধেনো, তালো, খেজুরে মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডুও বহুলপ্রচলিত ছিল। মুখশুদ্ধির জন্যে পান-সুপারি তো ছিলই। কিন্তু পরে যখন প্রায় নির্দোষ ব্যসন 'তামাকু' চালু হল, তখন তামাক সেবনের নিন্দায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছে সমাজহিতৈষীরা। 'তামাকু' সেবন গোড়াতে ছিল শাহ-সামন্ত অভিজাতদের দর্প ও দাপট প্রকাশের

প্রতীক। তাই মনিব ও মান্যজনের সম্মুখে তামাকু সেবন ছিল বেয়াদবি, ঔদ্ধত্য, অসৌজন্য ও অসংস্কৃতির লক্ষণ ও প্রকাশ। পরে এ অভ্যাস যখন গণমানবে সংক্রমিত হল, তখনো তামাকু সেবন রইল অবজ্ঞেয় ও নিন্দনীয়। এর কারণ বোধহয় তামাকু সেবনলিপ্সু ব্যক্তিরা অধৈর্য হয়ে হুঁকা কেড়ে নিয়ে ধূমপান করতে চায়। তাই আমরা আঠারো শতকের কবি শেখ সাদী ও আফজল আলিকে তামাকুসেবীর নিন্দায় মুখর দেখি। রামপ্রসাদ, শান্তিদাস ও সিতকর্মকার যথাক্রমে 'তামাকুমাহাত্ম্য', 'তামাকুপুরাণ', ও 'হুঁকাপুরাণ' রচনা করে তামাকখোরকে বিদ্রূপ করেছেন এবং দ্বিজ রামানন্দ সঙ্গীতে গাঁজা-তামাকুর মহিমা প্রচারে হয়েছেন মুখর। ফকির-দরবেশরাও তামাকখোর হয়ে উঠেছিলেন। 'চৌদ্দশত দরবেশ চলে আলবোলা হাতে' (দ্বিজ ষষ্ঠীবর)।

১১

সে-যুগে নারীর অলঙ্কারবাহুল্য ছিল। মেয়েরা মাথায় সিঁথিপাট, টিকলি; কণ্ঠে হাঁসুলি, মালা, টাকার ছড়া; এক, তিন ও সাত লহরি হার, তাবিজ; হাতে কঙ্কণ, বালা, তাড়, চুড়ি, খাড়ু, পৈঁচি, অঙ্গদ, অনন্ত; আঙুলে অঙ্গুরীয়; নাকে কোর, চাঁদবোলাক, বালি, ডালবোলাক, লোলক, নাকমাছি, নাকছবি, বেশর; কানে কানফুল, বোলতা, কুমড়োফুল, ঝুমকা কুণ্ডল, নোলক, ঝিঙ্গাফুল, কুণ্ডল, কানবালা, বালি; পায়ে পাজব, পাঁসুলি, নূপুর, ঘুঙুর, মকর, খাড়ু, মলতোড়র, বাঁকপাতা, বঙ্করাজ, মল, উনচট, উঝটি; কোমরে চন্দ্রহার, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ, কিঙ্কিণী; হাতের পাতায় আঙুল-সংলগ্ন রতনচূড়; গ্রীবায় গ্রীবাপত্র; বাহুতে তাড়, কেয়ূর, জসম, বাজুবন্ধ, বাজু প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার ছিল। আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানভেদে এগুলো তালপাতা, ঝিনুক, শিঙ থেকে তামা-পিতল-সিসা-রুপা-সোনা-মুক্তা, হীরা-মণি-কাচপাথর প্রভৃতি যে-কোনো উপাদানে তৈরি হত। শেখশুভোদয়ায় তালপত্রে নির্মিত কর্ণাভরণের কথা আছে। কাঁচুলি নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় ও জরি-রত্নখচিত ছিল। অবশ্য কাঁচুলি অভিজাত ও ধনীঘরের নারীই কেবল ব্যবহার করত। নানা ছাঁদের বেণী ও কবরী হত। কানাড়ি (কর্নাটদেশীয়) ছাঁদে বাঁধা কবরীর কদর ছিল বেশি। কবরীতে বেণীতে নানা রঙের ফিতা ছাড়াও ফুল জড়ানো ছিল সর্বজনীন রীতি। বেণীর প্রান্তে ফুল বাঁধা থেকেই হয়তো গ্রন্থের সর্গ বা গ্রন্থ সমাপ্তিজ্ঞাপক 'পুষ্পিকা' নামের উৎপত্তি।

পুরুষেরও বাহুতে কবচ ও বাজু; বাহুতে, গলায় ও কটিতে তাবিজ; কানে কুণ্ডল, হাতে বলয় ও গলায় একছড়ি হার বা কালো সূতার 'তাগা' থাকত। ধার্মিক মুসলমানেরা খিলালের প্রয়োজনে লোহার বা পিতলের খিলাল-শলাকা গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

নারীর প্রলেপ প্রসাধনদ্রব্যের মধ্যে ছিল সিন্দূর, চন্দন, মেহদি, কুমকুম, কস্তুরী, কাফুর, কেশর, অগুরু, কাজল, অঞ্জন, সূর্মা, তেল, আতর ও ঠোঁটে তাম্বুলরাগ। পুরুষেরাও এসব প্রসাধনদ্রব্য উৎসব-পার্বণকালে অঙ্গে ধারণ করত। চুল-দাড়ি রাঙানো মুসলিম ধার্মিকসমাজে বহুলপ্রচলিত ছিল।

শাহ সামন্ত-অভিজাত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরে নারীপর্দা ছিল, তবে শাসন-প্রশাসনে জড়িত বা নিয়োজিত নারীর পর্দা-নীতি শিথিল ছিল। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের ঘরে পর্দা কখনো প্রথারূপে চালু ছিল না। পর্দাপ্রথা ছিল না বাউল-বৌদ্ধ-

বৈষ্ণবদেরও। দরিদ্রঘরের নারীদের ঘরে-বাইরে, ক্ষেতে-খামারে, হাটে যেতে হত। ভিখারিনি তো ছিলই। আর দাসী-বান্দী-ক্রীতদাসীর পর্দা রাখার তো নিয়মই ছিল না। তা ছাড়া তান্ত্রিক-কাপালিক-সহজিয়া-বাউল প্রভৃতি কায়াসাধকরা বামাচারী। মণ্ডল, ভৈরবীচক্র, নৈশমিলনচক্র, গৌপীচক্র রসের ভিয়ান, রজঃ শুক্র পান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও যৌথ রতি-রমণ হচ্ছে সাধনার অঙ্গ। কাজেই এদের মধ্যেও পর্দাপ্রথা ছিল না।

১২

গরিবেরা কাজের সময়ে কৌপীন, গামছা ও অন্য সময়ে খাটো শাদা ধুতি বা তহবন পরত। মাথায় টুপি (কাপড়ের, তালপাতার বা বেতের) ও পাগড়ি পরত। জুতা পরা হয়তো বিয়ের মতো পার্বণিকই ছিল। হিন্দুরাও কৌপীন, গামছা, খাটো ধুতি ও গায়ে উত্তরীয় পরত, কেউ-কেউ মাথায় পাগড়িও বাঁধত। পাগড়ি বাঁধার পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ছিল। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যত্র নারীমাত্রই শাড়ি পরত। চট্টগ্রামে আরাকানি শাসন প্রভাবে 'ঘামচা' ও 'উড়নী' দুই খণ্ড কাপড় পরত মেয়েরা। রাজপুরুষ ও সামন্ত-অভিজাত উচ্চবিত্তের শিক্ষিতরা পরত ইজার, কামিজ, কাবাই, চাপকান, আসকান, আলখাল্লা, চৌকা, সিনাবন্দ্ (waist coat) কোমরবন্দ্ ও পাগড়ি, শামলা কিংবা টুপি। গলাবন্দ্, দোয়াল, অঙ্গুরীয়ও তারা পরত। শাসকশ্রেণীর অনুসরণে হিন্দু রাজপুরুষ, ধনী এবং অভিজাতরাও পরত এসব পোশাক (কাল ধল রাঙা টুপি সবার মাথে/পাসরি পটকা দিয়া বান্ধে কোমরবন্ধ। —রূপরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল)।

আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান কিংবা সরকারি চাকরিভেদে এসব পোশাক সুতোর, রেশমের, জরির কিংবা সোনা-রুপা-মুক্তা-মণিখচিতও হত। ধনীঘরের বউ-ঝিরা কাঁচুলি (Bodice) এবং অন্তর্বাস বা ছায়া (petti coat) পরত। গরিব ও মধ্যবিত্তের পোশাক ছিল মোটা তাঁতে নির্মিত। ঘরে ঘরে চরকায় সূতা তৈরি হত। তাঁতি শুধু বানিয়ে দিত।

চটক, মটক, গরাদ, ধুতি ছাড়াও শাড়ির মতো মোটা-পেড়ে নানা ধুতি ছিল। মেয়েদের ছিল ময়ূর পেখম, আগুন পাট, কালপাট, আসমান তারা, হীরামন, নীলাম্বরী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঁএগ্রা, নেত, মঞ্জাফুল, অগ্নিফুল, মেঘডুম্বুর, মেঘলাল, গঙ্গাজলি প্রভৃতি নানা নামের শাড়ি। মসলিন, পাটাম্বর তথা রেশমের (সিল্কের) কারুখচিত বহুমূল্য শাড়ি ছাড়াও উচ্চমূল্যের বেলন পাটের (সিল্কের) নেতের শাড়িও আনুষ্ঠানিক ও পার্বণিক প্রয়োজন মিটাত।

১৩

বৃত্তিভেদে নিম্নবিত্তের নিরক্ষর দেশজ মুসলিমসমাজ

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম প্রদত্ত বিবরণ :

রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল <u>গোলা</u>

তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি
পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারী।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারী
নিরন্তর মিথ্যা করে নাহি রাখে দাড়ি।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকার
জীবন উপায় তার পাইয়া তাঁতিঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগরে
তীরকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি
কলন্দর (ফকির) হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।
বসন রাঙাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম...
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই...
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা...।

সাধারণভাবে সৈয়দ, শেখ, তুর্কি, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলমানরা অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে কাজি, মোল্লা, শাস্ত্রবিৎ আলিম, সুফিসাধক, ফকির প্রভৃতি সমাজে মর্যাদাবান ও সম্মানিত ছিলেন। শিয়া-সুন্নি এই দুই মুখ্যভাগেও নানা উপসম্প্রদায় এখনকার মতোই ছিল। শিয়ারা আঠারো শতকে মুর্শিদাবাদ-ঢাকা প্রভৃতি শাসনকেন্দ্রে প্রবল হয়। সুন্নিদের মধ্যে হানাফি, সাফি, আহমদি ও হাম্বলি-মযহাব বা সম্প্রদায় ছিল। হানাফিরা ছিল সংখ্যাগুরু, অন্যদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তেমনি সুফিদেরও ছিল বিভিন্ন গুরুপন্থি খান্দান—চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া, নক্সবন্দিয়া, কাদেরিয়া, মাদারিয়া প্রভৃতি। গুরুবাদে বা পিরবাদে শরিয়ৎপন্থিদের অবিচল আস্থা ছিল।

বৃত্তি ও বর্ণভেদে হিন্দুসমাজ

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্ণিত বিবরণ :

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন।
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ
চিকিৎসা করএ পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ।

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী-শাঁখারী।
গোয়ালা তাম্বুলী তিলি তাঁতি মালাকার
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।
আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক
যুগী-চাষী, ধোপা-চাষী কৈবর্ত অনেক।
সেক্‌রা ছুতার সূরী ধোপা জেলে শুড়ী
চাঁড়াল বাগ্‌দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী।
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তেয়র
কেলি কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর।
বাইজী পটুয়া কান কসবী যতেক
ভাবক ভক্তিরা ভাঁড় নর্তক অনেক।

এমনি ছত্রিশ জাতের এ বৃত্তি-বেসাতের লোক নিয়ে ছিল হিন্দুসমাজ।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে সেলাই-করা কাপড়-জামা পরার রেওয়াজ ছিল না বলেই 'কাটিয়া কাপড় জোড়ে' রূপে দরজির পরিচয় দেয়া হয়েছে। এমনি লবণনির্মাতা মুলুঙ্গী, পান উৎপাদক বারুই, পালকিবাহক কাঁহার, সূত্রধর, কুমার, ঘরামি, কলু, বাজিকর, গায়েন, নট, বেদে উত্যাদি।

মন্থর হলেও মুসলিমসমাজ বিদ্যা ও ধন-মান যোগে বিবর্তন বা পরিবর্তনশীল ছিল। এ-সূত্রে স্মর্তব্য—'গত বছর জোলা ছিলাম, এবার শেখ হয়েছি, ফসল ভালো হলে আগামী বছর সৈয়দ হব।'

অথবা :

আগে ছিল উল্লা-তুল্লা পরে হৈল মামুদ
পিছনের নাম আগে নিয়া এখন হৈল মোহাম্মদ

অতএব সমাজে বৈষম্য ছিল ধনী-নির্ধনে, আশরাফে-আতরাফে। এবং সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পদ, বৃত্তি ও বংশভেদে কেউ ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়, কেউ-বা শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত ছিল। তবু মুসলিম-সমাজে হিন্দুর মতো জন্মসূত্রে জাতে-বর্ণে ঘৃণ্য-সম্মানিত হত না। মুখ্যত ধনই ছিল মানের মাপকাঠি। কাঞ্চনে অর্জিত কৌলীন্য কেউ ঠেকাতে বা অস্বীকার করতে পারত না।

ক. ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হয় যথ কুলীন মলিন।
ধন হোন্তে যথ কার্য পারে করিবারে।

[সৈয়দ সুলতান : নবীবংশ]

খ. অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন

অকুলীন ঘোড়ায় চড়িব কুলীনে ধরিব জীন।

[চট্টগ্রামের প্রাচীন ছড়া]

গ. নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক
ধন হোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর।

[সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ]

একালের মতো কৃতী ও কীর্তিমান পুরুষ ছিল সেই—

'যে দোলা ঘোড়া চলে,
আর
দশ বিশ জন যার আগেপাছে নড়ে।'

মুসলিম-সমাজেও কোনো কোনো বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। সামাজিক-বৈবাহিক সম্পর্কও অবাধ ছিল না কখনো :

ক. নারী বলে আহ্মি হই ধীবরের জাতি
আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।

খ. জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞ্জিবেক মোরে।

[নবীবংশ]

সে-যুগেও আভিজাত্যের উৎস ছিল তিনটে—ধন, বিদ্যা ও পদ। সমকালে তো বটেই ধন-বিদ্যা-পদধারীর বিচ্যুত বংশধরগণ অতীত-স্মৃতির পুঁজি নিয়েও কয়েক পুরুষ ধরে এমনকি চিরকাল সেই আভিজাত্য-গৌরব-গর্ব সামাজিক-বৈবাহিক জীবনে সুফলপ্রসূ রাখত। এরাই এবং মোল্লা-পুরুত-কায়স্থ-গোমস্তা-মুৎসুদ্দি ও ছোট বেনেরাই ছিল মধ্যযুগের সেই শাহ-সামন্তশাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সামন্ত প্রশাসকদের পরেই নিরক্ষর সমাজে ছিল এদের দাপট। এরাই ছিল গ্রাম্যসমাজে প্রধান। তবে রাজতন্ত্রের যুগে রাজনীতি দরবার-বহির্ভূত ছিল না বলেই এদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির এরাই ছিল ধারক ও বাহক। সে-যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থাণু ও স্থায়ী আচার ও অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত। কেননা, নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনা কিংবা আচার অশিক্ষা-আচ্ছন্ন দুর্গম গ্রামীণসমাজে সহজে পৌঁছত না।

দারিদ্র্য, অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও দুর্জনের দৌরাত্ম্য কোনো যুগেই নতুন কিংবা অনুপস্থিত ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের কোনো বিলাস কিংবা প্রাচুর্য ছিল না কোনো

কালেই। 'দুধভাত'ই তার পার্বণিক পরমান্ন।

> তরুণং সর্ষপ শাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি
> অল্প ব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্য জনো মিষ্ট মুশ্নাতি।
>
> (বৃত্তরত্নাকর : কেদার ভট্ট)

> *—কচি সরিষার শাক দিয়ে নয়া চালের ভাত আর*
> *পাতলা দই—সুন্দরি, অল্প ব্যয়ে এমনি ভালো খাদ্য*
> *গ্রাম্য লোকে খায়।*

নির্জিত লোক বেঁচে থাকাতেই তুষ্ট থাকত। 'শেখ শুভোদয়া'য় বিজয় সেনের জবানিতে পাই "আমার স্ত্রীপুত্র আছে, ঘরে ভাঙা খোরা আছে, কলসীতে খুদ আছে। তা-হলে আমি হতভাগা কিসে।" (সুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ১৭) আবার তখনো এমন দরিদ্র ছিল যার জীর্ণতম কুটির মেরামতের মতো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, আজও যেমন রয়েছে অসংখ্য নীড়হারা নির্গৃহ পরিবার। মুকুন্দরাম বর্ণিত ফুল্লরারও এমনি দুর্দশা স্মর্তব্য :

> চলৎ কাষ্ঠং গলৎ কুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম্
> গণ্ডূ পদার্থি মণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।

> *—কাঠ খসে পড়ছে, দেয়াল গলে পড়ছে, চালের তৃণ জড়ো*
> *হয়ে গেছে। আমার জীর্ণ ঘর কেঁচো-সন্ধানী*
> *বেঙে আকীর্ণ।*

বস্ত্রেরও অভাব ছিল। শীতের রাতে বস্ত্রহীনার করুণ দুর্দশার চিত্রও রয়েছে :

> ধূমৈরশ্রু নিপাতয় দহ শিখয়া দহন মলিনয়াঙ্গারৈঃ
> জাগরয়িষ্যতি দুর্গত গৃহিনী তাং তদপি শিশিরনিশি।
>
> [৩০৪নং আর্যাসপ্তশতী : কবি গোবর্ধন আচার্য]

> *—ধোঁয়ায় চোখে পানি ঝরে, দহনে দেহ উত্তপ্ত (দগ্ধ) হয়, অঙ্গারে দেহবর্ণ মলিন হয়, তবু দুর্গত গৃহিণী সারা শীতরাত্রি (হে অগ্নি) তোমাকে জ্বালিয়ে রাখে।*

গায়ে তখনো শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণ ছিল। প্রবলের প্রতাপ, দুর্জনের দৌরাত্ম্য, দুর্বলকে সেকালেও পিষ্ট ও ক্লিষ্ট করত :

> প্রতি দিবস ক্ষীণ দশস্তবৈষ বসনাঞ্চলোহতিকর কৃষ্টঃ

নিজনায়কমতি কৃপণং কথয়তি কুগ্রাম ইব বিরলঃ
[৩৭১ সং আর্যাসপ্তশতী]

বারবার হস্ত-ধৃত হয়ে দিনে দিনে ক্ষীণ দশাপ্রাপ্ত তোমার সুতোবিরল বস্ত্রাঞ্চল,—অতি করভারে পীড়িত জনবিরল কুগ্রামের মতো (এই সত্যই) নির্দেশ করে যে তোমার নিজপতি অতিকৃপণ।

বোঝা যাচ্ছে শোষণের করভারে পীড়িত গ্রামবাসী গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেত। ভিক্ষাবৃত্তিও ছিল (৪৯২), অরাজকতা ছিল (২৭), অত্যাচার-অবিচার-নিষ্ঠুরতাও ছিল (৩১৫ আর্যাসপ্তশতী)।

কবি-পণ্ডিতদের কাম্য জীবন :

১. গোষ্ঠীবন্ধঃ সরস কবিভির্বাচি বৈদর্ভরীতির্বাসো
গঙ্গা পরিসরভুবি স্নিগ্ধভোগ্যা বিভূতি।
সৎসুস্নেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে
ভক্তির্লক্ষ্মী পতিচরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি।
(ধোয়ী)

বঙ্গানুবাদ :

সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য, বৈদর্ভী রীতিতে কাব্য রচনা,
গঙ্গাতীরভূমিতে বাস, ধনৈশ্বর্য আত্মীয়-স্বজনের ভোগে লাগা,
সজ্জনের সহিত মৈত্রী, রাজসভায় আচার্য কবির সম্মান এবং
লক্ষ্মীপতির চরণ কমলে ভক্তি যেন আমার জন্মান্তরেও হয়।
(সুকুমার সেন প্র. বা. বা. পৃ. ২৭)

২. আদর্শমানুষের সংজ্ঞা এরূপ :

মাতোবাসীৎ পরস্ত্রীভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন ষঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্যাদাভঙ্গভীরুঃ সকরুণ হৃদয়স্ত্যক্ত সর্বাভিমানো
ধর্মাত্মা তে স এষ প্রভবতি ভগবন পাদ পূজাং বিধূধাতুম
(রামচন্দ্র কবিভারতী : ভক্তিশতক)
—সুকুমার সেন: প্রা. বা. বা. পৃ. ৪১

—পরস্ত্রী যার কাছে মাতৃসমা, যে পুরুষ পরধনে নিস্পৃহ; যে মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, প্রাণিহন্তা নয়; যে মানীর মান ভঙ্গে ভীত, যে করুণাহৃদয়, যে নিরভিমান— সে মহাত্মাই ভগবানের পূজার অধিকার পায়।

১৪

আদব-লেহাজ-তবিয়তেই সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। কবি আলাউলের তোহফায় 'মুসলিম আচরণ' বিধির উল্লেখ আছে। অন্যত্র তেমন কিছু মেলে না। পিতামাতা, পির ও গুরুজনদের কদমবুসি করা, মান্য ও গুরুজনদের চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, গুরুজনদের সুমুখ থেকে উঠে আসতে পিছু হঠে আসা, লাঠি হাতে বা জুতো পায়ে গুরুজনদের সামনে না যাওয়া, তাঁদের সামনে তামাক না খাওয়া, উচ্চাসনে বা সুমুখ সারিতে না বসা, বাম হাত দেয়া-নেয়া না করা, গুরুজন কিংবা মান্যজনকে কিছু দিতে বা তাঁর থেকে কিছু নিতে হলে জোড়হাতে নতশিরে দেয়া-নেয়া করা, তাঁদের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বা রূঢ় কণ্ঠে কথা না বলা, পথে তাঁদের আগে না চলা, মজলিশে বা ঘরে মান্যজনের নেতৃত্বে একসঙ্গে খাওয়া শুরু ও শেষ করা, মান্যজনের দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা, বৈঠকে বা সারিতে বা মজলিশে দুজনের মধ্যদিয়ে চলতে হলে দুই বাহু প্রসারিত করে দেহ বাঁকিয়ে (রুকুহ্‌র মতো) চলা, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরে না ডাকা, বয়স্ক কনিষ্ঠদেরও সন্তানের নাম করে 'অমুকের বাপ বা মা' বলে ডাকা, বাসনে অল্প অল্প করে খাদ্যবস্তু নিয়ে ছোট ছোট গ্রাসে খাওয়া এবং ঠোঁট বন্ধ করে চিবানো, পা দেখিয়ে বা ছড়িয়ে না বসা, মান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করা প্রভৃতি ছিল সার্বক্ষণিক সাধারণ আদব-কায়দার অঙ্গ। গাঁয়ে অধিকাংশ লোক ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিত, তাই এসব অমান্য করবার মতো উদ্ধত দ্রোহী ছিল বিরল।

১৫

নবজাতককে, খৎনায় কিংবা কানফোড়নে ছেলেমেয়েকে, বিবাহে নব দম্পতিকে ও নতুন কুটুম্বকে নজর, শিকলি ও উপহার দেওয়াও ছিল রেওয়াজ। নাপিত-ধোপা-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-ওস্তাদ-ভৃত্য-গোলাম-বাঁদী প্রভৃতিও এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বকশিশ পেত। সমাজে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু ও বিচিত্র। এরা প্রতিঘরের পরিজনই যেন ছিল। উৎসবে-অনুষ্ঠানে তারা ছিল অপরিহার্য। ধনী ও অভিজাতদের দু-দশ ঘর গোলাম-বাঁদী থাকত।

সাধারণের ঘরবাড়ি হত মাটির ও বাঁশের। গরিবের দোচালা, সাধারণের চৌচালা এবং উচ্চমধ্যবিত্তের আটচালা ঘরও থাকত। গরিবের ঘর-কুটির, মধ্যবিত্তের বাড়ি-ভবন, ধনীর অট্টালিকা, রাজার প্রাসাদ-মহল। বাড়ি হত সাধারণত চক-মিলানো। চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ঘরের প্রবেশকক্ষকে 'হাতিনা', মধ্যকক্ষকে 'পিঁড়া' ও পেছনের শেষ কক্ষকে 'আওলা' বলে। 'পিঁড়া'র উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও মেলে।

গাঁয়ের মানুষের এক.বা একাধিক (ঈর্ষা-অসূয়াজাত দলাদলির কারণে অথবা আশরাফ-আতরাফ ভেদে) 'মাহালত' বা সমাজ থাকত। একজন প্রধান সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বরের নেতৃত্বে প্রতি গোষ্ঠী-নেতার সহযোগে সামাজিক, পার্বণিক, আনুষ্ঠানিক কাজ এবং মৃতের সৎকারাদি, জেয়াফত-বিবাহাদি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদাদির সালিশ-ইনসাফ-মীমাংসা হত।

১৬

অদৃষ্টবাদী কুসংস্কারপ্রবণ সমাজে নজুম-গণক-দৈবজ্ঞ-দরবেশের কদর ছিল। দান-সদকায় 'বলা'-বালাই এড়ানোর সহজ পন্থা ছিল সবারই প্রিয়। ফাতেহাখানি-কুলখানি-জেয়াফত-মেজবানি যোগে ভোজ দিলে মৃতব্যক্তির পাপমোচন হয়—এ আদিম মানবিক ধারণা শাস্ত্রীয় প্রশ্রয়ে আজও প্রবল এবং মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্যে বুনো-বর্বর-ভব্য নির্বিশেষে মানুষ চিরকালই দান-পান-ভোজন অনুষ্ঠান আবশ্যিক বলে জানে ও মানে।

নিরক্ষর দরিদ্ররা তো বটেই, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও ফুল ও বাগানের আদর-কদর ছিল বলে মনে হয় না। কেননা আজকের দিনেও গাঁয়ে ফুল বা ফুলের বাগান দুর্লক্ষ্য। তবু সাহিত্যে ফুলের নাম করতে হয় বলেই প্রথাসিদ্ধ উপায়ে কবিগণ কিছু ফুলের নাম করতেন; মাধবী, মালতী, চম্পা, নাগেশ্বর, জাতী, যুথী, লবঙ্গ, কেতকী, বক, ভূমিকেশর, টগর, ভৃরাজ, গোলাপ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে দরিদ্র গৃহস্থঘরে তৈজস—হাঁড়া-সরা-পাতিল-বাসন-কর্দা-কর্তি (পানপাত্র) সবটাই ছিল কুমারের তৈরি মাটির। নারকেলের মালা ও ঝিনুক ব্যবহৃত হত চামচরূপে। কিন্তু সাহিত্যগ্রন্থে এসব মেলে না। কারণ সাহিত্যে সবকিছু কৃত্রিম এবং আদর্শায়িত রূপে চিত্রিত হওয়াই ছিল নিয়ম। তা ছাড়া সে-যুগে সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবতা ও রাজা-বাদশার কাহিনী। কাজেই গরিবঘরের তৈজস-আসবাবের কথা সেখানে মেলে না। হর-পার্বতী, ফুল্লরা, হরিহোড়ের মতো কোনো কোনো দরিদ্রের কিছু খবর মেলে বটে, কিন্তু তা পূর্ণচিত্র দেয় না। Manrique ও অন্যান্য পর্যটকের বিবরণ থেকে দরিদ্রের ভাঙা ঘরে সম্পদের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর-চাটাই ও মাটির হাঁড়া-সরা-ঘড়ার এবং জীর্ণ-ছিন্ন বস্ত্রের কথামাত্র ক্বচিৎ মেলে।

বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না ছাড়াও বাঙালির পিঠা সাধারণত গুড়, চালের গুঁড়ো, তেল, ঘি, দুধ যোগেই তৈরি হত। তাল, কলা, নারিকেল, খেজুর-রস প্রভৃতিও কোনো কোনোটাতে মিশ্রিত হত। এ ছাড়া চালভাজা, খই, দই, চিঁড়া, মুড়ি-মোয়া-বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি সুপ্রাচীন। দুধের রূপান্তরে দই, মাখন, ঘোল, ঘি, সন্দেশ, পায়েস, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন তৈরিতে এদের কৃতিত্ব গৌরবের।

বাদ্যযন্ত্রের নামেও দেখি প্রাচীনতা ও গতানুগতিকতা। ঢাক-ঢোল, ধামা, পিনাক, সারিন্দা, পাখোয়াজ, দোহরিমোহরি, চঙ্গ বাঁশি, ভরী, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরা, করতাল, কর্নাল, ভেউর, রবার, বেণু, সিঙ্গা, কাড়া, কবিলাস, ডম্বুর, মন্দিরা, তাম্বুরা, জঙ্গলা, শঙ্খ, দুমদুমি, নাকাড়া, দমা, মঞ্জীর, সানাই, বীণা, দোনা, তবল, ভূষঙ্গ, কাঁস, ভাঙ্গরি ইত্যাদি।

তেমনি যুদ্ধাস্ত্রগুলোও সেই রামায়ণ-মহাভারত যুগের। নতুন অস্ত্রের তথা কবির সমকালীন অস্ত্রের নাম মেলে না। শল্য, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, নারোচ, নালিকা, অসি, খঞ্জর, বিভিন্ন ধনুর্বাণ—অগ্নি, সিংহ, সর্প, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, গজ, বরুণ, মেঘবাণ ইত্যাদি। এগুলো মন্ত্রপূত হলে অমোঘ হয়। যুদ্ধবাহন—অশ্ব, গজ, রথ। যুদ্ধে বাদ্যও প্রয়োজন।

১৭

অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয় বাঙালির কৌম-সমাজের রীতি-নীতির কিছু কিছু রূপান্তরে আজও বিদ্যমান। সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-দেহতত্ত্বাদি তাদের মানস বিকাশের সাক্ষ্য। জড়বাদসুলভ

বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রাকৃত শক্তির পূজাও তাদের মধ্যে চালু ছিল। নারী-বৃক্ষ-পশু ও পাখি দেবতা, দেহচর্যা, জন্মান্তরে আস্থা, ঘট ও পাথর প্রতীকে দেবপূজা তাদের মধ্যে চালু ছিল। বর্ণাশ্রম ছিল না, বৃত্তিভাগ ছিল। নিরক্ষর সমাজে বৃত্তিগত সংস্কৃতি ছিল, সমাজে নৈতিক-চেতনা তেমন দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। নিষাদ-কিরাত সমাজে কৈবর্ত-শুঁড়ি-চণ্ডাল-হাড়ি-ডোম-তাঁতি-কামার-কুমার-নাপিত-চাষি-ওঝা-চিকিৎসক প্রভৃতি বৃত্তিই ছিল প্রধান।

মৌর্য আমলে জৈন-বৌদ্ধ মতের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্র-সমাজ-শাসন-ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে থাকে এদেশীয়রা। সে-সময়েও জৈন-বৌদ্ধ সমাজে বর্ণবিন্যাস ছিল না। ব্রাহ্মণ্য গুপ্ত ও শশাঙ্কের আমলে বর্ণবিন্যাস শুরু হয় এবং সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তা পূর্ণতা পায়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত অস্পৃশ্যতাদুষ্ট ছত্রিশ জাতি এভাবেই বিন্যস্ত হয়। উত্তর-ভারত থেকে সাগ্নিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন গুপ্ত আমলেই শুরু হয়, তবু সেনেরা নতুন একদল ব্রাহ্মণ আনয়ন করে এখানে গীতা-স্মৃতির প্রভাব প্রবল করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন ধরনের পূজাপার্বণ ও শাস্ত্রসম্পৃক্ত আনন্দ-উৎসব চালু হয়। জাতকর্ম, ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, শালাকর্ম, অশৌচ, শ্রাদ্ধ তিথি নক্ষত্রে উপবাসাদি ব্রত পালন; ধর্ম-সম্পৃক্ত শাবরোৎসব, কামমহোৎসব, হোলি, নৃত্য-গীত-কথকতার অনুষ্ঠান; বিবাহাদি সামাজিক উৎসব প্রভৃতি ছিল। জুয়া, মদ, বেশ্যা— এ তিনে লোকের আসক্তি ছিল, এবং পার্বণিক উৎসবে সামাজিকভাবেই উপভোগ করা হত এসব।

হিউ এনৎ সাঙের সময়ে সমতটের লোক ছিল শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তিবাসীরা ছিল দৃঢ় ও সাহসী, চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা ছিল সৎ ও অমায়িক। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশোপদেশ' কাব্যে বাঙালি ছাত্রদের ক্ষীণকায়, উগ্র ও মারামারিপ্রবণ বলে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানেশ্বর ও পরবর্তীকালের অনেক পর্যটক বাঙালিকে কুঁদুলে বলে জানতেন। বাৎস্যায়ন ও বৃহস্পতির মতে রাজপুরীতে ও উচ্চবিত্তের অভিজাতদের ঘরে নারীরা ব্যভিচার ও দুর্নীতিপরায়ণা ছিল। নারীর শাড়ি ও পুরুষের খাটো ধুতি পরার রেওয়াজ ছিল। সাধারণ লোক কায়িক শ্রমকালে পরত গামছা-কর্পটি। নারী বা পুরুষের ঊর্ধ্বাঙ্গ ক্বচিৎ ওড়না-চাদরাবৃত থাকত। চৌলি-কাঁচুলির আটপৌরে ব্যবহার নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের মেয়েদের মধ্যে ছিল না। অলঙ্কারে নারী-পুরুষে প্রভেদ ছিল সামান্য। বিত্তভেদে অলঙ্কার হত তালপাতার, শঙ্খের, পিতলের, কাচের, রুপার, সোনার ও মণিমুক্তার। অঙ্গুরী, কুণ্ডল, হার, কেয়ূর, বলয়, মেখলা, মল প্রভৃতি বহুলব্যবহৃত অলঙ্কার। বাঙালি নারী-পুরুষের কোনো শিরোভূষণ ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ও ভিক্ষুরা কাঠের খড়ম পরত, পদস্থ সৈনিকরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করত, ছাতা ছিল পাতার ও কাপড়ের, বিজনী ছিল তালপাতার, বাঁশের ও বেতের। সিন্দূর, কুমকুম, চন্দন, আলতা প্রভৃতি ছিল প্রসাধনদ্রব্য। বীণা, বাঁশি (বিভিন্ন ধরনের), মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, করতাল, ডম্বুরু, কাণ্ড (কাড়া), কাহল প্রভৃতি ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরে দেবদাসীরা ও বেশ্যারা এবং হাড়ি-ডোমেরা গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে ছিল। ভেলা-নৌকা-গরু-টানা শকট ছিল যানবাহন। এ ছাড়া বড়লোকের বাহন ছিল ঘোড়া, গাধা ও হাতি। ধান, ইক্ষু, কলাই, নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, লেবু, পান প্রভৃতিই প্রধান ফল ও ফসল ছিল। এদেশেও ক্ষৌম (শণের সূতার তৈরি), দুকূল ও সূতী কাপড় তৈরি হত। রঙ ও নকশার ব্যবহারও ছিল। সাধারণের গার্হস্থ্যজীবনে প্রয়োজনীয় দারু-কারু ও চারুশিল্প এবং মূর্তিশিল্পের শিল্পী ছিল অবশ্যই দেশী লোক। খাজা, মোয়া (মোদক), নাড়ু, খাঁড়, পিঠা, ফেনি (বাতাসা), কদমা, দুধশাকব (পায়েস),

ক্ষীরসা, দই, শিখারিনী (ঘি দই গুড় আদা দিয়ে তৈরি—সুকুমার সেন) প্রভৃতি ছিল মিষ্টান্ন। জাড়ি, ভাণ্ডী, হাঁড়ি, তেলাবনী (তেলোন) প্রভৃতি ছিল মৃৎপাত্র। অবশ্য শাস্ত্র, শিক্ষা, বিত্ত ও বৃত্তিভেদে খাদ্য, আসবাব-তৈজস-পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরদোর প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ছিল। আমরা কেবল সাধারণ-রূপের কথাই বললাম।

এ সূত্রে একটা কথা উল্লেখ্য যে, আর্যরা 'ঋক্'বেদের কতকাংশ সঙ্গে করে বিজেতা হিসেবে ইরান থেকে ভারতে প্রবেশ করে। ইরানে জাতিদ্বন্দ্বে এরা ছিল দেশত্যাগী। আর্যরা ছিল প্রাকৃতশক্তির হোতা ও পশুপালক এবং সে-কারণে অর্ধ-যাযাবর। ইষ্টফল বাঞ্ছা করে তারা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতশক্তির উদ্দেশে যাতবেদের (অগ্নির) মাধ্যমে যজ্ঞ হোম করত। এ স্তরে পশুপালনই ছিল তাদের মুখ্য জীবিকা। তখনো তাদের মধ্যে দেবপূজা চালু ছিল না। গোধনই তাদের প্রধান ধন। ক্রমে সংখ্যাগুরু দেশী লোকের প্রভাবে তাদের মধ্যে দেশী জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, ধ্যান, মন্দির-উপাসনা, মূর্তিপূজা, বৃক্ষ-পশু-পাখি ও নারীদেবতা পূজা চালু হল, সে-সঙ্গে এল নানা ব্রত-পূজা-পার্বণ এবং লৌকিক ও স্থানিক বিশ্বাস সংস্কার। এভাবেই বৈদিক জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা ক্রমে দৈশিক দেহতত্ত্বে ও পরলোকতত্ত্বে প্রভাবিত হয় এবং দৈশিক সাধনাতত্ত্বও গ্রহণ করে তারা। ফলে দেশী সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র ব্রাহ্মণ্য মতের, শাস্ত্রের ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, এমনকি ব্রাহ্মণ্য তথা আর্যতত্ত্বচিন্তার চরম বিকাশ-প্রতীক উপনিষদও পূর্ব-ভারতের অনার্য-মননে ঋদ্ধ বলে কারো কারো ধারণা। আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্ত তথা উত্তরাপথ-বহির্ভূত বাংলায় আর্যধর্ম-সংস্কৃতি প্রবেশ করে অনেক পরে এবং তা জৈন-বৌদ্ধ প্রাবল্যের ফলে গণ-মানবে কখনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সেন আমলেও পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ কারণে বাঙলায় আমরা গীতা-স্মৃতি-সংহিতার পাশে দেশজ লৌকিক দেবতার প্রাধান্যও দেখতে পাই। দুই বিরুদ্ধ মত ও সংস্কৃতির পুরাণ মাধ্যমে আপসের ফলে গড়ে উঠেছে বাংলার ব্রাহ্মণ্যবাদী পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ। এতে আর্যভাগ নগণ্য, অনার্য লক্ষণ প্রধান ও প্রবল। মুসলিম-সমাজেও ছিল স্থানিক ও লৌকিক বিশ্বাস-আচারের প্রবল প্রভাব। উনিশ শতকের ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে লৌকিক ইসলাম আজ বাহ্যত প্রায় অবলুপ্ত।

১৮

মধ্যযুগের সাহিত্যে যথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ সমকালীন সমাজচিত্র মেলে না। মুখ্যত বর্ণিত বিষয় ও বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হলে কিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া সে-যুগের সাহিত্যের বিষয় ছিল প্রাচীনকালের তথা অতীতের দেব-দৈত্য-নর কিংবা রাজা-বাদশাহ-সামন্ত-সর্দার। আজকালকার গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের মতো সমকালের ও স্বস্থানের জগৎ-জীবন-জীবিকা, সমাজ-সংস্কৃতি, সমস্যা-সম্পদ কিংবা আনন্দ-যন্ত্রণা সে-যুগের লিখিয়েদের রচনার বিষয় ছিল না; তাই সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র সেখানে দুর্লভ। কৃচিৎ কবির অনবধানতায়-অজ্ঞতায়-কল্পনার দৈন্যে সমকালীন প্রতিবেশ ক্ষণিকের জন্যে উঁকি মেরেছে মাত্র। তাই আমাদের লোকায়ত জীবনে, লোকাচারে, লোক-সংস্কারে, বিশ্বাসে, প্রথা-পদ্ধতি-অনুষ্ঠানে যে আদিম লোক-বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-রীতি-রেওয়াজ

অবিকৃত কিংবা রূপান্তরে আজও রয়ে গেছে, সে-তথ্য আমরা লিখিত সাহিত্যে পাইনে, পাই লোক-সাহিত্যে, লোক-আচারে ও গ্রামীণ উৎসবে-পার্বণে-অনুষ্ঠানে নানা আচার ও রীতিপদ্ধতির মধ্যে। আল্পনায়, লোকনৃত্যে, পার্বণিক লোক-সঙ্গীতে—যেমন গাজনে, গম্ভীরায় লোকবাদ্যে; যেমন—একতারায়-দোতরায়-শিঙ্গায়-বাঁশিতে, ভেঁপুতে, মন্দিরায়-খঞ্জনীতে ও ঢাকে-ঢোলে, আঁতুড়ঘরের আচারে, ষষ্ঠীপূজায়, সাধভক্ষণে, গায়েহলুদে, পানিভরণে কিংবা কলাগাছ-ঘট-আম্রসার, ধানে-দূর্বায়-হলুদে-দীপে-ধূপে-ধূনায়-তোলোয়াইতে (অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার মাথা তেলসিক্ত করা—অভ্যর্থনা আপ্যায়ন ও বরণ করার জন্যে), মারোয়া সাজানোর আচারে, দুধ-মাছ-তত্ত্বে, তুক-তাক-জাদু-উচাটনে, বসুমতীপূজায়, কুমারীর বীজবপনে, পানি মাঙনে ও নানা কৃষি ও বুননসংক্রান্ত ব্রতে, শক্তিপ্রতীক কাল্পনিক পিরপূজায়, বুনো হিংস্র জীবপূজায়, মহামারীর দেবতাপূজায় এবং প্রতিবেশানুকূল খেলাধুলায় আদি অস্ট্রিক-মঙ্গোলের অবিকশিত বুনোসমাজের ধ্যান-ধারণা ও আচার-সংস্কারের রেশ রয়ে গেছে—সেগুলোর কিছু কিছু আজও আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আরণ্য-মানবে ভিন্নাকারে দেখা যায় এবং অন্য দেশের বিভিন্ন আদিম বুনোমানুষের সংস্কারে সেগুলোর জড় মেলে। বিভিন্ন 'মটিফে' বিন্যাস বিশ্লেষণ হলে আচারে ও তাৎপর্যে সাদৃশ্য যাচাই করা সহজ হবে।

বাঙলার মৌল ধর্ম

সাংখ্য ও যোগ—এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি-যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে-যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে-যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা একরকম সুনিশ্চিত।

না বললেও চলে যে বাঙালি গোত্র-সঙ্কর বা বর্ণ-সঙ্কর জাতি। বাঙালির মধ্যে অস্ট্রিক প্রাধান্য থাকলেও ভোট-চীনার রক্তমিশ্রণ-যে বহুল পরিমাণে ঘটেছে, তা নৃতাত্ত্বিক বিচারেই-যে প্রমাণিত তা নয়, তাদের নানা আচার-আচরণেও দৃশ্যমান। বলতে কি, বাঙালির দেহে আর্যরক্ত বরং দুর্লক্ষ্য। আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাসনের প্রভাবেই আভিজাত্যকামী বাঙালি আর্য নামে পরিচিত।

বাঙালির শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানসপ্রসূত। তেমনি অনাদি-আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে 'নাথ' গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাঙলায় বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব-রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত মহেনজোদারোতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কোনো সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হূন-ইউচি-তুর্কি-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশিদিন রক্ষা করতে পারে নি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয়।

বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি যোগপদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তা ছাড়া দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষদেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান এবং কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্বও দেশী মনন-প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্বভারতীয় হলেও অস্ট্রিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এসবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন এবং একই লক্ষ্যে

নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র—তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায় এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্যশাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদা লাভ করে।

অতি প্রাচীন শিব—কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী-তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদিরূপও—তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের [সূর্য] দেবতার স্মারক-গুণও বিলুপ্ত হয় নি। বস্তুত দেবাধিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগপন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথপন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য নাথ-সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

এই যোগই শিব-সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া (এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত) মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি সুফিমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সুফিমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে ও নাথপন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্বও তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও এ যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজও চালু রেখেছে। আলেকজান্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউএন সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনি, মার্কোপলো, ইবনে বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে (শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির প্রভাব ও উদ্ভব লক্ষ করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগতত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে 'হুঙ্কার' তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও; কুলবৃক্ষ 'বকুল', আভরণ 'রুদ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যরই স্মারক :

মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম, ঝুলি, ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া।

(গোরক্ষ বিজয়)

এই কড়িও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের। মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর। এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের।

দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতূহলী হয়েছে। দেহ-যন্ত্রের অন্ধি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা ও পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ-অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ি, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্যে পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন। এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য,

ইঙ্গলা-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, চতুষ্চক্র বা ষটচক্র, বিভিন্ন দল-সমন্বিত পদ্ম, বাঁকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উলটা সাধনা প্রভৃতি নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।

এই সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ-সূর্য বা অগ্নি, ঠ-চন্দ্র বা সোম। হঠ—শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগজ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যা। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগগ্রন্থ অমৃতকুণ্ড। নেপাল ও তিব্বত আজও গুহ্যসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। ['সিধ যোগী উতরাধী বা উত্যর দিসি সিধ কা জোগ'—গোরখবাণী : ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, পৃ. ১৬]।

অতএব এই কায়াসাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালি তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করে নি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাংলাদেশেই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ করি। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই :

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে-জ্বালন ধারায়-সমন্দরে?), কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয় হয়েছিল :

পূরবদেশে পছাঁহী ঘাটি
[জনম] লিখ্যা হমারা জোঁগ
গুরু হমারা নাঁবগর কহী এ
মৈটে ভরম বিরোগ—

[গোরখবাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ]

—পূর্ব দেশে [আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী, গুরু [আমার] ভব-সাগরের নাবিক, আমি ভ্রমরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।

শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের 'গোর্খা' নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তা ছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজও বিদ্যমান। মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাংলা ভাষায় ও বাঙলাদেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল গীতি, যোগীর গান ও যুগীকাচ আজও বাঙলাদেশেরই সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত। এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন না— তাঁতি, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ি ও চাঁড়ালই ছিলেন।

ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রণা পুতা [শিষ্য] জাতি হমারী তেলী
পীড়ি গোটা কাঢ়ি লীয়া পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী
তেল গোটা পীড়ি লীয়াঁ খুলী দীবী মেলী

[গোরখবাণী, পিতাম্বর সম্পাদিত, পৃ. ১১৭]

এতেও এঁদের বাঙালিত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।

এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্ম-রহস্য থেকে মৃত্যু-লক্ষণ অবধি সবকিছুর সন্ধান করেছেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র, শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃতরসে পরিণত করতে চেয়েছেন। গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টিশক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনীশক্তি অক্ষত থেকে আয়ু বৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ বন্ধ হলে ধ্বংসের পথও হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের—

দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

বিন্দুর ঊর্ধ্বায়নের ফলে ললাটদেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়—এরই নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া ও আধুনিক বাউল।

চৈতন্যরূপ আত্মার রজঃ ও শুক্রতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজঃ ও শুক্ররূপে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজঃ, রক্ত ও শুক্রবিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহাধারে আবদ্ধ রাখে।

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশভূমি বাংলা। এখানেই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোঁহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়া পদ, বাউলগীতি, ধর্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষবিজয়, অনিলপুরাণ, যোগীর গান, যুগীকাচ, হাড়মালা, জ্ঞানপ্রদীপ, যোগকলন্দর, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শির্নামা, তালিবনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্যপরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে; তেমনি এদেশী লোকের ধর্মসাধনায় যোগতন্ত্র আজও অবিলুপ্ত। আজও হিন্দু-মুসলিমসমাজে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধপ্রভাবের স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষও বৌদ্ধদের দান। আজও বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি। বাংলা-পাক-ভারতের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধশাসন ও বৌদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী—উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে পাল-রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র-শাসন। এখানেই অভিন্ন সত্তায় মিলেছে

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীনকালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিককালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত ভারতবর্ষকে দান করেছে বাঙালিই।

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালি। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ'—অর্থে মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত [সৈয়দ সুলতান]। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস শুরু হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা রূপকাত্মক। তিনি বলেন, "চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যামাত্র।" [ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'-এর ভূমিকাস্বরূপ নাথপন্থের 'সাহিত্যিক ঐতিহ্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১—খ (৬)] ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তও সন্দেহ পোষণ করতেন। *(Obscure Religious Cult.)*

মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এইজন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় মতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালির এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালির জীবনে এবং মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য মত ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ-বিকৃতির ফলে পেলাম মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্যবিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামি বিকৃতিতে এল সত্যপির-কেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পির—যাদের দু-চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজও আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক রীতিনীতিতে আদিম *Animism, Magic-belief* প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরাঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও রিক্থের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিকভাবেই সত্য। তিনি বলেন :

> It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, in just Non-Aryan translated in terms of the Aryan speech... ... the ideas of 'Karma' and transmigration, the practice of 'Yoga', the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hindu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa—all these and much more in Hindu religious thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history in Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, eg. the cultivation of

some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the cocoanut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from Pre-Aryan ancestors.

[Indo-Aryan and Hindi PP. 31-32]

যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচারবর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচারবর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষমতবাদীরাই নাথপন্থি। আর হাড়িফা বা জ্বালন্ধরী পাদের অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিকযোগী। নাথপন্থিরা ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। আর পা-পন্থিরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজও প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমতভিত্তিক তথা আদি সাংখ্য-যোগতন্ত্র ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষকামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য-প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য-মননপ্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজও জীবন্ত উপাস্য দেবতা।

দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ। খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এজন্যে দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।

দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও অপান বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা বলে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনতে হয় :

মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।

[অক্ষয় কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় স্‌ং, পৃ. ১১৮]

বাঙালি মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু-চারটা আরবি-ফারসি পরিভাষা এবং আল্লাহ-রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতির বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়া-সাধনাকে ইসলামি-রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাঁদ ফকিরের 'বালকানামা'য় পাই :

দিল্‌সে বৈঠে রাম-রহিম দিল্‌সে মালিক-সাঁই
দিল্‌সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
ঘরে বৈঠে চৌদ্দ ভুবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বইছে ধারা।...
[প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮]

অতএব, বাঙলার ও বাঙালির আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন—পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলাদেশেও আল্লাহ-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধসমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে ওঠে বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিমসমাজ। তাই পূর্ব ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।

এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য এবং ক্ষেত্রপ্রাধান্যও—তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তা ছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভঙ্গ করে তথা পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে [লাঙ্গলের ফাল] গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে [যাতে হল পড়ে নি] প্রাণদান প্রভৃতি রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়-নিষাদীয় যাযাবরজীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়া ও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে জাদুতত্ত্বে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছাসিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কী বাধা আসে। কারণ-কার্য জ্ঞানের অভাবে এ প্রাতিকূল্য কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি ও মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারে নি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে জাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়—ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র—কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড আবার কখনো-বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব—কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। তা ছাড়া স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও তাকে এক্ষেত্রে প্রত্যয়ী করেছে।

---

১. শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজির বহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে ধর্ম বহুবার ব্যবহৃত। নাথ ও নিরঞ্জন, আদ্য ও পুরুষপুরাণ সব রচনায় সুলভ।
ইউসুফ জোলেখায় :
ক. মনে মনে ধর্ম আরাধন।
খ. বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাএ।
গ. ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
ঘ. ধর্মপথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর।
ঙ. জলিখাএ বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
চ. পর্মপথ স্মরি সত্বরে গমন।
চ. ধর্মের প্রসাদে আজি পুরিলেক আশ।
জ. ধর্ম-আজ্ঞা তোমার পুরিব মনস্কাম। ইত্যাদি অনেক।

আবার অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্যকামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জ্বরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকজীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকাপদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার।

কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিকজীবনের নিয়ামক। এরই আধুনিক নাম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর কোনো কোনোটি দার্শনিকতত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন জাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাপ্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে-ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত প্রতিবেশে ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা-রূপে পরিকীর্তিত। যে-কোনো সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি।

অতএব বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়—লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ-বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্মগোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান—জনমানবের জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতির প্রসূন, গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণসংস্কৃতির মূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালির পরিচয় ও আধুনিক বাঙালির ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এসবের সন্ধান আবশ্যিক।

বাঙালির ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোকজীবনে সে-প্রয়াস আজও অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকজীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানি-চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজও গরিবঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়।

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ই হয়তো দুঃখ-দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো-বা পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্যজীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

বাঙলায় সুফি প্রভাব

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাঙলাদেশে সুফি দরবেশ এসেছিলেন কি না ইতিহাস তা বলতে পারে না।[১] তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি[২] ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আল-মাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদূদুল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে[৩] স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আটশতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য 'Periplus in the Erythrean Sea' -এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব-বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। সে-সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়েছিল কি না জানা নেই; তবে পরবর্তীকালের পর্তুগিজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেদের জীবন-যাপন রীতির কথা স্মরণে রাখলে এ সম্পর্কিত অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালি মুসলমানেরা বর্মায় বর্মী স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা 'জেরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনি সঙ্কর মুসলমান হয়তো কিছু ছিল চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে ময়নামতীতে কিংবা কামরূপে যাতায়াত ছিল কি না বলা যাবে না। কেননা তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসারযুগে মুসলিম-বেনে বা তাদের সঙ্গীদের কেউ ইসলামপ্রচারে আগ্রহী হয় নি, এমন কথা ভাবব কেন! আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিমসমাজে সুফি মতবাদ প্রসার লাভ করে নি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যারা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্যসূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তারা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। দরবেশ না হলে তথা কেরামতির আভাস না পেলে, অজ্ঞ লোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতিরক্ষার গরজও বোধ করে না; আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজির(?) মতো সুফিরা এসেও থাকেন, তা হলে মুসলিমবিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন

---

১ সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০। *বাঙলাদেশে মুসলমান আগমনের যুগ*, ডক্টর আবদুল করিম, পৃ. ৯২-১০২।

২ ক. *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ : ৯২।
খ. *Memoirs of the Archaeological Survey of India* : K. N. Diksit. P . 87.
গ. F.A. Khan : *Pakistan Qurterly* (মাহে নও, মার্চ ১৯৬৭ সন)

৩ *History of India etc* : Elliot & Dawson Vol. I. P. 2.

করবার লোকই ছিল না। সুফিমত প্রসারের সঙ্গে দলে দলে সুফিরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাহ্-কেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।

কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সুফির সাক্ষ্যে প্রমাণ, বাঙলাদেশে তার আগেই বহু সুফির আগমন ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন মত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর সাগরেদ[১] সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমমানী কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকির নিকট লিখিত পত্রে আছে :

> God be prasied! What a good land is that Bengal where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrwardi order are lying buried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh Ahmad Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharifuddin Maneri, is lying buried at Sonargoan. And then there were Hazrat Bad Alam and Badr Alam Zahidi. In short, in the country of Bengal, what to speak of the cities, there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrwardi order are dead and gone underearth but those still alive are also in fairly large number.[২]

এতে বোঝা যায় চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে সুফিপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে কয়েকজন প্রাচীন সুফির কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহর খবর আমরা জানি, তাদের আগমন ও অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদমশহীদ।[৩] বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদমশহীদ বিক্রমপুরের এক সেনরাজা বল্লালের সমসাময়িক। আনন্দ ভট্ট রচিত 'বল্লালচরিতম' সম্ভবত এঁরই জীবনচরিত[৪] — লক্ষ্মণ সেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।[৫] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে[৬] বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পির বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং 'বদর মোকাম'খ্যাত বদর শাহ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচ পিরের অন্যতম পির বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে

১ Akbar-al-Akhyar : P. 166
২ *Bengal : Post & Present :* Vol. LXVII St. No. 130 ; 1948. P. 35-36.
৩ JASB. 1889 Vol. LVII. P. 12ff.
৪ JASB, 1896 (N.N. Basu) PP. 36-67.
৫ *Social History of the Muslims in Bengal down to 1538 A. D.* : Dr. A. Karim P. 87.
৬ JASB, 1896, PP. 36-67

এঁর অবস্থিতিকাল কারো মতে ১৩৪০, আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ।[১]

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজির নাম 'শেকশুভোদয়া'-র সঙ্গে জড়িত। কেউ-কেউ একে জাল গ্রন্থ বলে মনে করেন[২]। এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রিস্টাব্দের পরে বেঁচে থাকেন, তাহলে 'শেকশুভোদয়া' তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে, ভাষার বিকৃতিতে ও প্রাক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাসবিরল সে-যুগের গ্রন্থকার হিসেবে হলায়ুধ মিশ্রের ও লক্ষ্মণ সেনের নাম ও সত্যকাহিনী জড়িয়ে, আর্যা প্রভৃতির প্রাচীনরূপ রক্ষা করে ষোলো-সতেরো শতকে জাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে— অনুমান করতে অনেকখানি কল্পনার প্রয়োজন। 'শেকশুভোদয়া'সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস, শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনোতিতে বাস করতেন। অমৃতকুণ্ড তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরই মাহাত্ম্যমুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তাঁর কীর্তি-কথা বর্ণনা করেছেন 'শেকশুভোদয়ায়' (শেখের শুভ উদয়)[৩]।

আবদুর রহমান চিশতির[৪] মতে জালালুদ্দীন তাবরেজির পুরো নাম ছিল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজি। তিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাগরেদ ছিলেন।[৫] তিনি কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার বাকি, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, নিযামুদ্দিন মুগরা ও দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লি এলে তাঁকে সুলতান ইলতুতমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালুদ্দীন তাবরেজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙলায় আসেন নি। আসলে শেখ বাঙলা থেকেই দিল্লি গিয়েছিলেন। কেউ-কেউ আবার শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজি ও সিলেটের জালালুদ্দীন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন। শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজি বহুল আলোচিত সুফি।[৬]

ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমী নামে এক সুফির দরগাহ্ আছে।

---

১ ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ. ১৩২-১৩৩
খ. Dist. Gazetteers : Chittagong 1908, P. 56; Dinajpur, 1912, P 20
গ. মুসলিম বাঙলা সাহিত্য : মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ. ২৩

২ ক. Memoirs of Gaud and Pandua : A. A. Khan & Stapteton. PP 105-6.
খ. বা. সা. ই. পূর্বার্ধ : সুকুমার সেন
গ. শেখ শুভোদয়া

৩ ক. Ain-I-Akbari : Vol II.
খ. Akhbar-al-Akhyar : P 44.
গ. Khazinat-al-Asfiya, Vol I, P 278ff
ঘ. Social History of Bengal, Dr. A. Rahim.
ঙ. Social History of Muslims in Bengal down to 1538 A. D.—Dr. A. Karim PP. 91 96.

৪ Mirat-al-Asrar : D.U. MS. No. 16/AR/143, Folio 19.

৫ Akhbar-al-Akhyar : PP. 44-45.

৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থাদির অতিরিক্ত (ক) Khurahidi-Jahan Numa-Ilahi Baksh in JASB, 1895.
(খ) Sufism and Saints etc. : J. A. Sobhan P. 331.
(গ) Tadhkirat-I-Auliya-Hind : Pt. I Mirza Muhammad Akhtar Dellawari. P. 56
(ঘ) বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৯৬
(ঙ) Afdalul Fawad— Amir Khusru, P. 47.
(চ) বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায়।

ইনি ৪৪৫ হি. বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিল-সূত্রে দাবি করা হয়।[১] এক কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetteer-এ উল্লেখ আছে।[২] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহ্জাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলা শহীদের দরগাহ।[৪] ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।[৫] অতএব ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে শাহ রাহী পিরের দরগাহ্ আছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ্ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজীবের সদনসূত্রেও (১০৯৬ হি. ১৬৮৫-৮৬) মিলে।[৬] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।[৭] ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎসাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগিজেরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ্ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৮] ইনি গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম-উল-মুলক্ শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া ও তাঁর ওস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ্ সোনারগাঁয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রিস্টাব্দে[৯] এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহম্মদ খান বর্ণিত শেখ ফখরুদ্দিন অভিন্ন ব্যক্তি কি না বলবার উপায় নেই।

শেখ বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু

১ বঙ্গে সূফী প্রভাব : (১৯৩৫) পৃ. ১৩৮
২ District Gazetteer : Mymensingh 1917 : P. 152.
৩ History of Assam. 1926; E. Gait : P. 46ff.
৪ District Gazetteer, Pabna 1923 : P. 121-26
৫ Sufiism and Saints etc. : J.A. Sobhan P. 236.
৬ ক. District Gazetteer Bogra : 1910, PP. 154—5
খ. JASB, 1878, PP. 92—93
৭ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১৪০-৪১
৮ Ibn Battuta : Gibb.
৯ (ক) Hadith literature in India : Dr. M. Ishaq PP. 53-54
(খ) Islamic Culture : Vol XXVII No. 1. January 1953, P. 10, note 9
(গ) Social History of Muslims in Bengal : Dr. A. Karim, PP. 67-72.

ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর।[১] ইনিই সম্ভবত তাঁর নাম শূন্যপুরাণোক্ত নিরঞ্জনের রুম্মার দম-মাদার এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ্ এবং দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ মাদারের স্মরণার্থে বাঁশ-তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সুফির বহুলপ্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন।[২]

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওরফে জালালউদ্দীন সুরক্পুশ্ (Surkpush) নামে এক দরবেশও বাঙলায় এসেছিলেন। জাহান গস্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে এবং 'উছ' (Uchh)-এ তাঁর সমাধি আছে।[৩]

শেখ আখি সিরাজুদ্দিন উসমান, নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পির। ইনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পিরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পিরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাই'। তাঁর পুত্র নুর-কুতুব-ই-আলমের সাগরেদরা নূরী[৪] এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সুফিরা হোসেনী নামে পরিচিত ছিল।[৫] শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ-যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। সে-জন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হত। আলাউল হকের পুত্র ছিলেন নুর-কুতুব-ই-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নুর-কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার, গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নুর-কুতুব-ই-আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ ওরফে যদু, শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৬]

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানি জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকির সমসাময়িক ছিলেন। সিমনানি ইব্রাহিম শরকিকে লিখিত এক পত্রে বদ্‌আলম ও বদর আলম যাহিদ নামে দুজন সুফির উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর ছেলে রাজা-গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানি তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে-পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে গণেশ সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া ও রুহানিয়া সুফিকে হত্যা করেন।

১ (ক) Mirat-I-Madar by Abdur Rahman Chisti : A. H. 1064, Ms. D.U. No. 217. (ডক্টর আবদুল করিমের Social History, পৃ. ১১৩-এ উদ্ধৃত)
২ বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ১১২-১৩।
৩ (ক) Memoirs of Gaud and Pandua, P. 92.
(খ) Sufiism and its Saints etc. J.A. Sobhan (1933) PP. 236-37.
৪ Bengal : Past & Present : Prof. S. Hasan Askari : 1948, P. 36, note 13.
৫ Social History of Bengal : Dr. A. Rahim. P. 77.
৬ Riyad-as-Salam, P. 115-16.

Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. It is hoped through the spiritual grace of the souls of Suhrwardia and Ruhania saints of the past that in near future that kingdom of Islam will be freed from the hands of the luckless non-believers.[১]

শেখ বদরুল ইসলাম নুর-কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। রিয়াজুস সালাতিন-এ বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ : রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।[২]

এঁরা ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাজী[৩], খান জাহান আলী, শাহ আনোয়ার কুলি হালবী[৪], ইসমাইল গাজী[৫], মোল্লা আতা[৬], শাহ জালাল দাখিনী(মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রি.)[৭], শাহ মোয়াজ্জম দানিশ মন্দ্ ওরফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী, বাঘা)[৮], শাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরীদউদ্দীন শাহ লঙ্গর, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি[৯] প্রমুখ দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালউদ্দীন তাবরেজি (মৃত্যু ১২২৫ খ্রি.)[১০] মখদুম জাহানিয়া (১৩৭০-৮৩) ও শাহ্ জালাল কুনিয়াঈ (মৃ. ১৩৪৬) সোহরাওয়ার্দিয়া মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দিন (মৃ. ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ. ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, শেখ নুর-কুতুব-ই-আলম (মৃ. ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সুফি ছিলেন।[১১]

শাহ সফীউদ্দীন (মৃ. ১২৯০-৯৫?) কলন্দরিয়া সুফি ছিলেন। শাহ্ আল্লাহ্ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশ মন্দ্ নকশবন্দিয়া সুফি ছিলেন।[১২] ষোলো শতক অবধি চট্টগ্রামের সুফি শাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ?), শেখ ফরিদ, পির বদর আলম, কাতালপীর শাহ্ মসন্দর বা মোহ্সেন আউলিয়া, শাহ্পীর, শাহ্ চাঁদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহাঁ আবদুল ওহাব ওরফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পিরের নাম মেলে।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্, সিকান্দার শাহ, গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (যদু), রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্, হোসেন শাহ্

১ Bengal Past & Present 1948, PP. 36-37.

২ Riyad-as-Sultan : P. 110-11.

৩-৪ District Gazetteer : Hoghly P. 297ff, PP. 302-03.

৫ (ক) JASB, 1874, P.. 215ff.
(খ) Risalat-al-shuhda;
(গ) বাংলা একাডেমী পত্রিকা : ১৩৭৬ সন, ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার।

৬ JASB, 1872, PP. 106-07. 1873, P. 290.

৭ (ক) Akhbar-al-Akhyar : P 173,
(খ) Khazinat-al-Asfiya, Vol. 1. P. 399.

৮ JASB, 1904, No. 2. P. 108ff.

৯ বঙ্গে সূফী প্রভাব- পৃ. ১৪৩-৪৪.

১০ Akhbar-al-Akhyar, PP. 44-45.

১১ Riyasal-al-Salatin, PP. 115-16.

১২ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৯৩-১১৯।

প্রমুখের দরবেশ-ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহ্ জালালুদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নুর-কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানি, ইসমাইল গাজী, জাফর আলী খান, খান জাহান খান প্রমুখ সুফি রাজনীতি ও সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির দ্বারাই সুফিগণ মন জয় করেন।

২

মুসলমানদের বিশ্বাস হযরত মুহম্মদ, হযরত আলিকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। সে জ্ঞান আলি থেকে প্রাপ্ত হন হাসান, হোসেন, খাজা কামীন বিন জয়দ ও হাসান বসরী। এই কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসরী (মৃ. ৭২৮ খ্রি.), রাবিয়া (মৃ. ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহম (মৃ. ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দারুদ তায়ী (মৃ. ৭৮১), মারুফ করখী (মৃ. ৮১৫) প্রমুখই সুফিমতের আদি প্রবক্তা।

পরবর্তী সুফি জুননুন মিসরী (মৃ. ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সুফিমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। 'আল্লাহ্ আকাশ ও মর্তের আলো স্বরূপ'।[১] 'আমরা তাঁর (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি।'[২] এই প্রকার ইঙ্গিত থেকেই সুফিমত বিশ্বব্রহ্মতত্ত্বের বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে এগিয়ে যায়। যিক্‌র বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে : 'অতএব (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারকমাত্র'।[৩]

সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্য বোধি তথা 'ইরফান' কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সুফিদের বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী করেছে। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহ উস্ত' (সবই আল্লাহ), বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই হল তৌহিদ-ই ওজুদী তথা 'আল্লাহ্ সর্বভূতে বিরাজমান' এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন। বায়াজিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরাসানী (মৃ. ১০৪৯) প্রমুখ প্রথমযুগের অদ্বৈতবাদী সুফি। শরিয়ৎ-পন্থবিরোধী এসব সুফির অনেককেই নূতন মত পোষণ ও প্রচারের জন্য প্রাণ হারাতে হয়। মনসুর হল্লাজ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রমুখ এভাবেই শহীদ হন।[৪]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন : 'ভারতে সুফি প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সুফিমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সুফিমত প্রবেশ করে। তৎপূর্বে সুফিমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই'।[৫] তাঁর মতে এই ভারতীয় প্রভাব ভারতীয় পুস্তকের আরবি-ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে,

---

১ কোরআন সূরাহ্ ২৪ আয়াত ৩৫।
২ কোরআন সূরাহ্ ৫০ আয়াত ১৬।
৩ কোরআন সূরাহ্ ৮৮ আয়াত ২১।
৪ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৩৪।
৫ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৭৪।

ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে এবং আল বিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল যোগ এবং কপিল সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ।[১] বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধুদেশীয়) গুরু বু-আলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।[২] তিনি আরো বলেন, 'বাঙলা দেশে সুফিমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সুফিমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সুফিমতবাদের সহিত এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সূফিবাদ মতবাদ ও সাধনপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দুপদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে। ...চিশতীয়হ ও সুহরবরদীয়হ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতে আগমনের পর এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারতবিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮—১৪৪০ খ্রি.) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ ক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগ সাধনা ও সুফিদের "তস্বরফ্" বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সুফিরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরাও সুফিদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন।'[৩] আইন-ই-আকবরীতে[৪] চৌদ্দটি সুফি খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে।

আবুল ফজল হয়তো প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন। আমাদের অনুমানে তখন একেক পিরকেন্দ্রী একেক সম্প্রদায় ছিল। পরে তাত্ত্বিক ও আচরিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে ওঠার ফলে সম্প্রদায়-সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে। আর অ-প্রধানগুলো কালে লোপ পায়, স্থানিক সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা হারায়। এ কারণেই আবুল ফজল-কথিত চৌদ্দটি খান্দানের অনেকগুলি লোপ পেয়েছে।

চিশ্‌তিয়া ও সুহ্‌রাওয়ার্দিয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাঙলায় প্রসার লাভ করে।[৫] এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরো পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোলো শতক অবধি চিশ্‌তিয়া মাদারিয়া ও নকশবন্দিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই বেশি ছিল। মাদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত একসময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সুফির সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্নরূপ নিল। আচার ও চর্যার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা কবীরের (১৩৯৮—১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলন-বিরোধী আন্দোলনও শতোর্ধ্ব বছর পরে মুজদ্দদ-ই-আলফ-সানী শেখ আহমদ সরহিন্দীর (১৫৬৩— ১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। কিন্তু সে সংস্কার-আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পারে নি। নকশবন্দিয়া এবং কিছুটা কাদিরিয়া সম্প্রদায়েই এ সংস্কার-আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। আলফা-সানী স্বয়ং একজন নকশবন্দিয়া। বাঙলায় দেশী তত্ত্বচিন্তা ও চর্যার সঙ্গে ইসলামের বহিরবয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেই এই প্রচেষ্টাই লক্ষ করি। ভারতীয় যোগচর্যাভিত্তিক

১ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৭৫-৮০।

২ The Mystics of Islam : R.A. Nicholson : P. 17.

৩ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৩৮, ৪৫।

৪ Ain-I-Akbari-Jarrart. Vol. III. P. 360ff.

৫ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৫৫।

তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সুফিরা গ্রহণ করলেন, তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয়— নামত। কেননা, আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামি রূপায়ণ সীমিত রইল। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোক-কেন্দ্র। এদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর আলোময় হয়ে ওঠে, এ হচ্ছে এক আনন্দময় অদ্বয় সত্তা— এর সঙ্গে সামরস্য জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধি চিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[১]

সুফির যিক্‌র ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল। বহির্ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে (ইরানে সমরখন্দে বোখারায় বলখে) এবং ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দুপ্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদ ও (যোগতান্ত্রিক সাধকের অনুসৃতিবশে) সুফি সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সুফিমাত্রই তাই পির-মুর্শিদ-নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যেই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবরপূজারও (দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর স্তূপ পূজারই মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল। সুফিরা আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পিরের চেহারা ধ্যান শুরু করেন। শুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা ফিশ শেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ্‌'। প্রথমটি 'রাবিতা' গুরুসংযোগ, দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। এই 'মুরাকিবাহ'য় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পিরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দা'রা (আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি), সাকি, ইশক প্রভৃতি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সূফিদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ের বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃতি রয়েছে।[২]

সূফিদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞজন সাধারণ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানবশত অনেককাল পরিচিত হতে পারে নি। ফলে, 'তাহারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরাপুরি বাঙালিই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিল না ;...দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল—তাঁহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার-বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ত দেনই নাই, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদার ছিলেন। ....এখনও পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গীয় 'শয়খ' শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দুভাব, চিন্তা, আচার ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন (রয়েছে)। সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত (যত) হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।[৩]

---

১ (ক) Development of Metaphysics in Persia : Dr. M. Iqbal PP. 110-111.
(খ) বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৮১ (এই গ্রন্থে উদ্ধৃত : ইরশাদি-ই-খালক্কীয়হ —আবদুল করিম, ২য় সং, পৃ. ১২৫-১৩৩)

২ (ক) বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১৬৯-৮২। (খ) মুসলিম কবির পদসাহিত্য : ভূমিকা।

৩ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১৬৩-৬৪।

বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্যসাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদিযুগে সংস্কৃত ছিল বাংলা-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব-বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি— পালি ও পাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগে নি বলে আর কোনো বুলিই লেখ্যভাষার মর্যাদা পায় নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠি ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষায় রূপ পায়।

এরপরে মুসলমান আমলে ফারসি হল দরবারি ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক ভারতিক আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভালো। এসব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্যভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুইস্তরের অর্ন্তবর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শনরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কি আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল চৈতন্য-প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো উনিশ শতকে খ্রিস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারের, হিন্দু সমাজ-সংস্কারের এবং কোম্পানির শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলাভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ লাভ করে নি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজির চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায় নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

হয়তো দেশ শাসনের প্রয়োজনেই দেশীভাষার অনুশীলনের প্রবর্তনা দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ। যেমনটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেখেছি পরবর্তীকালে। কিন্তু সুলতান সুবাদারের প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেককাল অভিজাতরা বাঙলাভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়তো 'বুলি' বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনোদিন শক্তিমানের পরিচর্যা পায় নি, তাই অন্তত দশ শতক থেকে বাঙলাভাষায় সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারে নি। শেক্সপিয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাবহেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ।

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাঙলাকে ধর্মকথা তথা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায়—'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'—এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যশিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হন নি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করবার জন্যেই তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং এতে সাহিত্য-শিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস ছিল না; লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিতমাত্রই সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্যসৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেন নি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম-সম্পৃক্ত পাঁচালি রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয় নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

বাঙলাদেশের প্রায়-সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলাসাহিত্যের উন্মেষ-যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি; মুসলমানরাও তাঁদের সাথে-সাথে কলম ধরেছিলেন। এবং মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব-ধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা, সবরকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানবরসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এদেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানি সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয় নি। তাই মুসলমান-কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু-লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেন নি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত।

মুসলমান-রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা—যা মানুষ সম্বন্ধে

কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাসবাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।

বাঙলা-ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালিরা ইরানি ও হিন্দুস্থানি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এ দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায়-সব রচনাই (বৈষ্ণবসাহিত্যও) মূলত অনুবাদ ও অনুকৃতি এবং মুখ্যত পৌনঃপুনিকতাদুষ্ট। মৌলিক রচনা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেন নি, অর্থাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসিতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেন নি। বাঙলা তখনো তাঁদের চোখে 'বুলি' মাত্র। এযুগে শিক্ষিতজন যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিমুখ, সে-যুগে তেমনি তাঁরা বাঙলা ভাষা ও বাঙলা রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাচ্ছিল্যজাত এ অবহেলা বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্থর করেছিল।

এছাড়াও আর দুটো প্রবল কারণ ছিল :

(ক) সেন রাজারা বাঙলায় উত্তর-ভারতিক ব্রাহ্মণ্যসমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছিলেন। পাছে দেশী সংস্কৃতি সৃজ্যমান ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিকে বিকৃত করে, সম্ভবত এই আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এভাবে দেশী লোককে মূর্খ রেখে দেশের ভাষাচর্চার পথ রুদ্ধ রেখেছিলেন তাঁরা। আর তখন বস্তুত অবহট্‌ঠ-এর যুগ। তাই অবহট্‌ঠ-এর যুগে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ দান করা রাজকীয় ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(খ) অপরদিকে দেবভাষা সংস্কৃত ও স্বর্গীয় ভাষা আরবি থেকে শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে গণ্য হত; ভাষান্তরিত হলে মন্ত্রের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে—এ ধারণা আজো প্রবল। মুসলমানের অতিরিক্ত একটা বাধা ছিল, তারা বাঙলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজার বাঙলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজার সমর্থন ছিল বলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাংলা চর্চা ব্যাহত করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা পাঁতি দিলেন :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আঠারো শতক অবধি ঐ বিরূপতা-যে ছিল, তার প্রমাণ মেলে অবজ্ঞাসূচক একটি বাঙলা ছড়ায়। এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে :

কৃত্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুণ-ঘেঁষে
—এ তিন সর্বনেশে।

শাস্ত্রকথার বাংলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমানসমাজও সতেরো শতক অবধি মুখর ছিল, তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের সুরে। এঁদের কেউ-কেউ তীব্র প্রতিবাদীও : যেমন—

শাহ্ মুহম্মদ সগীর (১৩১০—১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে) বলেন :

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আক্ষি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হএ কথা সাচা।

সৈয়দ সুলতান [১৫৮৪ খ্রি.) বলেছেন :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।

ফলে *আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা*
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।

কিন্তু *যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন*
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।

তবু *যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।*
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছেত দূষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি।

অবশ্য *মোহোর মনের ভাব জানে করতারে*
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদও [ষোলো শতক] নিঃসংশয় নন, তাই তিনি হতে পারেন নি :

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

মনের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক-সাধারণকে বলছেন :

হিন্দুয়ানী অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা
বাঙ্গালা অক্ষর প'রে 'আজ্ঞি' মহাধন
তাক হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে-আজ্ঞি পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে যে জানৌক রাত্র দিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ।

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রি.) ভয় :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ
মুসলমানি শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

আমীর হামজা (১৬৮৪ খ্রি.) রচয়িতা অবদুন্ নবীরও সেই ভয় :

মুসলমানী কথা দেখি মনেঁহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়।

রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই, পরন্তু যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ও অশ্লীল উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তিনি :

যেইদেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেইবাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

হিন্দুয়ানি মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-যুগের আর কোনো মুসলিম-কবির দেখা যায় না।

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি না সে-বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তিপ্রবণতার পরিচয় মেলে।

উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা' [দ্বিজ শ্রীধর ও রামচন্দ্র খান], কারুর মতে 'লোক ভাষা' [মাধবাচার্য ১৬ শতক], কেউ বলেন লৌকিক ভাষা [কবিশেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক 'দেশী ভাষা' এবং কিছুসংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল 'গৌড়িয়া'।

মধ্যযুগে হিন্দুয়ানি ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসপ্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে-বিরূপতাও রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়।

তুর্কি ও মুঘলেরা এদেশে মুসলিম শাসন দৃঢ়মূল করবার প্রয়োজনে বিদেশী ও দেশী মুসলিম-মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জিইয়ে রাখতে প্রয়াসী হন। ধর্মের উৎসভূম আরব এবং শাসক ও সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্র ইরান-সমরকন্দ-বুখারার প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাবোধ ও মানস-আকর্ষণ সৃষ্টির ও লালনের উদ্দেশ্যে কাফের-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে স্বাতন্ত্র্যবোধ জিইয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠীর একটি সচেতন প্রয়াস ছিল। আলাউল হক, তাঁর পুত্র নুর-কুতবে-আলম, জাহাঁগীর সিমনানী, মুজাদ্দিদ-ই আলফ্ সানী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতির পত্রে এ মনোভাবের আভাস আছে। আর মুসলিম-রচিত ইতিহাসের ভাষায় আর ভঙ্গিতেও হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট। অনুকূল পরিবেশে এই বহির্মুখী মানসিকতা মুসলিম-মনে ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে। ইরানে সাফাবী বংশীয় রাজত্বের অবসানে কিছুসংখ্যক বাস্তুত্যাগী ইরানি নাকি বাঙলায়ও বসবাস করতে এসেছিল। সম্ভবত তাদের সাহচর্য আভিজাত্যলোভী দেশী মুসলমানদের বহির্মুখী মানসিকতাকে আরো প্রবল করেছিল। ফারসি ভাষার বাস্তব গুরুত্বে ও ইরানি সংস্কৃতির মর্যাদায় প্রলুব্ধ বাঙালি তা গ্রহণে-বরণে (উনিশ শতকের বাঙালির ইংরেজি ও বিলেতি সংস্কৃতি গ্রহণের মতোই) আগ্রহ দেখাবে—এ-ই ছিল স্বাভাবিক।

এমনিতেই আভিজাত্যলোভে শিক্ষিত দেশী মুসলমানরা চিরকাল নিজেদের বিদেশাগত মুসলমানের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। ফলে রব্বী খান বাহাদুর তাঁর 'হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা' (অনুবাদ: The Origin of the Musalmans of Bengal, 1895 A.D) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাঙালি মুসলমানেরা প্রায়-সবাই বহিরাগত। আঠারো

শতকে কোম্পানি-শাসন প্রবর্তিত হলেও নবাবি আমলের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অনেককাল বিলীন হয় নি। ফারসি ছিল ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি দরবারি ভাষা। কাজেই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সমাজ তখনো মধ্যযুগীয় আমিরি স্বপ্নে বিভোর, যদিও তাদের অজ্ঞাতেই তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল। যখন দুর্ভাগ্যের দুর্দিন সত্যই তাদের সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল, তখনো হৃতসর্বস্ব মুসলমান উত্তর-ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল জ্ঞাতির ঐশ্বর্যগর্বে নিজের দীনতা ভুলবার নিষ্ফল আশায়। তখন আরবি নয়, এমনকি ফারসিও তত নয়, উর্দুপ্রীতিই তাদের মানসিক সান্ত্বনার অবলম্বন হল। "উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।" [১৯২৭ সন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার জীবন-চরিত, ভূমিকা। মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহমদ। ইনি নিজে ছিলেন বাঙলা লেখক ও সাংবাদিক।] তাই নওয়াব আবদুল লতিফের (১৯২৬-৯৪) মুখে শুনতে পাই : 'বাঙলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষা বাঙলা। আর অভিজাতদের ভাষা উর্দু।'
বাঙলার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কত বিচিত্র ছিল তার দু-একটি নমুনা দিচ্ছি:

> A Muhammadan Gentleman about 1215 B.S. (1808 A.D) enjoined in his deathbed that his only son should not learn Bengali, as it would make him effiminate... ... Muhammadan gentry of Bengal too wrote in Persian and spoke in Hindustani.
>
> (JASB 1925 PP 192—93 : A Bengali Book written in Persian Script; Khan Saheb Abdul Wali)

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের পূর্ব-উদ্ধৃত উক্তিও স্মর্তব্য।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী' (১৩১৫ সন) গ্রন্থে লিখেছেন : 'মুন্সী সাহেব (তার শিক্ষক) বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না।'

মীর মশাররফ হোসেনের 'গৌরাই ব্রীজ বা গৌরীসেতু' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম চন্দ্র (?) যে মন্তব্য করেছিলেন তাতেও মুসলিম সমাজমনের পরিচয় পাই : "যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করিবেন, ততদিন সে [হিন্দু-মুসলমান] ঐক্য জন্মিবে না।"

[হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তখনো ছিল না—শাসক-শাসিতসুলভ অবজ্ঞা-বিদ্বেষের জেরই বিদ্যমান ছিল।]

'বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা।' (নবনুর : ভাদ্র ১৩১০ সন : মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার—লেখক। কেন চিৎ মর্মাহতের হিতকামিনা—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ)।

"আমি জাতিতে মোসলমান,—বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে।" [হিন্দু-মুসলমান

(ঢাকা ১৮৮৮ সন) গ্রন্থলেখক শেখ আবদুস সোবহান। ইনি 'ইসলাম সুহৃদ' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।]

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল কাদির ও ওহাবী (মুহম্মদী) আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের বাহন ছিল উর্দু। সে-সূত্রেও ইসলামি সাহিত্যের আধাররূপে উর্দু ধর্ম ও জাতি-প্রাণ মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ কারণে শেখ আবদুর রহিম, নওশের আলী খান ইউসুফজাই, মৌলানা আকরম খান প্রমুখ অনেক বাঙলা-লেখকও উর্দুর প্রয়োজনীয়তা (পাকিস্তান পূর্বযুগেও) অনুভব করতেন। শেখ আবদুর রহিম বলেছেন : "... বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলতে পারে না, ধর্ম ভাষা আরবী, তৎসহ ফারসী এবং উর্দু এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা।" (৮ই পৌষ ১৩০৬ সন—মিহির ও সুধাকর)।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান বলেছিলেন—'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।' (তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন : অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ)

সাধারণভাবে বলতে গেলে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বাবধি (১৯২০ খ্রি.) একশ্রেণীর বাঙালি মুসলমান উর্দু-বাঙলার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষিত এবং জমিদার অভিজাতরাই ছিলেন বেশি। বাঙালি মুসলমানের অশিক্ষার সুযোগ উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি স্ব-আরোপিত (Self-assumed) অবাধ নেতৃত্ব পেয়েছিলেন নবাব আবদুল লতিফ, আমীর হোসেন (বিহারী), সৈয়দ আমির আলী, নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নবাব আলী প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমের উর্দুভাষী বংশধরগণ। তারাই বাঙালি মুসলমানের মুখপাত্র হিসেবে উর্দুকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষারূপে বিদ্যালয়ে চালাবার স্বপ্ন দেখতেন। পাকিস্তান-উত্তর যুগে তাঁদেরই বংশধর কিংবা জ্ঞাতিত্ব-লোভীরাই উর্দুকে বাঙালির উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াসী ছিলেন। আজও একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও সাহিত্যিক বাঙলায় আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা উর্দুর স্বাদ পাবার প্রয়াসী!

অতএব, গোড়া থেকেই বাঙলাভাষার অনুশীলনে মুসলমানরা বিবিধ কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আজও সে-দ্বিধা থেকে তাদের অনেকেই মুক্ত নয়। এভাবে বাঙলা মুসলিম গুণী-জ্ঞানীর আন্তরিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত ছিল। তার ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম অবদান যতখানি থাকা বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক ছিল, তা মেলে নি। সৈয়দ সুলতান প্রমুখ কবিরা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বহু যুক্তি দিয়ে তাঁরা একদিকে নিজেদের বাঙলা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে বিরূপ সমালোচনা প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ

বাঁচার তাগিদই মানুষের সব কর্মপ্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি ও উৎস। এর থেকেই জন্মে প্রতিবেশ-পরিবেষ্টনীর—জীব-উদ্ভিদের সঙ্গে সখ্য ও শত্রুতা। আগাছার জঙ্গল কাটতে হয় আর সযত্নে রাখতে হয় খাদ্য-ফলের গাছ। জীবনের নিরাপত্তা ও জীবিকার সহায় কুকুর পায় লালন আর প্রাণবিনাশী সাপ-সিংহ পায় তাড়ন। মানুষের স্বশ্রেণীর মধ্যেও সখ্য ও শত্রুতা ঐ একই কারণে গড়ে ওঠে। সমস্বার্থে জন্মে গড়ে ওঠে ঐকমত্য ও সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের সদিচ্ছা আর অসমস্বার্থে বিদ্বেষবিষ, বাধে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

একদিন এই সমস্বার্থেই প্রয়োজন হয়েছিল যৌথ প্রয়াসের—গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় সংহতি। আরো পরে জীবিকাসামগ্রীর অপ্রতুলতা মানুষকে প্রবর্তনা দিয়েছিল বিভিন্ন গোত্রের সহাবস্থানে ও সহযোগিতায়। এ স্তরে মিলনের সেতু হয়েছিল স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের অঙ্গীকার এবং ভিত্তি হয়েছিল স্বীকৃত নীতি। এই অঙ্গীকারের ও নীতির রকমফের ক্রমে গড়ে তোলে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও পথ। গোড়ার দিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সার্বিক সংহতি লক্ষ্যে যার উদ্ভাবন, তা-ই এভাবে খণ্ড ও ক্ষুদ্র সংহতির আধার-রূপে দলীয় ও উপদলীয় নিত্য কোন্দলের কারণ হয়ে দেখা দিল। বলেছি, সম ও সহস্বার্থেই গড়ে ওঠে দল। 'প্রবলের উদ্‌বর্তন' নীতিভিত্তিক সমাজে সম ও সহস্বার্থবোধ স্থায়ী হতে পারে না। আত্মশক্তিসচেতন ও আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কাজেই তৈরি হয় নতুন নতুন দল। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল গঠনের ভিত্তি। আবার স্বার্থবোধই মনের ও মতের ঐক্য ও অনৈক্যের স্রষ্টা। অতএব স্বার্থের প্রেরণাবশেই সখ্য ও সংহতি কিংবা বৈর ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্যদের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ করেই স্বদলের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা অটল রাখতে হয়।

সব দলই একরকম। শাস্ত্রীয় দল তথা ধর্ম-সম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবন-সম্পৃক্ত বলে ওতে আনুগত্য ও নিষ্ঠা বেশি ও চিরন্তন আর পার্থিব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দল ত্যাগে কিংবা ভঙ্গে পাপভীতি নেই বলে তা ঘনঘন প্রয়োজনমতো ভাঙা, গড়া ও ছাড়া চলে। তাই ধর্মীয় দলের পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও মারাত্মক। দলমাত্রেরই পূর্বশর্ত ও জন্মশর্ত অন্য দলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কোন্দল। ফলে ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার আগ্রহ সোনার পাথরবাটি বানানোর মতোই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা স্বধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মৌল শর্ত ও

বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে অনুভবে ও আচরণে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। তাই একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর পরমতসহিষ্ণু হতে পারে, কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধা রাখতে পারে না। পুরুষানুক্রমিক শাস্ত্রশাসন ও ধর্মবোধ আশৈশবের সংস্কাররূপে মনুষ্যমনে অবিমোচ্য হয়ে স্থায়ী হয়। সাধারণ মানুষ পোষমানা প্রাণীর মতো শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের নিগড়ে যান্ত্রিকজীবনে অভ্যস্ত ও স্বস্থ হয়। এই শাস্ত্র মেনেই ইহ-পরকালে প্রসারিত জীবনে সে থাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত। এই শাস্ত্র তার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এর বাইরে কিছু ভাবা বা করা সে পাপ বলেই জানে। তাই বিনাপ্রশ্নে সে শাস্ত্র মানে। এমন মানুষ বিধর্মী-বিদ্বেষী না হয়ে পারে না। বিধর্মে অনাস্থা ও বিধর্মী-বিদ্বেষ স্বধর্মনিষ্ঠার ও আদর্শ শাস্ত্রীয় জীবনের লক্ষণ। হিন্দুতে মিসকিন খাইয়ে, মোল্লাকে দক্ষিণা দিয়ে পুণ্যার্জনের যেমনি আশা করতে পারে না; তেমনি পারে না মুসলমানও কাঙাল-ভোজন করিয়ে, ফিৎরা বা যাকাত কাফেরকে দিয়ে। এইজন্যেই ধার্মিকেরা সাধারণত গোঁড়া অনুদার এবং বিবেচনাবোধ ও বিবেকবুদ্ধিহীন।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দেশ-জাত-বর্ণ ও শ্রেণীর ক্ষেত্রেও দলীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দল কম হয় নি বা হয় না। একালে আমরা ভৌগোলিক ভারতবর্ষে বিধর্মী-বিদ্বেষ তো বটেই, সে-সঙ্গে জাত-বর্ণ-শ্রেণীবিদ্বেষও প্রবল দেখছি। আফ্রিকায় দেখছি, আদিম গোত্র-দ্বেষণা ও বর্ণভেদ, আমেরিকায়ও রয়েছে বর্ণভেদ, অন্যান্য দেশেও ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র- চেতনা আজও অবিলুপ্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : " মুসলমান রাজত্বের পূর্বে 'হিন্দু' ঐ জাতীয় নামই ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদি প্রাচীন বর্ণমূলক জাতি; কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি। কিন্তু 'হিন্দু' জাতি ছিল না। ...হিন্দু ধর্মও ছিল না। ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্য সম্প্রদায়।" *(বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা ১৯)*। এ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও দেশজাত বর্ণধর্ম ও শ্রেণী-দ্বেষণার মূলে জীবিকা-সম্পৃক্ত অসূয়াবিরোধ ও প্রতিযোগিতাই কাজ করে। এ-যুগের ভাষায় এ দ্বন্দ্ব-দ্বেষণার কারণ মূলত আর্থিক। কেননা আমরা দেখতে পাই, যেখানে ভিন্ন গোত্রের বর্ণের জাতের শ্রেণীর বা ধর্মের লোক নগণ্যসংখ্যক, সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ নিষ্ক্রিয়বিদ্বেষী, অর্থাৎ কেবল অবজ্ঞাপরায়ণ ও উদাসীন। যেখানে বিভিন্ন গোত্রের, ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সংখ্যা নগণ্য নয় বরং সম্পদ সম্ভোগে ও অর্থোপার্জনে একে অপরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানেই জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র ও শ্রেণীবিদ্বেষ সক্রিয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। এ বিদ্বেষ বারোমাস সক্রিয় থাকলে সহাবস্থান সম্ভব হত না। কিন্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায়ও অবচেতন মনে ভিন্ন দলের ধর্মের গোত্রের বর্ণের জাতের ও দেশের মানুষের প্রতি একটা অনাত্মীয় ভাব জেগে থাকে—একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া থাকে, কিছুতেই সে-বাধা অতিক্রম করা যায় না। কাজেই আস্তিক মানুষের বিধর্মী-বিদ্বেষ, সাধারণ মানুষের দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র দ্বেষণা এতই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এ নিয়ে কোনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা করা অবিবেচকের আচরণমাত্র। বিদ্বানদের এ অবিবেচনাও মানুষের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।

তবু ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষ কখনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্রে ভেদ-বাধা মানে নি। চিরকাল ব্যক্তিগত জীবনে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম অস্বীকার করে মানুষ মানুষকে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের বাঁধনে বেঁধেছে। আত্মীয় বলে মেনেছে। জীবনের সহায় সহচর বলে জেনেছে। আমরা রাজনীতি ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত

সম্পর্ককেই বড় করে দেখি ও দেখাই। গরজে পড়ে গোঁজামিল দিতে চাই, তাই ফাঁকির ফাঁক থেকেই যায়। এর ফলে ইতিহাস হয় বিকৃত, রাজনীতিও হয় না অভীষ্ট ফলপ্রসূ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় আমরা হিন্দু-বৌদ্ধে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে বাঙালি-অবাঙালিতে ও বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী তুর্কি-মুঘল শাসকের প্রতি শাসিত জনের এমনকি আঞ্চলিক অবজ্ঞা-বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব-কোন্দল ও সংঘর্ষ-সংঘাতের সংবাদ নানা সূত্রে পাই। তার মধ্যে সাহিত্যই প্রধান। এতে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের লোকের মধ্যেকার ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি স্নেহ-সখ্য, শ্রদ্ধা-স্বার্থের কথাও কিছু কিছু মেলে বটে, কিন্তু তা কখনো শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি ও সরকারকে প্রভাবিত করে নি। ঐ দল, স্বার্থ ও মতগত অনাত্মীয় ভাবটাই সমাজ-সংস্কৃতি-সম্পদ ও সরকারের ক্ষেত্রে নিয়ামকের কাজ করেছে। যেখানে আর্থিক স্বার্থ নেই, সেখানে পর-দ্বেষণা, নিন্দা-অবজ্ঞা-উপহাস ঔদাসীন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে—যেমন অচ্যুতদের প্রতি বর্ণহিন্দুসমাজের কিংবা চর্যাকারের বা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রভৃতির বাঙালির (মাঝি মাল্লার) প্রতি উপহাস। [কান্দেরে বাঙাল ভাই বাফোই বাফোই— মুকুন্দরাম। মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙাল— ক্ষেমানন্দ। বাঙালীরে দেখে যেন ভেড়া—রামপ্রসাদ।]

বৌদ্ধধর্মের আগে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে জৈনধর্ম প্রচারিত হয়। যদিও জৈন-বৌদ্ধ মতে ও চর্যায় সাদৃশ্য অনেক, পার্থক্য সামান্য তবু বৌদ্ধ প্রসারে জৈনমত বিলুপ্ত হয়। জৈন-বৌদ্ধে বিরোধ-সংঘর্ষ হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার রূপ-স্বরূপ আজ আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। দিব্যাবদানসূত্রে জানা যায়, অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নির্গ্রন্থ জৈন হত্যা করেছিলেন। বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ লোকপ্রসিদ্ধ। শশাঙ্কের একটি আদেশ ছিল, এইরূপ :

আ-সেতোর আতুষারাদ্রের বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান
যো ন হন্তি স হন্তব্যোভৃত্যান্ ইত্যশিষণ নৃপঃ।

—সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালক সহ যে (ভৃত্য) হত্যা করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে—রাজভৃত্যদের প্রতি রাজার এই আদেশ।

'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজারা "দুষ্ট মতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যান্ অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্ত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমতধ্বংসমাচরণ নির্ভয়ো বর্ত্ততে।" —অসংখ্য দুষ্ট মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমুখ্যদের অনেকবিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উদুখলে ফেলে মুষলাঘাতে চূর্ণ করে দুষ্ট মত ধ্বংস করে নির্ভয়ে থাকতেন।

সেনরাজদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধবিদ্বেষের আভাস দেয়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে ও সরহের দোহায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রকট। আর্যদেবের 'চিত্তশোধন প্রকরণে' ব্রাহ্মণ্যবাদীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। সাধনমালা, বজ্রসূচিতত্ত্বকোষ প্রভৃতিতেও এ বিদ্বেষ মেলে। এমনকি শূন্যপুরাণেও বেদশাস্ত্রের ঠাঁই শ্রীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে এবং ব্রাহ্মণ্য সব দেবতাই ধর্ম নিরঞ্জনের আনুগত্য স্বীকার করে। গোরক্ষনাথ ও লাউসনের কাছে স্বয়ং দুর্গাও হার মেনেছেন (তুল : মনসামঙ্গল হাসান হোসেন পালা)!

সাত শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্ক বৌদ্ধ-পীড়নের জন্যে নিন্দা পেয়েছেন পর্যটক হিউ-এনৎ-সাঙ ও হর্ষচরিত-প্রণেতা বাণভট্টের। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামের বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধপীড়ন প্রবণতার কথা রয়েছে। বৌদ্ধপীড়নের শেষ উল্লেখ মেলে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামের পদবন্ধে। এতে বিজিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা তুর্কিবিজয়কে সদ্ধর্মীর মুক্তির সহায় ও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনেছে। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো দেশত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করেছিলেন। রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধমত প্রকাশ্যে গ্রহণ করায় তাঁকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের বৌদ্ধেরা হামলা থেকে স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্মবিলয় ঘটিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম ও আচার রক্ষা করেছে—নাথযোগী নামে পরিচিত তাঁতিরা বৈষ্ণব-সহজিয়ারা, বাউলরা ও শৈব-নাথপন্থিরূপে বজ্রসহজানী যোগী-তান্ত্রিকেরা এবং ধর্মঠাকুরের পূজারীরূপে রাঢ়ের ডোম চাঁড়াল বাগদীরা। মতে আচারে তারা বিকৃত বৌদ্ধ হলেও আজ সামাজিক পরিচয়ে তারা হিন্দু এবং অনেক বাউল আজ মুসলমানও।

বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী তুর্কি-মুঘল শাসনে এবং ইসলামের প্রসারে শাসিত হিন্দুর শাসক-বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবল হয়েছিল। তা ছাড়া যুদ্ধে মন্দিরাদি ভাঙার ফলে এবং পৌত্তলিকতার প্রতি মুসলিম তুর্কি-মুঘলের পরিব্যাপ্ত অবজ্ঞা-উপহাস হিন্দুমনে অপমানের জ্বালা ও বিদ্বেষ-বিষ তীব্র করেছিল নিশ্চয়ই। তাই হিন্দু-অধ্যুষিত রাজ্যে হিন্দুরাজ পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষ থেকে বাহ্যত দূরে থেকেও মানসপীড়ার বশে সক্ষোভে মুসলিমের হিন্দুপীড়নের একটা আদর্শায়িত কাল্পনিক আলেখ্য না-এঁকে পারেন নি :

কতহুঁ তুরুক বরকর। বাট জাইতে বেকার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ। মথাঁ চড়াবএ গাইক চড়ুআ।
ফোট-চাট জনউ তোড়। উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ। দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গোমঠ জুরালি মহী। পদরুহ দেবাক ধাম মহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার। ছোটে তুরুকা ভড়কী মার।

(কীর্তিলতা)

কিন্তু এই বিদ্যাপতিই অন্যত্র বলেছেন :

হিন্দু তুরুকে মিলন বাস। একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ মিলিমিশ। কতহুঁ ছেদ।

(কীর্তিলতা)

—এটিই যথার্থ ভাষণ। এ-সূত্রে পরবর্তীকালের ইংরেজদের নেটিব অবজ্ঞা স্মর্তব্য। বিদ্যাপতির চিত্রে পীড়ন-প্রবণতার চেয়ে তুর্কিদের মস্করা ও পরিহাসপ্রিয়তাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাইও বলেন :

(তুর্কিদের)
কেহ বা জুলুম করে কেহ গুণা শিরে ধরে
রুজু করি করএ নছাব।

আর ধার্মিকরা ইসলামে দীক্ষাও দেয় :

জতেক সৈয়দ মোল্লা   জপএ ত বিসমিল্লা
সদামুখে কলিমা কেতাব
হিন্দুত কলিমা ছিল   মুসলমানি শিখাইল
যথা বৈসে জত মুসলমান।

এ বর্ণনা-যে সত্যসন্ধ হিন্দু-কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিপ্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক বিজাতি-বিধর্মী-বিদ্বেষবশে কবি ভবানীদাসও ভবিষ্যৎবাণীর আবরণে কল্পচিত্রই দিয়েছেন :

প্রচণ্ড যবন রাজা হবে ক্ষিতিপতি।
ধর্মকর্ম লোকের হিংসিবে নিতিনিতি।
প্রয়াগ বারানসী আদি যত পুণ্যস্থান
সকল স্থানের তারা করিবে অপমান।
বিড়ম্বনে হরিকার্য করিতে না দিব
বলে ধরি আনি তার জাতকুল নিব।

বিজয়গুপ্ত যদিও তাঁর স্বগ্রাম ফুলশ্রীর পরিচয়-প্রসঙ্গে গাঁয়ের শান্তি-সুখে গর্বিত ও সুলতান হোসেন শাহ্‌র (জালালউদ্দীন ওর্ফে হোসেন-শাহ ১৪৮১-৮৫ খ্রি.) তারিফে মুখর, যেমন—

সুলতান হোসেন শাহা নৃপতিতিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি,
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।

তবু সাধারণভাবে বিজাতি দ্বেষণার ও বিধর্ম-অসহিষ্ণুতার একটি কল্পচিত্র দিয়েছেন: কাজীর শ্যালক মুঘী হালদার ও পেয়াদা দাপটে প্রবল ও পীড়নে পটু—

তার ভয়ে হিন্দুসব পালায় তরাসে
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত।
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার স্কন্ধে
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে
কার পৈতা ছিড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল
পাথরের প্রমাণ যেন ঝরে পড়ে শিল।
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা
চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা।

পৌত্তলিকতাদ্বেষী 'মোল্লা' খোদা খোদা বুলি যায় (মনসার) ঘট ভাঙ্গিবার। হিন্দুরাও ছাড়বার পাত্র নয়; বেদম মার দিয়ে ছাড়ে। শুনে কাজিও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে:

হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যথেক ছেমরা
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয়
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয়।

(বিজয়গুপ্ত)

এ হচ্ছে বিধর্মীদ্বেষী অসহিষ্ণু মুসলমানের কল্পচিত্র। আসলে বোধহয় মনসামাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবতাদ্বেষী মুসলমানের প্রথমে অবিশ্বাস অবজ্ঞায় ও পরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্তদান লক্ষ্যেই দ্বন্দ্ব-মিলনের এ কল্পকাহিনী উদ্ভাবিত। হাসান-হোসেন পালা নির্মাণের মূলে এ উদ্দেশ্যই-যে নিহিত তাতে সন্দেহ নেই, তাই সুবুদ্ধিজাত সহিষ্ণুতার কথাও পাই :

তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান
সে বলে উচিত নহে রাখো হিন্দুয়ান।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে
যার তার কর্ম সেই করে ধর্ম জ্ঞানে।
সকলের কুলাচার সৃজিল গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই।

(দ্বিজবংশীদাস)

গৌড়ে হিন্দুমন্দির ভাঙার অপবাদ নেই সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর বা অন্য কোনো সুলতানের। উড়িষ্যায় অভিযানকালে অর্থাৎ যুদ্ধকালে সেখানকার ধনাগারস্বরূপ কিংবা শত্রুর শিবিরস্বরূপ মন্দির ভেঙেছিলেন হোসেন শাহ :

যে হুসেন শাহ্ সর্ব উড়িয়ার দেশে
দেব মূর্তি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে।

(চৈতন্য ভাগবত)

লক্ষণীয় যে, তুর্কি সুলতান ফৌজদার কাজি প্রভৃতি শাসক-প্রশাসকের হিন্দুপীড়নের কথাই সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে পীড়নপ্রাপ্তির কথা নেই। তার কারণ দুটো : এক, তখন গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত বা উপনিবিষ্ট মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। দুই, সার্বভৌম ক্ষমতা তুর্কি-মুঘলের হাতে থাকলেও হিন্দু সামন্তরাই শাসন করত দেশ। রাজস্বও আদায় করত হিন্দু কর্মচারীরাই। কাজেই জনগণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর শাসনে-পোষণে। তাই সাধারণ মুসলিমের পক্ষে হিন্দুপীড়ন সম্ভব ছিল না।

আবার সর্বত্র ব্রাহ্মণ-লাঞ্ছনার কথাই রয়েছে বর্ণিত। এ নির্যাতন কেবল যেন ব্রাহ্মণের উপরই হত। জয়ানন্দের বর্ণনায় পাই :

আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি-প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে
ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপারে তুলসী
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী।
পিরল্যা গ্রামেত বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে
গৌড়েশ্বর বিদ্যামানে ছিল মিথ্যা বাদ
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হৈব হেন আছে-
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হৈব পাছে।
অতএব *'নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।*

কিন্তু এজন্যেই কি 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ' এবং কেবল ব্রাহ্মণনির্যাতন! আমাদের মনে হয়, অন্য বর্ণের ও বিত্তের লোক ইসলামে সহজে দীক্ষিত হত, তাদের সঙ্গে প্রচারকরাও মিশনারিসুলভ সদ্ভাব রক্ষা করে চলত। বিপ্রদাসের উক্তিতে : 'হিন্দুত কলিমা ছিল, মুসলমানি শিখাইল' এবং দীক্ষিত জোলা মুসলমানদের প্রতি তাঁর সক্ষোভ পরিহাসে আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। কাজেই সমাজপতি শাস্ত্রী ব্রাহ্মণই হিন্দুর সমাজ ও আচার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন। এজন্যেই ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণবিদ্বেষ বা ব্রাহ্মণনির্যাতনকে ঢালাওভাবে বিধর্মীপীড়ন বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ ও পাদরি-দ্বেষণা সমার্থক নয়। হিন্দুদের পাদরি-বিদ্বেষ থাকলেও ব্রিটিশ-দ্বেষণা ছিল না উনিশ শতকে। এখানে ডক্টর শহীদুল্লাহর উক্তি পুনঃ স্মর্তব্য : 'হিন্দু' জাতি ছিল না। হিন্দু ধর্মও ছিল না। কাজেই হিন্দুমাত্রেরই উপর বিদ্বেষপ্রসূত অত্যাচারও হতে পারত না। তা ছাড়া তখন প্রত্যক্ষভাবে প্রজাকে শাসন-পোষণ ও শোষণ-পীড়নের নির্দ্বন্দ্ব অধিকার ছিল স্থানীয় হিন্দু সামন্তদেরই।

আবার ঐ সংখ্যাগুরু হিন্দু বা ব্রাহ্মণরা-যে শাসক তুর্কি বা যবনদের খুব ভয় করে চলত তার প্রমাণও দুর্লভ। বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত যেমন হিন্দুর প্রতিশোধমূলক মুসলিম-দলনচিত্র সগর্বে বর্ণনা করেছেন; তেমনি বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণও সদম্ভে মুসলিমদলনের বর্ণনা দিয়েছেন :

১. *গদাধর বলে আরে কাজী বেটা কোথা*
বাটে 'কৃষ্ণ' বোলে নহে ছিঁণ্ডো এই মাথা।
(বৃন্দাবনদাস)

২. *নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ*
আপন ইচছাএ মার প্রাণে পাছে রাখ।
(জয়ানন্দ)

এগুলো মূলত জাত্যভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈরজ্ঞাপক অতিশয়োক্তি; তার প্রমাণ তুর্কি-মুঘল আমলেই শাসিত প্রজা নির্ভয়ে গ্রন্থে শাসকের পীড়নের কথা লিখেছেন, শাসকের ধর্মের চাইতে শাসিতের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন, শাসকগোষ্ঠী থেকে শাসিতের দেবতার অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন। অন্নদামঙ্গল অবধি অনেক কাব্যেই এসব চিত্র মেলে—যা কোনো নির্যাতনকারী শাসকই সহ্য করে না; এমনকি গণতন্ত্রের যুগেও নয়। তা ছাড়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ প্রমুখ বহু সুলতানের তারিফে সমকালীন বহু কবি মুখর। এ যেন এ-যুগের বিভিন্ন মতাবলম্বী সংবাদপত্রসুলভ দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক, তাতে যেন পরিহাস রসিকতার ভাবও রয়েছে। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও ভূতের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। আবার সতেরো-আঠারো উনিশ শতকে কাল্পনিক পির-পাঁচালির মাধ্যমে মুসলিমদেরও তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমান উৎসাহী দেখতে পাই। পির নারায়ণ 'সত্য' তাঁর চেলা দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী, গাজী কালু এবং ইসমাইল গাজী, জাফর গাজী, মোবারক গাজী, সফী গাজী, মাণিকপির, মছলন্দর পির প্রভৃতির কাহিনীতে হিন্দু-মুসলিমের ধর্মমত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব ও পরিণামে আপস-মিলনের চিত্রই বিধৃত। বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাস পিপিলাই থেকে এ-ধারার শুরু এবং কৃষ্ণরাম ভারতচন্দ্র গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ হয়ে মুনশী আবদুর রহিমে তার অবসান। সৈয়দ সুলতান, জায়েনউদ্দীন, শা বারিদ খান, গরীবুল্লাহ্, সৈয়দ হামজা প্রভৃতি কবি রসুল, হামজা, আলী, হানিফা প্রভৃতি ইসলামের উন্মেষ-যুগের বীরদের দিগ্বিজয় বর্ণনাসূত্রে পরাজিত ব্রাহ্মণ রাজা ও রাজকন্যাদের সপ্রজা ইসলাম-বরণে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যথায় হত্যার হুমকি দিয়েছেন। সর্বত্র কেবল ব্রাহ্মণই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য এবং কাফের নয়—কুফরীই (পৌত্তলিকতাই) তাঁদের তীব্র ঘৃণার বিষয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌত্তলিকতার অপকর্ষ দেখানোই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুর্কি-মুঘল শাসনকালে মুসলিমরা ইংরেজ-আমলের মতো হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নি, তাই হিন্দুবিদ্বেষ তাদের রচনায় মেলে না।

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যেখানে বিদেশী-বিভাষী বিধর্মী-বিজাতির, সেখানে সহাবস্থানের গরজে ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতাভিত্তিক একটা আপস-রফা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। নইলে শাসিতজনদের কিংবা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র নিরাপদ হয়

না। মধ্যযুগে সেই আপসপ্রয়াস উপরোক্ত ধারায় আবর্তিত হয়েছে।

মা যখন মারে তখন তা বিনা অনুযোগে সহ্য করাই নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণে মেরেও সৎমা নিন্দা থেকে রেহাই পায় না। প্রবলমাত্রই-যে কমবেশি পরপীড়ক, শাসকমাত্রই-যে সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক; দুরাত্মা প্রবলের ও শাসক-প্রশাসকের-যে কোনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নেই, ওরা আলাদা শ্রেণী—শাসক প্রশাসক বিজাতি-বিধর্মী হলে শাসিত শোষিত-পীড়িত মানুষ এ-তত্ত্ব মনে রাখে না। মনে ভাবে বুঝি বিজাতি বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বলেই প্রজাপীড়ন করছে। গোঁয়ার, লোভী, পরস্বাপহারী, মূর্খ-ধার্মিক প্রভৃতি-যে সুযোগ-সুবিধামতো ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-পীড়নে উৎসুক ছিল, তার সত্যতা আজকের দিনের উচ্চশিক্ষিত মানুষের প্রবণতা থেকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তবু শাসকের স্বধর্মীর সংখ্যাল্পতার দরুনই তা সেকালে কখনো ত্রাসকর হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিক বিদ্বানেরাও তা স্বীকার করেন :

> "মুসলমানদের বাঙলা আক্রমণকালে হিন্দু-ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল।...নিম্নবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয় নি।"
>
> [১৮৭২ সনের আদমশুমারি রিপোর্ট]

মুসলিম শাসনকালে

> "শাসনভার, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতি চর্চা— কোনো বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয় নি, বরং মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল।"
>
> [বাঙালী, পৃ. ৭৯-৮০, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ]

> "পাঠান যুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেন শাহী বংশ ও কররানী বংশের অধীনে বহু বাঙালী হিন্দু কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং পাঠান আমলে রাজ্য-শাসন, বিশেষত রাজস্ব ব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।"
>
> [অসিত বন্দ্যো : বা. সা. ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫]

> "স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময় মুসলমান কর্মচারীদের উপরে ওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।"
>
> [সুখময় মুখো : বা. ই. দু'শ বছর পৃ. ৪৬৩]

> "পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।...(১৫-১৬ শতকে)—এই দুই শতাব্দীতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনো হয় নাই।"
>
> [বাঙ্গালার ইতিহাস : বঙ্কিমচন্দ্র]

"তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বাঙালীরাই বাঙ্গালা শাসন করিত।...ইহারা (হিন্দুরাজাগণ-সামন্তরা) রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, দণ্ড বিধান করিতেন এবং সর্বপ্রকার রাজ্য শাসন করিতেন।"

[বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : বঙ্কিমচন্দ্র]

"মুসলমান রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে হিন্দু সবিশেষ সহায়তা করিতেছে।"

[সুকুমার সেন ১ খণ্ড, পূর্বার্ধ পৃ. ৮৮]

অতএব মুসলমানেরা তুর্কি-মুঘল যুগে বিধর্মী-নির্যাতনের সুযোগ ক্বচিৎ কখনো পেয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত রামচন্দ্র খান হিন্দু হিসেবে নন, বাকি রাজস্বের জন্যেই বিদ্রোহী হয়েছিলেন। আবার রূপ-সনাতনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক ছিলেন পর-পীড়ক এবং অর্থ আত্মসাৎ করে বিদ্রোহীর মতো আচরণ করেছিলেন বলে চৈতন্যচরিতে হোসেন শাহর জবানিতে পরিব্যক্ত : 'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার/জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।'

আবার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলিমের পরিচিত প্রতিবেশীসুলভ প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের সম্পর্কও গভীর এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে উঠত। আগেই বলেছি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় কোনো মানুষই দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-বৈর দ্বারা পরিচালিত হয় না। আরেক ক্ষেত্রেও মানুষ কোনো স্বাতন্ত্র্য অসূয়া অহঙ্কার অবজ্ঞা মনে ঠাঁই দেয় না— সে হচ্ছে দৈব-ভয়, ব্যাধি, স্বার্থ ও লিপ্সার ক্ষেত্র।

এখানে আপাত নিরাপত্তা-নিরাময় ও প্রাপ্তিলোভ মানুষকে সর্বসংস্কারের বাধা অতিক্রমণে প্রবর্তনা দেয়। এসব ক্ষেত্রে মিলনমুখী চিত্র অনেক মেলে।

যেমন :

১. গ্রাম-সম্বন্ধে হয় মোর চাচা
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

(চৈতন্যচরিতামৃত)

২. শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।

(চৈতন্য ভাগবত)

তর্কে পরাজিত চৈতন্য-মাহাত্ম্য মুগ্ধ কাজীও চৈতন্যের পায়ে ধরে বলে—

৩. এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন

তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।

(চৈতন্য ভাগবত)

৪. হিন্দুকুলে কেহ যদি হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।

(চৈতন্য ভাগবত)

যবন হরিদাসকে মুলকের পতি বলেছেন :

৫. কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত।

(চৈতন্য ভাগবত)

৬. জাজপুরের দেহারা বন্দির একমন
যেই খানে অবতার হৈল যবন।

(ধর্মমঙ্গল)

৭. বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ—

(চৌধুরীর লড়াই)

৮. বন্দোঁ পীর ইসমালি গড় মান্দারণে
দারাবেগ ফকির বন্দিব নিগাঞে
জোড় হাতে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সূফী খাঞে।

(ধর্মমঙ্গল—সীতারাম দাস)

৯. যবনেহ যার (রামের) কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।

(চৈতন্য ভাগবত)

১০. বিজয়গুপ্তের নায়ক চাঁদসদাগর লক্ষ্মীন্দরের বাসরে কোরআন পাঠেরও অবস্থা রাখে। শেখ শুভদয়ায় জলালের এবং পাঁচালিতে সত্য-মাণিক-পিরদের যেমন মাহাত্ম্যকীর্তন রয়েছে, জাফর খানেরও তেমনি গঙ্গাস্তোত্র আছে।

১১. ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারশ্য পড়িবে
মোজা পায়ে নড়ি হাতে কামান ধরিবে।

(চৈতন্যমঙ্গল)

আবার গুণরাজ খান, মালাধর বসু, বিদ্যাপতি, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্র (গৌরীমঙ্গল, ১৪৯৭-৯৮ খ্রি.), রূপরাম, মথুরেশ বিদ্যাঙ্কার, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী কৃত্তিবাস, দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ রায়মুকুট, বৃহস্পতি মিশ্র, যশোরাজ খান, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, গদাধর দাস, কৃষ্ণরাম দাস, মহাদেব আচার্য সিংহ (সুখময়, পৃ. ২৮৪) প্রমুখ কবিগণ প্রতিপোষণ পেয়ে বা না-পেয়েও রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ, জালাল উদ্দীন ফতেহ্ হোসেন শাহ্, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দীন নুসরৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান, আকবর, শাহজাহান, সুজা, মুসা খাঁ, আওরঙ্গজীব প্রমুখ শাসক-প্রশাসকের অকারণ-সকারণ স্তুতি গেয়েছেন। সন্ত-সন্ন্যাসী ফকির ওঝার ক্ষেত্রে বিষয়ী মানুষ কখনো পার্থক্য স্বীকার করে নি। এসব হচ্ছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা। কিন্তু কারণে-অকারণে সুপ্ত জাতি বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-বৈর আস্তিক ও দলভুক্ত মানুষের মনে যে-কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে জেগে উঠেই এবং প্রয়োজনস্থলে প্রকাশও পায় এবং এ দিয়ে ইতিহাসের ধারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বকালেও আমরা তা দেখতে পাই।

এর পরে গৌড়ীয় নববৈষ্ণব মতের উদ্ভবকালেও আমরা বৈষ্ণবাশাক্তশৈবের দ্বন্দ্ব-কোন্দল দেখেছি, যেমন উনিশ শতকে দেখেছি খ্রিস্টান-ব্রাহ্ম-সনাতনীদের এবং মজহাবী-ওয়াহাবী-ফরায়েজীদের দ্বন্দ্ব-কোন্দল।

সনাতন লোক-ধর্মের প্রতি নবদীক্ষিত বৈষ্ণবদের সীমাহীন অবজ্ঞা। তারা বলে :

১. ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন।
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।
যোগিপাল, ভোগিপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত।

(চৈ. ভাগবত)

উত্তরবঙ্গেও তখন :

২. উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শাক্ত কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।
মদ্য মাংস মৎস্য মার্গ মলেতে সাধন
কামিক্ষার ব্রত মহীপালের জাগরণ।
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোচ্ছব

ভোটকম্বল চট পরিধান সব।

(নিত্যানন্দের বংশবিস্তার, সুকুমার সেন পৃ. ৩৩০)

৩. ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।

(চৈ. ভা.)

৪. মহাপাপী ব্রাহ্মণ যে আছে দুই ভাই
নবদ্বীপের ঠাকুর যে জগাই মাধাই।

(লোচনদাস)

৫. ধিক জাউঁ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল
গুপ্তহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার।

(লোচনদাস)

সনাতনীরাও বলে— (হরি সংকীর্তন শুনে) :

৬. শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে হইল প্রমাদ
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামেব উৎসাদ।

(চৈ. ভাগবত)

৭. এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ...
কেহো বোলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।

(চৈ. ভাগবত)

৮. এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।...
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।...
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে
নানাবিধ দ্রব্য আসে তা সভার সনে।
ভক্ষ্য-ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।

(চৈ. ভাগবত)

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব উত্তেজনা ও ক্রোধবশে তাই এ পাষণ্ডদের সম্বন্ধে বারবার বলেছেন : এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে/তবে লাথি মারো তার মাথার উপরে!' (চৈ. ভাগবত)

কবিগণ রাজ-বন্দনা করেও আবার সেই রাজার অত্যাচার-পীড়নের কথা বলেছেন। যেমন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, প্রতিমা-বিনাশক হোসেন শাহ্ কেবল-যে প্রশংসিত হয়েছেন— তা নয়, চৈতন্যদেবের ঐশ্বর্যের স্বীকৃতি দিচ্ছেন :'এসব মানুষি নহে গোসাঞি চরিত্র' [চূড়ামণিদাস—গৌরাঙ্গবিজয়]; 'সেই তো গোসাঞি উহা জানিহ নিশ্চয়'। (চৈতন্য-চরিতামৃত)। আবার বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের পারস্পরিক নিন্দাবাদও ঐ একই সাধারণ দল-চেতনা বা ভিন্নদল-দ্বেষণার প্রকাশমাত্র।

তাই বলেছি, এইসব দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র-দ্বেষণা একটা সাধারণ মানবিক বৃত্তিরই প্রকাশ—এর মধ্যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনা খোঁজা নিরর্থক। এসব অভিব্যক্তি কেবল এ-যুগে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বক্তব্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার গাঁয়ের নিরক্ষর নিঃস্ব, নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা এ স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনতা রক্ষা করা বা এর অনুশীলন করার গরজ কখনো অনুভব করে নি। জীবিকাগত আর্থিক জীবনে চিরদুস্থ এসব মানুষ নিয়ম ও নিয়তির শিকাররূপে আশ্বাস ও প্রবোধের অবলম্বন খুঁজেছে প্রায় অবচেতন মনে। তাই দুর্বোধ্য জটিল শাস্ত্রে আশ্বস্ত হতে না-পেরে তারা সহজ ও সরল পথের সন্ধান করেছে ঐহিক-পারত্রিক জীবনের স্বস্তি বাঞ্ছায়—এসব লোক-প্রয়োজনে লোক-মনীষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে লোকধর্ম—পির-নারায়ণ সত্যের স্বীকৃতিতে কিংবা বিভিন্ন গুরুনামী বাউল-সাধনায় নিরক্ষর গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলিম অভিন্ন মিলন-ময়দান রচনা করে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে— কেবল উচ্চবিত্তের, উচ্চবর্ণের ও শিক্ষার সুখী ও সম্পদশালী সুস্থ মানুষই শাস্ত্র-সংস্কৃতি-সমাজের নামে বিভেদ-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যগৌরব ও স্বাধর্ম্যগর্ব অনুভব করে আনন্দিত কিংবা জিগীষু হতে চেয়েছে। এ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাত সম্পদ-চেতনার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। এর থেকে আস্তিক ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের নিষ্কৃতি নেই। অথচ এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে, অন্তত মুসলিমের ঘরোয়া জীবনে নাপিত-ধোপা-বারুই-বৈদ্য-গোচিকিৎসকরা, বাদ্যকর-চাষি-মাঝি-তাঁতি-মুচি প্রভৃতি নানা পেশার লোকের সঙ্গে সে-যুগে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক রাখতেই হত। তা হলে সাহিত্যে ইতিহাসে বিধৃত বিরোধের স্বরূপটা কী! আসলে মন ও মত বাঁচিয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে আজকের মতোই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান মাঠে-ঘাটে-হাটে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে সহযোগিতা ও সদ্ভাব রেখে সহাবস্থান করত।

নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

ক. সত্যকলি বিবাদসম্বাদ

(১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ)

মুহম্মদ খান বিরচিত

কবি মুহম্মদ খানের দুখানি কাব্য সংগৃহীত হয়েছে। আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। একটি মৌলিক রূপককাব্য 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদ'। অপরটি কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত 'মক্তুল হোসেন'। এটি ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত। মুহম্মদ খান এ কাব্যে তাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শাসককুলে তাঁর জন্ম। মাহি আসোয়ার-হাতিম-সিদ্দিক-রাস্তিখান-মিনাখান-গাভুরখান-হামজাখান-নসরৎ খান-জলালখান-মুবারিজখান-মুহম্মদ খান। মুহম্মদ খান 'নবীবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদ'-এর ভূমিকায় লভ্য।

জীবনের সার্বিক 'চর্যানীতি' সম্বলিত বলে কালানুক্রম লঙ্ঘনে এই গ্রন্থের পরিচিতি সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত হল।

মধ্যযুগে নৈতিক জীবন-চেতনার রূপ

এখনকার দিনে সমাজ, সংস্কৃতি, সুরুচি, রাষ্ট্র, যুক্তি, বিবেক, বুদ্ধি এবং মানবিকতা, সুনাগরিকতা, দেশপ্রেম প্রভৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের নীতিবোধ জাগিয়ে দেয়া হয়, নিয়ন্ত্রিত করতে হয় নৈতিক চরিত্র।

সে-যুগে মানুষের জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই মানুষের নৈতিক চেতনার উৎসও ছিল ধর্মবিধি। ফলে নৈতিক জীবনবোধ জাগানোর লক্ষ্যে রচিত শাস্ত্রনিরপেক্ষ সাহিত্যিক রচনা ছিল বিরল প্রয়াসে সীমিত। অবশ্য ডাক-খনার আপ্তবাক্য, চাণক্যশ্লোক ও প্রবচনাদির মতো বিচ্ছিন্ন তত্ত্বকথা ছিল গুরুত্বে ও প্রভাবে ধর্মশাস্ত্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এগুলোও ছিল ধর্মশাস্ত্রেরই মতো অদৃশ্য অপার্থিব বিশ্বাস-সংস্কারের প্রলেপে আবৃত।

'সত্যকলি বিবাদসম্বাদ'ও ধর্মবোধপ্রসূত। ধার্মিকের চিত্ত থেকেই এ উৎসারিত। তাই বলে এ নীতিকথাকে শাস্ত্রকথার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা উচিত হবে না। কেননা এ

সম্পর্ক দূরান্বিত। অনেকটা বঙ্গোপসাগরে গঙ্গাজল প্রত্যক্ষ করার মতো।

এ গ্রন্থে কাল-প্রতীক সত্য ও কলির রাজকীয় আবহে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ও দোষ-গুণের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এ ধরনের গ্রন্থ বিরল। আজকাল বিদ্যাসুন্দর, নল-দময়ন্তী, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকে কেউ-কেউ রূপক রচনারূপে গ্রহণ করেন। সেগুলো যদি-বা রূপক আখ্যায়িকা হয়, তা হলেও প্রতিপাদ্য পাই একটিমাত্র তত্ত্ব। আর 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদে' রয়েছে সামগ্রিক জীবনতত্ত্ব—ঘরোয়া, বৈষয়িক, নৈতিক প্রভৃতি জীবনের সর্বদিকের ব্যবহারবিধি।

কবি বলেন :

ক. উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন
সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ বিবরণ।

খ. বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে
তেকারণে বিরচিলুঁ ভাবি নিজ মনে।

গ. সত্যকলি আচরণে প্রসঙ্গের ছলে ভণে
কৌতুকে করিল বিরচন।

'সত্যকলি বিবাদসম্বাদ' কাব্য রচিত হয় :

দশশত বাণ শত বাণ দশ 'দধি
রাত্রি হইয়া গেল পঞ্চালিকা অবধি।

এর থেকে ১০০০+৫০০+৫০+৭=১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দ মেলে। এ কাব্যের রচক কবি মুহম্মদ খান। এঁর রচিত 'মক্তুল হোসেন' প্রখ্যাত কাব্য।

এ কাব্যে সত্য ও কলির ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যা ও পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত। তত্ত্বকথা পাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ে এ বিবেচনায় চারটি আখ্যানও সমন্বিত হয়েছে। একটি নামান্তরে বেতাল পঞ্চবিংশতির চৌদ্দ সংখ্যক উপাখ্যান, একটি চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী আখ্যায়িকা, একটি সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা নামের রূপকথা এবং অপরটি কিস্মিক রাজার কাহিনী।

কবি দোষ-গুণের প্রতীকী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সেগুলো নিতান্ত জড়-প্রতীক নয়; কবির অঙ্কননৈপুণ্যে সবকয়টিই সজীব মানুষ হয়ে উঠেছে।

পাত্রপাত্রীর নামগুলো যেমনি গুণজ্ঞাপক তেমনি সুন্দর : কলীন্দ্র দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষণ, মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুদাতা, যোগী প্রভৃতি। সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। এ দুটোও গভীর তাৎপর্যে সুন্দর। সূর্য অগ্নিময়—সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও রমণীয়—পাপ আপাতমধুর।

সত্যকেতু ধ্বজ শোভা করে দিবাকর
কলিধ্বজে শোভে চন্দ্র অধিক সুন্দর।

পাপও-যে পুণ্যকে ছাপিয়ে ওঠে, মিথ্যাও-যে সত্যের উপর জয়ী হয় এবং সত্যের ও পুণ্যের পথ-যে দুস্তর ও দুঃখাকীর্ণ তা কবি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। এতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির গভীরতর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচয় মেলে।

কবির ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়গুলো আপ্তবাক্যের কিংবা প্রবচনের মতো প্রজ্ঞার সম্পদ। এর অনেকগুলোই লোকপ্রচলিত ও লোকশ্রুত। কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি :

১. বিষেত হরএ বিষ।
২. শরীরে না সহে হীন পরাভব দুখ।
৩. দুষ্ট বধে মহাধর্ম দেখহ বিচারি।
৪. যে হোক সে হোক যুদ্ধ উপেক্ষা না কর।
বীর্য স্মরি ধনু ধরি ক্ষেত্রি ধর্ম স্মর।
৫. যুদ্ধ শ্রধা কদাপি না করে মহাজন।
৬. আগে সন্ধি করিঅ না হৈলে কর রণ
যদি যুদ্ধ করিবা করিঅ প্রাণ পণ।
৭. শ্বেতবাসে কাজর লাগিলে কালি ধরে।
৮. দুষ্ট সভা মাঝারে না শোভে সন্ন্যাসীরে।
৯. দুষ্ট মধ্যে না শোভএ শ্রেষ্ঠ জন।
১০. দুগ্ধে সিদ্ধে মল কভু না তেজে অঙ্গার।
১১. কূপমাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন।
১২. রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে।
১৩. দুষ্টে নষ্ট না করএ উত্তম জনেরে।
১৪. না হএ তপস্বী যোগ্য পাট সিংহাসন।
১৫. গোময় লেপনে কি চন্দন গন্ধ হরে!
১৬. নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসাঘর
দীপহীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর।
১৭. অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।
১৮. ক্ষেমা সে পরমধন ধার্মিকের জান।
১৯. নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যের জঞ্জাল।
২০. নারী হই লজ্জাহীন হএ যেই জন
দৃষ্টি না থাকিলে যেন না শোভে দর্পণ।
২১. প্রীতি বাক্য না থাকএ যাহার বচন
মধু হীন ফল যেন না রুচএ মন।
২২. শাস্ত্রকর্ম জানি যেবা ধর্ম না আচারে
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন ফল নাহি ধরে।
২৩. বুদ্ধি এ শশক মারে কেশরী দুরন্ত।
২৪. ধনবন্ত হই দাতা নহে যেই জন
জলহীন নদী যেন নাহি প্রয়োজন।
২৪. পুরুষ না হয় যদি সত্যবন্ত ধীর

চক্ষু না থাকিলে যেন না শোভে শরীর।
ঘর শূন্য যার ঘরে নাহিক জননী
দেশ শূন্য নিরানন্দ বা হএ যেই পুনি।

২৫. সহজে হৃদয় শূন্য বিদ্যা নাহি যার
সর্ব শূন্য দরিদ্রতা মহাদুঃখ তার।

২৬. মহাকবি পণ্ডিত নির্ধনী পাএ দুখ
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক।

২৭. ধন হন্তে শত্রু হএ সবে হিংসে নিতি
বিদ্যাবন্ত লোককে সকলে রাখে প্রীতি।

২৮. বহু ভার্যা যাহার সে চিন্তে অহোরাত।

২৯. বহু বাক্যে মুখদোষে চিন্তা পাএ জান।

৩০. বৃক্ষ যেন না শোভে না হৈলে ফল ফুল।

৩১. আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব।

৩২. যুদ্ধেত বিমুখ হৈলে নরকে বসতি (তুল : কোরআন)
যুদ্ধে মৈলে কীর্তি রহে স্বর্গেত গমন।

৩৩. প্রাণান্তেহ নিজ কুলধর্ম না বর্জিব।

৩৪. সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম।

৩৫. কুলকর্ম ধর্ম কভো না তেজে উত্তম।

৩৬. মৃত্যুকালে ঔষধে নাহিক প্রয়োজন।

৩৭. চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতর।

৩৮. মথিলে সে দুগ্ধে ঘৃত পাউন্ত গোয়াল
চেষ্টিলে সে কার্যসিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল।

৩৯. চোরেত না রুচে যেন ধর্মের বাখান।

৪০. শত ধোপে না তেজএ অঙ্গার মলিন।

৪১. যদিবা অমৃত তাত সিঞ্চে দেবগণ
তথাপি নিমের বৃক্ষ তিক্ত নাহি ছাড়ে।

৪২. দোচারিণী পত্নী তোর নিষ্ফল জীবন।

৪৩. লবণ ভূষিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে।

৪৪. কথ অকুলীন হোন্তে কুলীন জন্মএ
সুগন্ধি কস্তুরী দেখা মৃগে উপজএ।

৪৫. অশুদ্ধ সুবর্ণ যেন দহে নাহি সহে।

৪৬. বহু সৈন্য সাজিলে হারএ আখণ্ডল
বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার।

৪৭. কাল গেলে বৃক্ষ তবে ফল কোথা ধরে।

৪৮. কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর।

৪৯. আম্রে কীট কীটে মধুর উৎপত্তি
দোষেগুণে আছএ ভরিয়া দেখ ক্ষিতি।

৫০. চন্দনে বৈসএ নাগ নাগে বৈসে মণি
মৃগমদ শুনিতে শুঁকিতে ধন্ধ পুনি।
৫১. শুক উল্লুকের চঞ্চু একাকৃতি পুনি
কেহ পাড়ে ভ্রূকুটি কাহার মধুবাণী।
৫২. কৃপণে পাইবে লজ্জা দাতার সাক্ষাৎ।
৫৩. মহাজন কর্ম নহে আপনা বাখান।
৫৪. অমৃতের কুম্ভ সব নাগে ভরিয়াছে
তাক পিতে কাক যেন ধাই যাএ কাছে।
৫৫. কোথাত অমৃত ফল কপির আহার!
৫৬. বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত।
৫৭. আপনা শোণিত পান করে বিরহিনি।
৫৮. যাহার মরমে বাণ মারিলে অনঙ্গ
ধ্যান-জ্ঞান তপজপ সবকাজ ভঙ্গ।
৫৯. যাহার বিরহ নাহি পাষাণ হৃদয়
বিরহ পরম ধন পরম সংশয়।
৬০. দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন।
৬১. কণ্টকে যেন কণ্টক খসএ হেন জান।
৬২. কাকের চরিত্র ভাল কাকে সে বুঝএ
কাকের চরিত্র শুকে না বুঝএ নিশ্চএ।
৬৩. দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্টজন।
৬৪. পাপজনে ধর্মের নাহিক উপরোধ।
৬৫. গোবরুয়া কীটে যেন নিন্দিল ভ্রমর
কেহ পদ্ম পরে কেহ গোময় উপর।
৬৬. শৃগালে সিংহ মারে এ দুঃখ কি প্রাণ ধরে
দৈবকালে বিপর্যয় হৈলে।
৬৭. দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বুলি কোন্‌গুণে
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে।
(Give every body thy ear but few thy voice)
৬৮. জলেতে উঠিলে বিন্দু অবশ্য মজিব।
৬৯. শ্বেতবাস কজ্জল বাঝিলে কালা ধরে।
৭০. দুষ্ট সঙ্গে থাকিলে দুষ্টতা মন পুরে।
৭১. বল হৈলে শূকরে লেঠএ ধরাহর।
৭২. কোথাত অমৃত্বে ফল বানরের ভোগ।

সমাজ ও সংস্কৃতি

হিন্দু-পুরাণকথা ভিত্তি করে রচিত এ কাব্য। তাই এতে হিন্দু সমাজ সংস্কার ও সংস্কৃতির পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে হিন্দুপুরাণের আবহ।

সেকালে মান্য অতিথিকে 'পাদ্য অর্ঘ্য ও বসিতে আসন' দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত। যজ্ঞ ও দানের গুরুত্বও কম ছিল না : 'বহু যজ্ঞ করিল করিল বহুদান,' 'ধ্যানজ্ঞান তপজপ', ছিল 'তপস্বীর কর্ম'।

ব্রাহ্মণের কর্তব্য ও জীবনাদর্শ : ব্রাহ্মণের ধর্ম, মিত্রভাব সর্বপ্রতি দেবযোগ্য ধ্যান-জ্ঞান অভ্যাসিব নিতি। যোগী-সন্ন্যাসীর ভেক ছিল ঝুলি, কাঁথা, অস্থি, খড়া ও পাদুকা। ভোজ্য ছিল হরীতকী-আমলকী প্রভৃতি ফলমূল।

কুলনারীদের মধ্যে নাচ-গান-বাজনার বহুল প্রচলন ছিল :

কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীত
কেহো হাসে খেলে কেহো নাচে আনন্দিত।

তুক-তাক দারু-টোনা ও মন্ত্র-উচাটনে মানুষের বিশ্বাস ছিল গভীর, ভরসা ছিল অপরিমেয়। 'বিস্তর কুমন্ত্র টোনা সে রাজ্যে বিশেষ'। 'মন্ত্রবলে দর্পণের নারী সৃজিয়াছে।' মন্ত্রবলে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারত এক দেহ থেকে অন্যদেহে এবং ইচ্ছামতো কীট, মাছি, পশু-পক্ষী কিংবা মানুষের ছদ্মবেশ গ্রহণে ছিল না কোনো বাধা। 'শিখিল বহুল বিদ্যা মন্ত্র বহুতর।' 'মক্ষিকা হইতে পারি মন্ত্রের প্রভাবে।' 'পরঘট সঞ্চারিত আক্ষি মন্ত্রজানি।'

খেচরসিদ্ধি : মন্ত্রবলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সর্বত্র থাকত অবাধ গতি। যুদ্ধে অস্ত্র ছোড়ার সময়েও মন্ত্রযোগে অস্ত্রের সন্ধান হত অমোঘ। 'নানা মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্রবাণ।' ভূত-প্রেতের প্রভাবেও লোকের বিশ্বাস ছিল অবিচলিত।

ভূত-প্রেত, দেও-দানো ছাড়াবার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র ও বিবিধ। তাবিজ-কবচ, মন্ত্র ও স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান ছিল জনগণের নির্ভর ও ভরসা এবং নানা ঘরোয়া ও নৈতিক এবং সামাজিক কুসংস্কারও নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের ভাব ও আচরণ। যথা,

গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে :

শ্রাবণে নির্মিলে ঘর রোগ-শোক নিরন্তর
সে ঘরেতে বেড়এ আপদ
ভাদ্রে গৃহ নির্মে যবে গায়ে রোগ হএ তবে
আশ্বিনেত দ্বন্দ্ব বাঝে নিতি। ইত্যাদি

স্নান :

সোমে-গুরু ধন বাঁঢ়ে মঙ্গলে যে স্নান করে
আউ টুটি চিন্তা উপজএ
বুধেত ঐশ্বর্য বাঢ়ে ধনী হএ গুরুবারে
শুক্রবারে স্নান করে লোক। ইত্যাদি

রোগ :

বৃক্ষতলে দিগম্বর হই থাকে যেই নর
রবিবারে রোগ উপজএ।
লোক-দৃষ্টি হএ জান কিবা ভূত অধিষ্ঠান
অজা হংস তাতে দান হএ

কৃষ্ণ কুক্কুটী দিব   দানে বিঘ্ন খণ্ডাইব
ভূতদৃষ্টি হএ জান   অজা বৃষ দিব দান
পুরাণ ভাণ্ডার সমতুল।   ইত্যাদি

বস্ত্র :   নববস্ত্র শুক্রবারে   পিন্ধিলে উত্তম বারে
চিন্তা হোন্তে পরিত্রাণ মনে
নববস্ত্র ফাড়ি যবে   এহি রবিবারে তবে
ফাড়িব শাস্ত্রের পরমাণে।   ইত্যাদি

শুভকর্ম :   শনিএ মৃগয়া হএ   রবিএ গৃহ নির্মএ
বৃক্ষ যদি রোপে ফলে অতি।
শনি পরবাস যাএ   বণিজেত লভ্য পাএ
মঙ্গলে সংগ্রাম ভাল অতি
শুক্রেত বিবাহ্ কাজ   অতি ভাল শাস্ত্র মাঝ
পুণ্যকর্ম শুক্রতে করিব।

দেও-তাড়ন : মেষরাশি দেওধাম   'মহাদেও' যার নাম
পন্থে পাই মনুষ্য ধরএ
মুখে না নিঃস্বরে বাণী   চক্ষু হোন্তে পড়ে পানি
উন্মত্ত বচন কহএ।
তাহার ঔষধ পুনি   মউরের পুচ্ছ আনি
ধরিব শিরে তালপত্র সম
অশ্বের কপাল লোম   সেহ্ আনি দিব ধূম
ধূমে ধাইবেক ভুতাধম।
বৃষে 'বুধ' পাপাশএ   নদী তীরে নিবাসএ
কূপ পুষ্করণী তীরে থাকে।
দন্ত জিহ্বা কালা হএ   তনু কম্পে স্থির নহে
দন্তে দন্তে করি কড়াকড়ি।   ইত্যাদি

এমনি করে বিভিন্ন দেও-এর আসর ও তার প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে।

রাজনীতি :

১. চতুর্থে ভূমিক চাষা রাজ্যের জীবন
চাষাকে আপনে রাজা পালন করিব
ধর্মিক রাজার চাষা যুদ্ধে সৈন্য হএ
বল কৈলে যুদ্ধকালে সৈন্য না যুঝএ।
২. বিক্রম করএ জন প্রসাদে তুষিব।
৩. যুদ্ধ করি ধন পাই লেলাইব কাড়ি।
বিবর্তিয়া দিব ধন মনে কৃপা করি

৪. যার যেই যোগ্য কর্ম বুদ্ধি নিয়োজিব
কার্য কৈলে তাহাকে যে প্রসাদে তুষিব।
৫. দরিদ্রতা হোন্তে নত হৈব পাত্রগণ
বিস্তর না দিব ধন আলস্য হইব
ধন লোভে ঈশ্বরের কার্য না করিব।
৬. দুই কর্ম করি রাজা রাখিবেক দেশ
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হএ সবিশেষ।
দুই কর্মে একজন না দি কদাচন
এক হস্তে না শোভএ দুই শরাসন।
এক কর্ম দুইএ দিলে নিতি দ্বন্দ্ব হএ
একখাপে দুই খড়্গ যেন না শোভএ।
৭. সত্যবাদী দেখি চর রাখিব রাজন
চরকে যে পুত্রতুল্য করিব পালন।
চর সে রাজার চক্ষু সব বার্তা কহে
চর বিনে নৃপ ভালমন্দ না শুনএ।
৮. শুদ্ধপাত্র মধ্যে এক হএ দুর্মতি
তাহাক বধিলে সব হয়ন্তি সুমতি।
কিন্তু মহাপাত্রে যদি রাজা দোষী ভাবে
বন্দী করি রাখে তারে না বধি জীবন
তাহাকে বধিলে বল পাএ শত্রুগণ।
৯. দুষ্টজন হিংসা হোন্তে প্রজাক পালিব
গোধন সদৃশ প্রজা নিশ্চএ জানিব।
রক্ষক সদৃশ প্রাএ নৃপতি ঈশ্বর
সিংহ-ব্যাঘ্র সম জান দুর্জন বর্বর।
সেই সে দুর্জন মূঢ় পড়ি নিদ্রা যাএ
গোঠে বসি শার্দূলে গোধন ধরি খাএ।
১০. বিনি দ্বন্দ্বে কোনে বা রাখিছে রাজনীতি
দ্বন্দ্ব হোন্তে শত্রুনাশ মিত্রের উজ্জ্বল
দ্বন্দ্ব করি নৃপতি শাসিব মহীতল।
দ্বন্দ্বকালে দ্বন্দ্ব করি ক্ষেমা সর্বকাল
নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যেত জঞ্জাল।
প্রীতি করি নৃপতি সবে রাখিব মন
পুত্র বা পাত্র বা ভার্যা কিবা ভৃত্যগণ।
দান ধর্মে রাখিবা আপনা যশকৃতি
সামদণ্ডে শাসিব সকল বসুমতী।
মন্ত্রী পাত্র ও কায়স্তের ব্যবহার নীতি।
নৃপতির রোষ তুষ্ট হএ যেই কর্মে
সে সকল বুঝিয়া লেখিয়া থুইব মর্মে।

যে যে কর্মে সন্তোষ সে করিব নিশ্চএ
যদি আপনার মনে ভাল না লাগএ।
নৃপ সঙ্গে হট যদি কোথাত পড়এ
নৃপতির কথা সত্য কহিব নিশ্চএ।
যে কহে নৃপতি সেই কহিবেক পুনি
দিবসকে জান রাজা বোলএ রজনী।
যদি কহে দিনে রাজা হৈব রজনী
পাত্রে কহিলেক সেই তত্ত্ব হেন জানি।
বলিব উগিছে চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ
এইমতে রাখিবেক নৃপতির মন।
নৃপতির কথা না কহিব কার স্থান
গোপ্তব্যক্ত করিলে হারাএ নিজ প্রাণ।
যদ্যপি কহিতে পারে বহু না কহিব
মুখ দোষে দুঃখ পাএ নিশ্চএ জানিব।
নৃপতির প্রীতি দেখি না হৈব ভোর
নৃপতি আপনা করি যে না করে ভএ
অতি শীঘ্রে অগ্নি যেন ধরি কোলে লএ।
রাজার চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে
ক্ষেণে দোষে হাসে ক্ষেণে স্তুতি কৈলে মারে।
নৃপতি করিলে শাস্তি না কহিব কা'ক
যার বুদ্ধি থাকে কভো না চটাএ রাজাক।

প্রজার দায়িত্ব কর্তব্য ও আনুগত্য :

প্রাণপণ করিবেক নৃপতি কারণ
প্রাণ ভএ কভো ভঙ্গ না করিব রণ।
চরমুখে শত্রুবার্তা লৈব নিরন্তর
নৃপতিক জানাইব সে সব উত্তর।
নৃপতি কহিতে কথা না হৈব বিমন
পাত্রগণ সঙ্গে যুক্তি করিতে নৃপতি
আগে না কহিব বুঝি সভার প্রকৃতি।

সৈন্য :

নৃপ হোন্তে সৈন্য যদি মন দুঃখ পাএ
বামবুদ্ধি হএ সব, রাত্রি তম প্রাএ।
সৈন্য করে রাজ্য রক্ষা ধনে রাখে সৈন্য
ধনে সৈন্যে সর্বধন রাখে অন্যে অন্য।

সতর্কতা :

যেই বস্তু উপরে রাজার যাএ মন
সে বস্তু আপনে না রাখিব কদাচন।

ইঙ্গিতেহি ধন প্রাণ নৃপ আগে দিব
কাক যদি নৃপতির কোপ থাকে মন
নহে অপবাদী হই থাকে সেই জন।
তান সঙ্গে হাসি-রসি কথা না কহিব
না বসিব পাশে, তাকে নাহি প্রশংসিব।
নিজ কার্য হেতু রাজ কার্য না এড়িব
যে কার্য দিয়া থাকে প্রাণান্ত করিব।

কবির উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষ চট্টগ্রামের সেনানী শাসক (উজির) ছিলেন। তাঁর পিতৃব্যও ছিলেন উজির। কাজেই শাসক ও শাসিতের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তাঁর সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি পেয়েছে উদ্ধৃতাংশে, মনিব-মজুর কিংবা দফ্‌তরের হুজুর ও তাঁবেদার চাকুরের জন্যে এ নীতি আজও ফলপ্রসূ।

বিবিধ বিষয়ে নানা হিতকথাও কাব্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে।

[উত্তম ও অধম]

অহঙ্কার :

সিংহ মারি অহঙ্কার উত্তমে না করে
অধমে শূকর মারি সিংহনাদ ছাড়ে।
কোকিলে না করে গর্ব চ্যূতাঙ্কুর পাই
ভেককুল গর্বএ কর্দম জল খাই।
গর্ব যেই করে তার অবশ্য লাঘব
অহঙ্কার করে লোক পাএ পরাভব।

নম্রতা :

নম্রভাবে পুরুষের শাস্ত্রেত বাখানি
নম্র হএ ডালবৃক্ষ ফল ধরে পুনি।
নিষ্ফল শিমুল বৃক্ষ ছুঁইল আকাশ
অহঙ্কার গর্ব কৈলে অবশ্য বিনাশ।
নম্রভাবে শত্রুমনে কৃপা উপজএ
অহঙ্কারে মিত্র সব শত্রুতুল্য হএ।

সেনানীবিহীন সৈন্য :

মৃগ যেন ধাএ পাই সিংহের আতঙ্ক
নৃপতির ভঙ্গে সৈন্য ধাএ চারি পাশ
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা যাএ আন পাশ।

স্বামী :

(নারীর) স্বামী হোন্তে নাহি গুণজন
দুষ্টস্বামী অশ্বত্থের বৃক্ষপ্রাএ
ছায়ামাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ।

ধন ও জীবিকা :

বটেকে বটেকে খাইলে ফুরাএ ভাণ্ডার

বটেকে অর্জিলে হএ পর্বত আকার।
বণিজ্জ করিতে যদি নারে কদাচন।
সুস্কতে করিব কৃষি অর্জিবেক ধন।

পরোপকার : লোকহিত করিবেক মেঘের তুলনা
সর্বস্থানে জল যেন বরিখএ ঘনা।
উত্তম অধম প্রতি করিবেক হিত
সূর্যের কিরণ যেন লাগে পৃথিবীত।

ষটঅগ্নি : ষটঅগ্নি সংসারেত শুন অগ্নি কহি
এক অগ্নি নরকে পাতকী যাএ দহি।
সেই প্রভু করতার কৃপার সাগর
কৃপা কৈলে নিবাএ সে অগ্নি খরতর।
আর অগ্নি সংসারেত দহে বৃক্ষগণ
জীবনে সে লৈতে পারি তাহার জীবন।
আর অগ্নি উদরেত শরীর জ্বালএ
অন্ন পাইলে শান্ত হএ সে অগ্নি নিশ্চএ।
আর অগ্নি দহে বিরহের বিরহিণী।
প্রথম সঙ্গমে অগ্নি নিবাএ আপনি।
আর অগ্নি চিন্তার চিন্তিত দহে মন
মনোরথ সিদ্ধি হৈলে পাএ নিবারণ।
আর ক্রোধানল হোন্তে ধর্মে পাএ নাশ
ক্ষেমা হোন্তে নিবি যাএ সে পাপ হুতাশ।

ধন-মাহাত্ম্য : ধনহীন দাতার বিপদে মনদুখ
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ।
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ্ন বদন
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন।
ধনহীন স্বামীপ্রতি প্রেম ছাড়ে নারী
মধুহীন ফল যেন না লএ শুক শারী।

তিনকার্য : তিনকার্যে মনুষ্যের সঙ্কট পড়এ
বহুভোগ বহু নিদ্রা যে বহুক হএ।
বহুকথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে
[তুল : সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর]
তিল এক ধর্মপন্থে মিথ্যা নাহি সহে।

সত্যবাক্যে স্বর্গবাস মিথ্যাএ নরক
মিথ্যা যেন ফোঁটা, সত্য চন্দন তিলক।

চারকর্ম : চারি কর্ম মনুষ্যে করিব ধর্ম ছাড়ি
সত্য ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী।
মিথ্যা কহি প্রাণ রক্ষা করিব নিশ্চএ
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি রোগ নাশ হএ।
সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণ রক্ষা পাএ
লজ্জা ছাড়ি প্রাণ রক্ষা করি সর্বথাএ।
আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব।

কুলধর্ম ও কুলাচার : যুদ্ধেতে বিমুখ হৈলে নরকে বসতি
যুদ্ধে মৈলে কীর্তি রহে স্বর্গেত গমন,
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া যে প্রাণের কাতর
নিষ্ফল জীবন তার সংসার ভিতর।
নিজকুলধর্ম ছাড়ে যেই দুরাচার
গন্ধহীন পুষ্প যেন নাহি প্রতিকার।
এথেক জানিয়া লোকে কীর্তি সে আচরিব
প্রাণান্তেহ নিজ কুল-ধর্ম না বর্জিব।
সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম
কুল-কর্ম-ধর্ম কভো না তেজে উত্তম।

চেষ্টা : চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতর
নিজ দোষে কাপুরুষ হএ অথান্তর।
চেষ্টা কৈলে তাক লোকে নিন্দএ অনেক
চিন্তিলে না হএ কার্য দৈব পরিপাক।
মথিলে সে দুগ্ধে ঘৃত পাওন্ত গোয়াল
চেষ্টিলে সে কার্য সিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল।

চারবস্তু : চারি বস্তু বিষম কহিএ শুন তোক
গুরু গৃহ দূরে হৈলে শিষ্যের বিপাক।
বিশেষ অর্জিলে ভোগ বিষ সমতুল
যার গোষ্ঠী দরিদ্র সে নিশ্চিত আকুল,
তাহাত বিষম জান বৃদ্ধের তরুণী।

চারশত্রু : চারি শত্রু ঘরে রাখি থাকে যেইজন
অবশ্য দুর্গতি তাঁর বিকৃত মরণ।
দুষ্ট দোচারিণী নারী মিত্র যার শঠ

উত্তরদায়ক ভৃত্য পায়এ সঙ্কট।
সর্প যেবা ঘরে রাখি নিঃশঙ্ক মন।
এই চারি শত্রু হোন্তে সংশয় জীবন।

যোগতত্ত্ব ও যৌগিক চিকিৎসা : যোগী পুস্তকেত চাহি ঔষধের বড়ি
ত্রিপিনী তিহরী মধ্যে যোগী ধন্বন্তরী।
গুরুভক্তি করি শিব-শক্তি এক লৈল
ঊর্ধ্বানলে বাউ ভক্ষি তাত ফুক দিল।
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলিল প্রসন্ন দিগন্তর
ধ্যান বলে জ্ঞান অগ্নি জ্বলিল সত্বর।
যেন জুতি প্রকাশিত তম পাইল ক্ষএ
স্বর্গমর্ত্য পাতালে উঠিল জএ জএ।

নির্ধন হওয়ার কারণ : আর এক কথা প্রতি কহি শুন পুনি
আপনার দোষে লোক হয় নির্ধনী।
পরদার করে যেবা মিছা কথা কহে
শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া যেবা স্নান না করএ।
বাপমাও গুরুক অসন্তোষ করে
অবজ্ঞাএ নাম ধরে ডাকে উষ্ণস্বরে।
বাপের ভগিনী কিবা মায়ের ভগিনী
যথ গুরুজনকে যে দুঃখ দেত পুনি।
আপনার সন্ততিরে নিত্য গালি পাড়ে
অভ্যাগত আইলে যেবা মন দুঃখ করে।
মিথ্যা দিব্য ধরে যেবা না করিয়া ভএ
প্রভাতে সন্ধ্যায় যেবা নিদ্রা সে যাএ।
স্বামী হোন্তে চুরি করি যে ধন সঞ্চএ
সেই নারী থাকিলে সে নির্ধনী হএ।
পুত্র বোল না ধরএ পড়শী দুর্জন
আপনে আলস্য লোভ করে সর্বক্ষণ।
ভৃত্যগণ বিমতি মনেত নাহি প্রীতি
এ সকল চরিত্রে নির্ধনী হএ অতি।
পিন্দন বসনে হস্ত মুখ যে পোছএ
পড়িয়া থাকএ অন্ন যেবা না তোলএ।
যথা মুখ ধোএ তথা প্রস্রাব যে করে
ভূমিতে ঘসিয়া হস্ত পাখালে যে নরে।
ভিক্ষুকের তণ্ডুল কিনিয়া যেবা খাএ
ফুক দিয়া প্রদীপ যে জনে নিবাএ।
কাটারি এড়ি দন্তে যেবা নখ কাটে নিতি

থিয়াই আঁচড়ে চুল যেবা ক্ষুদ্র মতি।
ভাঙ্গা ফণী দিয়া যেবা কেশ আচারএ
এথেক প্রকারে জান নির্ধনী হএ।

দরিদ্রতা :

দারিদ্র্যেত ব্যবসা না রহে সর্বথাএ
বাপমাও না সম্ভাষে স্বামী কৃপা ছাড়ে
পুত্রে না করএ কৃপা জ্ঞাতি না আদরে।
ঈশ্বরে না করে দয়া ভীত ছাড়ে ভএ
নির্ধনী পড়শী দেখি সকলে হিংসএ।

চিন্তা-মুক্তি :

ভোগীবলে ভাগ্যবন্ত থাকে যার ঘর
শত্রু ভয় না থাকে অরুগী হএ অঙ্গ
এ তিন প্রকারে চিন্তা না থাকিবে সঙ্গ।

দুশ্চিন্তা :

যার বহু ধার হএ চিন্তা বাড়ে অতি
আপনা শোণিত পান করে প্রতিনিতি।
যার অল্প অর্জন বহুল হএ পোষ
নিরন্তর চিন্তা পাএ মন অসন্তোষ।

আয়ু-বৃদ্ধির কারণ :

ভোগী বোলে শুনিলে সুশব্দ নিরন্তরে
চন্দ্রমুখী প্রিয়া মুখ যে নিতি দেখএ
ধন প্রাণ লাগি যার না থাকএ ভএ।
মনোবাঞ্ছা পুরে নিতি ঘুচএ জঞ্জাল
এ চারি প্রকারে আউ বাড়ে সর্বকাল।

আয়ু-হ্রাসের কারণ :

ভোগী বোলে দীর্ঘ রুগী হএ যেইজন
বৃদ্ধকালে নির্ধনী পরের করে আশ
থাকিতে টুটিব আউ হইয়া নৈরাশ।
অবিরত মিথ্যা-অঙ্গ দেখে যেইজন
নিরন্তর শত্রু ভএ থাকে তার মন।
নারীগণ নাভি-হেঁটে যেজন দেখএ
এ পঞ্চ প্রকারে আউ টুটএ নিশ্চএ।

চার অভাগা :

হীনজন অপমান শরীরে না সহে
হীন সেবা হোন্তে ভাল যদি মৃত্যু হএ।
স্বামী সোহাগ হীনা নারী বিফল জীবন
যার নারী অসতী সে জিএ অকারণ।
যে জনে ধনীর ঘরে মাগে নিরন্তর

ভুঞ্জএ নরক দুঃখ সংসার ভিতর।
এ চারিজনের পুনি মরণ সে ভাল
মৈলে সে ঘুচএ দুঃখ পাতকী জঞ্জাল।

বল-বৃদ্ধির কারণ :

ভোগী বোলে ঘৃত মাংস করিলে ভোজন
সুগন্ধি আমোদ গন্ধ পাইলে অনুক্ষণ
অনুদিন স্নান নব বসন পরিলে
গাএ বল বাঢ়ে অর্থ গঠিত থাকিলে।

শক্তি-হ্রাসের কারণ :

ভোগী বোলে বহুতর চিন্তা থাকে যার
বল টুটে যে অমূল্য খায়ন্ত বিশেষ
বহুনারী সম্ভোগে বহুল হএ শেষ।

রমণের নিয়ম :

ভোগী বোলে প্রতিপদে অষ্টমী দশমী
অমাবস্যা পূর্ণিমাত নারীক না রমি।
প্রভাত সমএ যদি সম্ভোগ করএ
সেইক্ষণে জন্মে পুত্র কাল ঘোর হএ।
লেঙ্গটা হইয়া যেই কর এ রমণ
ভূত-দৃষ্ট হএ সেই শাস্ত্রের বচন।
রোগবিকার ঘোরে করিলে শৃঙ্গার,
উন্মত্ত পুত্র হএ চঞ্চল বেভার।
বুধ রবি রাত্র দিনে যে জনে রমএ
তাত পুত্র জন্মিলে অধর্মী পাপী হএ।
সোম শনি গুরুবারে যে জনে রমএ
সত্যবাদী ধর্মিক মঙ্গল উপজএ।
সোম শুক্র গুরু রাত্রি রমিবেক নারী
জন্মিব চিরাউ পুত্র শুদ্ধ ধর্মচারী।
প্রথম প্রহর মন্দ দ্বিতীয় মধ্যম
তৃতীয় প্রহর রাত্রি রমিলে উত্তম।
অধিক উত্তম জান চতুর্থ প্রহরে
সন্ধ্যাকালে কদাপিহ না রমিব নরে।
এককালে পতি-পত্নী বিন্দুপাত হৈলে
নপুংসক পুত্র হএ সেক্ষণে জন্মিলে।

পুত্র ও কন্যা জন্মের রহস্য :

এক, তিন, পঞ্চ, সপ্তে, নয়, একাদশে
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে।
পুত্র উপজএ যদি হএ গর্ভবতী
যে যে দিনে কন্যা হএ শুন নরপতি।

দুই চারি ছয় অষ্ট দশম দ্বাদশে
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে।
গর্ভবতী হএ যদি কন্যা উপজএ
কহিলুঁ কন্দর্প কথা শুন মহাশএ।
শুক্র সোম শনি গুরু দক্ষিণে পবন
এদিনে স্রবিলে ঋতু জন্মএ নন্দন।
রবি ভোর বুধ বামে শ্বাস বাউ বহে
তাত ঋতু আপেক্ষিলে কন্যা উপজএ।

গর্ভবতীর আচরণীয় :

ভোগী বোলে গর্ভবতী হইলে সুন্দরী
ক্ষুধাতুর উপবাস না থাকিব নারী।
আমলকী ফল গর্ভবতী না খাইব
আমলকী কাষ্ঠ অগ্নি ঘরে না জ্বালিব।
অম্ল লবণ আনি না খাইব সুন্দরী
বহু রৌদ্রে বসি না থাকিব হেলা করি।
শীত বলি অগ্নি জ্বালি ধিক না বসিব
উঞ্চ নীচ পন্থ দেখি বুঝিয়া হাঁটিব
অশ্বে গজে না চড়িব না চাহিব কাক
কোপ করি মন দুঃখে না দিবেক বাক্।
না চাহিব গর্ভবতী কূপ অভ্যন্তরে।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা :

ভোগী বোলে কপি যেন ঝুনা নারিকেলে
খাইতে না পারে জল নাচে কৌতূহলে।

তরুণের বৃদ্ধা ভার্যা :

ভোগী বোলে শুক সঙ্গে যেহেন উল্লুক
অবশ্য পেচক হস্তে প্রাণ দিব শুক।

দম্পতি :

পতি সঙ্গে সতীর কলহ চির দিন
না রহএ জলে জল নহে যেন ভিন।
চির দিন না রহে মিত্রের কোপ মন
কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন।

দুষ্টনারী প্রীতি নাহি রহে চিরকাল
অবশ্য কলহ বাঝে ঠেকএ জঞ্জাল।

আত্মজ্ঞানী :

মুনি বোলে যে জনে করে পর উপকার

আত্মপ্রাণ পরপ্রাণ সমতুল যার।
যে জনে আত্মা চিনে সত্যবতী জান
দুঃখ সুখ সমতুল যার হএ জ্ঞান।

দুষ্টমিত্র :

দেবী বোলে দুষ্টমিত্র সমস্যা কেমত
মুনি বোলে ষটাঙ্গুলি হস্তেত যেমত।
কাটিয়া ফেলিলে গাএ না লাগে বেদনা
রাখিলে সংসার মাঝে অযশ ঘোষণা।
দেবী বোলে দুষ্টমিত্র সমস্যা কি বোলে
মুনি বোলে অক্ষি যেন লৈতে চাহে খুলে।

দুষ্ট স্বামী :

দুষ্ট স্বামী অশ্বত্থের বৃক্ষ প্রাএ
ছায়া মাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ।

মিত্রতা বৃদ্ধি :

মুনি বোলে দোষ দেখি যেজন ঢাকএ
সেই দুই জনের মাঝে মিত্রতা বাঢ়এ।
দেবী বোলে কোন কর্মে সব মিত্র হএ।
মুনি বোলে যেই জনে মিছা না কহএ।

পুণ্য-পেশা :

মুনি বোলে ক্ষেতি চাষ করিব সদাএ।

পাপ-পেশা :

মুনি বোলে পাপ হএ মদ্য বেচি খাইলে।

অমানুষ :

সত্যবতী বোলে অমনুষ্য কোন্ হএ
মুনি বোলে লোভী হই বহুল ভক্ষএ।

অতিথি সৎকার :

নানা ভোগ ভুঞ্জাইব করি পরিহার
বাঢ়াই দিবেক সে যাইতে আরবার।
অভ্যাগত যাচক পণ্ডিত গুণিগণ
যার দ্বারে আসে পাএ করে যেইজন।
এই সকল যার দ্বারে সেই ভাগ্যবন্ত
তাক মনে দুঃখ দিলে লক্ষ্মীএ ছাড়ন্ত।

বিড়ম্বিত সত্য :

দেবী বোলে সত্যকথা কোথা মিথ্যা হএ
মুনি বোলে বৃদ্ধকালে যৌবনের কথা
দুঃখেত সম্পদ কথা নাহিক সর্বথা।
মিথ্যা কথা কহিলেহ মিথ্যা বোলে লোক
সত্য কথা কহিতে মনেত বাড়ে দুঃখ।

যোগসিদ্ধি :

দেবী বোলে যোগপন্থ কোন্ কর্মে পাই।
মুনি বোলে পঞ্চবৈরী যে পারে জিনিতে
মায়া মোহ লোভ কাম কোপ নিবারিতে।

বুদ্ধিমান :

দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বুলি কোন গুণে
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে।

চার অপাত্র :

দেবী বোলে যুক্তি কা'ত রাখিব লুকাই
মুনি বোলে না কহিঅ চারিজন ঠাঁই।
দুষ্ট নারী বালক কিঙ্কর শত্রু স্থান
যুক্তি না কহিবে ভাঙ্গি যদি থাকে জ্ঞান।

বৈদ্যের কর্তব্য :

ত্রিতিয়া বোলন্ত বৈদ্য ধর্মিক ভজিব
ধর্মিকের হস্তেত বিষ অমৃত হইব।
না বুলিব মুঞি রোগ করি দিব ভাল
না হইলে পাএ লাজ সে পাপ বিশাল
আগে নিরঞ্জন বুলি কহিব বচন
শেষে ভক্তি করিয়া চাহিব রুগীগণ।
নির্ধনী দেখিয়া কভো নাহি উপেক্ষিব
পুণ্য ফলে সেই ধন নিরঞ্জনে দিব।
রুগী করি ঘৃণাক্ষরে না করিব মনে
জানিব সভাকে দিতে পারে নিরঞ্জনে।
রুগীস্থানে ঔষধের নাম গ্রাম কৈলে
দেরীতে খণ্ডএ রোগ ধন্বন্তরী হৈলে।

আদর্শ পরিবার :

লোভ করি নৃপধন না করিব উন
স্থির বুদ্ধি হই বজাইব সর্বগুণ।
লোক সব অপকার কভো না করিব
কিন্তু মাত্র বহু-ঝিক বুদ্ধি না লইব।
নিজ বুদ্ধি হৈলে যেন কান্তের সংবাদ
পাপ না করিব, পাএ না হৈব মুগধ।

সঙ্কটে তিন কুলাচার

সঙ্কট কার্যের তিন কুলাচার রহে
লোক সব অপহিংসা কভো না যুয়াএ।
আপনে অর্জিব যে সে করিব না ভোগ
বিনি বুদ্ধি কি করিব তিন সমযোগ।
কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর।

পাপ ও পাপীর পরিণাম :

প্রথমে যে সাধু সব মিথ্যা কহে নিতি
উলটে ঠকাই পাপী হরে পর বিত্তি।
দ্বিতীএত বাপহীন বালকের বিত্তি
যেবা বলে হরে তার শুন যেন গতি।
তৃতীএত পড়শীক বল করি থাকে
নরকেত হস্তপদ ছেদিবেক তাকে।
চতুর্থেত ধর্মবন্ত জন'ক যে নরে
সম্ভাষে নারকী কিবা উপহাস করে।
পঞ্চমেত যে সকল নিজ কুলাচার
শাস্ত্রনীতি না সেবএ প্রভু করতার।
ষষ্ঠমেত স্থাব্যধন যে করে ভক্ষণ
পিষ্ঠে জিহ্বা নিকালিব করিব যাতন।
সপ্তমেত যে সকলে করে পরদার
দূতসবে প্রহারিব অগ্নির মাঝার।
অষ্টমেত আরে করি যে পাপিষ্ঠ নারী
লোক ভএ গর্ভপাত করে অনাচারি।
নবমেত যে সকলে করে মধু পান
মধুমত্ত হই কিবা তেজিব পরাণ।
দশমেত ধন খাই যে পাপিষ্ঠ ছার
একহেতু অন্যের করএ অপকার।
একাদশে যে সকলে পরচর্চা করে
কপি রূপে রহিবেক নরক অন্তরে।
দ্বাদশে যে পাপ করে লোক অপকার
ধর্মভীত করি লোকে করিল প্রচার।
ত্রয়োদশে লভ্যধন খাএ যেই জন
দহিব নরক অগ্নি সেই সকল জন।
চতুর্দশ শাস্ত্র পড়ি যেবা পাসরএ
নরকেত অন্ধ হই রহিব নিশ্চএ।
পঞ্চদশে যে সকলে ন্যায় বুঝি নিতি
ধন খাই অন্যায় করিল পাপমতি।
ষষ্ঠদশে মিছা সাক্ষী দিল যেইজন
উর্ধ্ব কণ্ঠে হাঁটিবেক গর্ব করি মন।
অষ্টদশে গৃহ কর্মহেতু যেইজন
সময়েত না করএ প্রভুক সেবন।
নবদশে যে আহুকে করে পাপকর্ম
সভাকে আদেশ করে করিবারে ধর্ম।
বিংশভাগ যে সকলে শুনে একমন
নরকে পড়িব গুরু-নিন্দে যেইজন।

শৃঙ্গার করিয়া স্নান যেবা না করএ
কুম্ভ পাক নরকেত সে সব পচএ।
অপবিত্রে জপতপ যজ্ঞ অকারণ
অপবিত্রে পুণ্য করি নরকে গমন।
পুরুষের সঙ্গে যদি পুরুষে রমএ
অঘোর নরকে জান সে পাপী পড়এ।
মাও বাপ হিংসে যেবা নাম ধরি ডাকে
সে সকল পড়িব নরক কুম্ভপাকে।
রজস্বলা হই নারী গঞ্জিল সমএ
স্নান না করিয়া যদি শৃঙ্গার করএ।
সে নারী-পুরুষ কিবা নরকে গমন। ইত্যাদি

চার পুণ্যবান : যে করে সন্তোষ নিতি ভিন্নজন মন
নিজ মনে যে কহে না কহে বিপরীত
সভাথু আপনে হীন জানিব নিশ্চিত।
গুরু উপদেশ ধরে করি প্রাণ পণ
মহা পুণ্যবন্ত জান এই চারিজন।

চার স্বর্গবাসী : ধার্মিক নৃপতি আর নির্লোভ তপস্বী
সত্যবন্ত পুরুষ যুবক সতী নারী
স্বর্গবাসী চারিজন দেখহ বিচারি।

রোগ প্রতিরোধক পাঁচটি ব্যবস্থা :
সত্যবোলে পঞ্চ কর্মে রোগ নাশ হএ
কিছু ক্ষুধা রাখি অন্ন যে জনে ভক্ষএ।
বহু মিষ্ট না খাইব তিক্ত যে ভক্ষিব
চক্ষুতে দিবেক জল কর্ণে তৈল দিব।
প্রভাতে লবণ দিয়া মাজিব দশন
বহু উপকার জান শাস্ত্রের বচন।
ধনবন্ত হএ সুখে সুগন্ধি নিঃসরে
আর জান দশনের যথরোগ হরে।
দশন পবিত্র হৈলে শির-ব্যথা যাএ
মাজিলে দশন উপকার সর্বথাএ।

পাঁচটি ভালো কর্ম : ত্রিতিয়া বোলন্ত জান পঞ্চকর্ম ভাল
প্রতি ঋতু ফিরিলে যে করএ পাখাল।
প্রথমে গলের মাঝে অঙ্গুলি সঞ্চারি
উগলে অভ্যাস করি উপদেশ ধরি।

অর্ধপ্রহর হইলে যে করে ভোজন
বিস্তর অম্বল জল করে উপেক্ষণ।

পাঁচ প্রকার নিদ্রা :

দ্বাপরে বোলন্ত নিদ্রা যাএ বুদ্ধি হরে তার
প্রহরেকে নিদ্রা গেলে নিরোগী হয়ন্ত
মধ্যাহ্নে নিদ্রা ধনবন্ত ভাগ্যবন্ত।
আড়াই প্রহরে নিদ্রা যাএ যেইজন
উনমত্ত বেশ হএ শাস্ত্রের বচন।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ অতিশএ
চঞ্চল চরিত্র জান সেই জন হএ।
দিবসের নিদ্রা এই পঞ্চ পরকার
সহজে রাত্রির নিদ্রা জগতে প্রচার।
বহু নিদ্রা যাএ জন পশুর আকৃতি
বহু উজাগরে রোগ উপজএ তথি।

কলিকালের লক্ষণ :

যোগী বোলে শুন দেবী কহি ইতিহাস
কলি শেষে হইব জান প্রলয় প্রকাশ।
প্রলয়ের আগে হৈব কাল বিপরীত
পণ্ডিত হৈব মূর্খ মূর্খ সে পণ্ডিত।
হীন অকুলীন হৈব রাজ্যের ঈশ্বর
কুলীন উত্তম হৈব জানহ কিঙ্কর।
যার পিতামহ জান বাস নাহি করে
করিব উত্তম গৃহে সে সকুল নরে।
কুলীনে পাইবে তার আঙ্গিনাতে ঠাঁই
সাধু জনে দুর্জনকে সেবিবেক যাই।
লম্পট আছিল যেবা রাখিব গোধন
পিন্ধিব বিবিধ বস্ত্র নানা আভরণ।
লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈব ধনবন্ত ভোগী
রাজা হৈব ধনহীন কাঙাল হীন যোগী।
তপস্বীর ক্ষেমা যাইব উত্তমের বুদ্ধি।
শাস্ত্র জানি কেহ না করিব ধর্ম সুদ্ধি
শাস্ত্র শিখিবেক লোকে অর্জিবারে ধন
সে হইবে পণ্ডিত যার উত্তম বসন।
বৃদ্ধ হৈব নির্লজ্জ বালকে না মানিব
গুরুজন বলি কেহ মান্য না করিব।
সাধু সব কপটে হরিব পর বিত্তি
ধনদান না করিব না অর্জিব কীর্তি।
লজ্জাহীন হৈব সংসারের নারীগণ

দাসীর উদরে হৈব ঈশ্বর নন্দন।
বিবাহিতা নারী-প্রেম পুরুষে-এড়িয়া
দাসীত হৈব মগ্ন মর্যাদা ছাড়িয়া।
এক পুরুষেরে বহু নারীএ মাগিব
মোকে পরিণয় কর তাহাকে বলিব।
লভ্যধন খাইব করিব সুরাপান
পরপ্রাণ বধিবেক না থাকিব জ্ঞান।
মিথ্যাদোষ ধরি দ্বন্দ্ব হৈব পরস্পর
সত্যবাদী মিথ্যা হৈব সভার ভিতর।
সত্যবাদী হৈব যে কহে মিথ্যা কথা
ইষ্টবান্ধবের কেহ না থাকিব ব্যথা।
পণ্ডিত দেখিয়া লোক হইব অন্তর
শাস্ত্রকথা না শুনিব পাপের অন্তর।
পণ্ডিতেহ সভাকে না দিব উপদেশ
আপনে অধর্ম কর্ম করিবা বিশেষ।
বড় ঘর বড় বাড়ী করিব সকলে
না স্মরিব মৃত্যু হইলে যাইব মহীতলে।
অধার্মিক হৈব লোক পাপে মগ্ন হৈয়া
প্রভু স্থানে অপরাধ না লৈব মাগিয়া।
সংসারের মায়া মোহে মুগ্ধ হৈব লোক
না চিন্তিব কেমন পাইব পরলোক।
রাজা হৈব সিংহ ব্যাঘ্র হৈব পাত্রগণ
শৃগাল সদৃশ হৈব পাপিষ্ঠ দুর্জন।
অজার সদৃশ হৈব সত্যবন্ত লোক
সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল দেখিয়া পাইব শোক।
কলিকালে হইবেক এথ বিবরণ
দুগ্ধ হীন হৈব গাভী, বৃক্ষ ফল হীন।
শস্য না ফলিব ফলে না থাকিব স্বাদ
নিদাঘে বরিষা হৈব বড় পরমাদ
বিনিয়োগ মরিবেক সংসারের লোক
দুর্ভিক্ষ দুর্দিন হৈব বাড়িবেক শোক।

বোঝা যাচ্ছে, সতেরো শতকেও আজকের মতো কলি বিদ্যমান ছিল, কেননা কবি ভবিষ্যৎবাণীর ভান করে তাঁর কালের মানুষ ও সমাজের চিত্রই দিয়েছেন।

হিন্দুপুরাণের অনবরত ও অজস্র প্রয়োগে সত্যকলির কাহিনীর পরিবেশ সর্বত্র অক্ষুণ্ন রয়েছে। দেদার প্রয়োগ কোথাও বিসদৃশ হয় নি, বরং সুব্যবহারের লাবণ্যে সুষমা বেড়েছে।

যথা :

১. তারাক হরিল যেন চান্দ।
২. যে নাগের বিষঘাতে পরীক্ষিৎ হৈল পাত।
৩. বলিরাজা দাতা হৈল তোহ্মার প্রসাদে
হিরণ্য কশিপু মৈল তোহ্মার বিবাদে।
৪. বহু বহু নষ্ট যোধ কৌরব পাণ্ডব
৫. বিবাদে পাণ্ডব কুরু গ্রাসিলেক কাল।
৬. রাহু যে নাশিতে আছে রবির কিরণ।
৭. রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে।
৮. সাহসেত ভজে লক্ষ্মী জানহ নিশ্চিত।
৯. হরগৌরী পূজে নিরন্তর বরমাগে পূজিয়া শঙ্কর।
১০. এথ চিন্তি গঙ্গাদেবী করি আরাধন।
১১. হেন রূপ দেখি ইন্দ্র গুরু দার হরে।
১২. যাকে দেখি হরি-বিষধর (শিব) ধ্যান ছাড়ে।
১৩. কিবা বিধি কলানিধি হরিহর আদি
১৪. রাহু যেন চান্দ চাহে করিতে গরাস
১৫. যাহার মরমে হানে কাম পঞ্চবাণ
রাজা-প্রজা যোগী-ভোগী তার হরে জ্ঞান।
এই চান্দ মুখ হৈল সমুদ্র মথনে
ভাল চান্দ শিবশিরে রাখিল যতনে।
এই মুখ সুধা পিয়া জীএ সুরপতি
এই কুচ যুগ হোন্তে মদন নৃপতি।
এই ভুরু ধনু ধরি রঘুর নন্দন
বুঝিএ বধিল রাম রাজা দশানন
কিবা এই ধনু ধরি ভৃগুপতি বীর
কাটিল কার্তিক বীর্য অর্জুনের শির
এহি সে গাণ্ডীব ধরি ধীর ধনঞ্জয়
ভীষ্ম আদি কৌরব করিল পরাজয়।
তারাবতী কোলে ক্ষুদ্র যোগী কহি শুন
এ ধনু না ধরে রাম না ধরে অর্জুন।
যেই ধনুর্বাণে মোহ হৈল ত্রিপুরারি
সে বাণে মরমী যোগী কড়ার ভিখারী।
১৬ বামন মৈল যেমন ব্রাহ্মণী কারণ।
১৭. বাসুকী বাসবে যেন যুদ্ধ ঘোরতর।
১৮. অনন্ত বাসুকী যেন পাতালেত পশে।
১৯. শকুনি জিনিল পাশা কপট কারণ
২০. পাণ্ডবে কপট করি কৌরব সংহারে
২১. কপটে ব্রাহ্মণ দেখ বলিক ছলিল।
২২. কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরে পাইল অপবাদ

২৩. মোহোর প্রসাদে বলি ইন্দ্রপদ পাইল।

২৪. মোহের প্রাণেশ্বর শ্যাম নবজলধর

২৫. হরিচন্দ্র সমজ্ঞান রঘুর সদৃশ মান
গাণ্ডিবে অর্জুন সম যোধ।
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু জ্ঞানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
সংগ্রামে বিজয় সম রাম।

২৬. সমুদ্র মথনে যেন অমৃত উঠিল।

২৭. গোবিন্দ নিমিত্তে যেন পাণ্ডব-উদ্ধার।

২৮. দীক্ষাগুরু কল্পতরু জ্ঞানে ত্রিপুরারি

২৯. কথ শাস্ত্রে চন্দ্র সূর্য পূজে না জানিয়া

৩০. শুক্র সম জান মানে দুর্যোধন
বুদ্ধিএ শকুনি তুল।

৩১. নতু শক্র শাপে ভ্রষ্ট হই বিদ্যাধর

৩২. হরে গৌরীদান করে প্রতিজ্ঞা কারণে

৩৩. রম্ভাভাবে দেখ মধুকৈটভ বিনাশ

৩৪. গৌরী হেতু মহেশ স্বর্বাংশে হএ বিনাশ

৩৫. ইন্দ্র-চন্দ্রে লজ্জা পাএ নারীর কারণ

৩৬. কিবা রতি সীতা সতী হরের যে গৌরী

৩৭. চন্দ্রেত কলঙ্ক দেখ তারার কারণ

৩৮. কালী ধরে মুণ্ডমালা ইন্দ্র পাএ লাজ

৩৯. সহস্রলোচন বন্দী হৈল সেই কাজ

৪০. মাধবে গোপিনী পরে করে কুন্তীসতী

৪১. সতী দ্রৌপদীএ বরে পাণ্ডু পঞ্চপতি

৪২. রাবণে হরিল সীতা রামক সমিত।

৪৩. ভৃগুপতি মাতৃ বধে লোক অবহিত।

৪৪. মহারাজা নলকে ভ্রমাইল বনে বন
দময়ন্তী হারাইল মোহোর কারণ।

৪৫. রাম হোন্তে লক্ষ্মণকে করিনু বিমন

৪৬. যেহেন রাধে-হরি কিবা হর গৌরী কিবা নলদময়ন্তী

৪৭. কিবা গঙ্গা সঙ্গে কেলি কৈল ত্রিলোচন

রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতিরও দেদার প্রয়োগ দেখি :

১. নয়ান কটাক্ষ হেরি পরচিত্ত আনে হরি
তারাক হরিল যেন চান্দ।

২. বিক্রমে কেশরী তুহ্মি জ্বলন্ত হুতাশ

৩. মেঘে যেন বরিখএ ঘনজল কণা
তোহ্মার দানের জান তেহেন তুলনা।

৪. শৃগালের ভএ কথা সিংহের বিমুখ

৫. কূপমাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন
৬. তৃণরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ
৭. ক্ষুদ্র পশু ধরে যেন কেশরী প্রচণ্ড
৮. তোর মুখ বলি সখী চান্দের তুলনা
৯. কিন্তু কেহ চান্দ ধরে মৃগাঙ্ক লাঞ্ছনা
১০. উচ্চ সঙ্গে নীচ যদি প্রেম আশা করে
সূর প্রেমে কমল জলেত যেন মরে।
১১. যেন কপি লম্ফ দিল ধরিবারে ভাণু
আপনে পড়িয়া তার ভাঙ্গি গেল জানু।
১২. রাতুল অধরে রাজা করত মধুপান।
১৩. শ্যাম অঙ্গে গৌর দেহ মেঘেত বিজলি।
১৪. শোণিতের স্রোত বহে মাংস হৈল পঙ্ক
১৫. শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষএ ধার
১৬. বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত
১৭. যেহেন গোময় কীট গোময়কে বলে মিঠ
ভ্রমর কুসুম গন্ধে মোহে।
১৮. চৈতন্য পাইয়া ধাএ আউদল কেশে চাএ
সভামধ্যে আইল দেবী উন্নত বেশ।
(তুল : চিত্রাঙ্গদা মেঘনাদবধকাব্য)
১৯. সুমেরু ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত।
২০. হেমন্ত কালেত যেন না শোভে নিদাঘ।
ফাগুনে হেমন্ত হৈলে ঠেকএ বিপাক।
২১. সমুদ্রেত ঢেউ যেন না থাকএ চিন
২২. আকাশেত ধূম্র যেন হই যাএ লীন
২৩. প্রদীপে পতঙ্গ যেন বিরহে দহএ
২৪. চান্দের উদএ যেন সমুদ্র উথল
২৫. দর্পণের মল যেন ঘুচএ অঞ্জনে।
২৬. পদ্মাকূল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ
(অবিকল এই চরণটি জায়েনুদ্দীনের রসুলবিজয়েও মেলে)
২৭. কলীন্দ্রের বাণ চলে বিজলি ছটক
২৮. জলরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ
২৯. জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
৩০. সমুদ্রের জল যেন পর্বতেত লাগে
৩১. কোপে কলি মূর্তিমন্ত গজ।
৩২. যেহেন সাচন পক্ষী নর হস্তে মাংস দেখি
না চিন্তএ দিতে চাহে ঝম্প।
৩৩. কণ্টকে কণ্টক খসে পাপে ধর্ম না প্রকাশে
কপটে সে ধরা যাএ চোর।

৩৪. ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপ অগ্নি নিবারিল
চঞ্চলাস্ত্র কলিএ এড়িল।

৩৫. শিশু মৃগ ধাএ যেন সিংহের তরাসে

৩৬. কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন।

৩৭. ভাঙ্গিল কদলীবন যেন মত্তকরী।

এছাড়াও রূপ, সম্ভোগ ও যুদ্ধ-বর্ণনায় কবির দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করে। রূপ বর্ণনার কিছু নমুনা :

রাজা মহীরাম বিদ্যাধরের সূতার রূপ। এখানে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ আছে :

তান সুতা ইন্দুমতী কামরতি সমা
বিচিত্র সৃজিল হেন কনক প্রতিমা।
মুখ দেখি লাজ পাই রহিলেক শশী
কেশ দেখি চামরী বনেত গেল পশি।
লুক দিল খঞ্জন চঞ্চল দেখি আঁখি
কাঞ্চন অগ্নিত দহে তনু কান্তি দেখি।
বান্ধুলি নিন্দিত কৈল রাতুল অধর
দশন দেখিয়া মুক্তা মজিল সাগর।
অমৃত সদৃশ বাণী মৃদু মৃদু হাসে
মুচুকিত হাসি যেন বিজুলি প্রকাশে।
ভূরু ধনু কটাক্ষ বিশিখ মারে শরি
এই বাণে তেজে ধ্যান দেব ত্রিপুরারি।
শ্রবণ দেখিয়া বনে রহিল গৃধিনী
নাসা দেখি ঝরি গেল তিল কুসুম্বিনী।
কুচ কুম্ভ দেখি পদ্ম মজি গেল জলে
বড় ভাগ্যে হেন নিধি মিলে করতলে।
ক্ষীণ মাঝ যুগউরু ত্রিলোক মোহনী
কিবা রূপ বাখানিব সহজে পদ্মিনী।

কেবল মুখের লাবণ্য বর্ণিত হয়েছে অঢেল উপমায় অন্যত্র। পুরাণের প্রয়োগ অংশে ১৫ সংখ্যক উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্যের কবিকল্পিত মৌলিক বর্ণনাও রয়েছে। এখানে সুন্দরীর প্রসাধন ও সজ্জার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

অর্ধচন্দ্র ললাট সিন্দূর যেন সুর
অপরূপ বিশেষক যেন রাহু কর।
বেঢ়িয়া কানড় খোপা কুন্তল রচিত
মেঘে ঝাপি তারাগণ রহে বিপরীত।
খোপা বেঢ়ি মুক্তাদাম ঝিলি-মিলি করে

তমসী রজনী মেহু বিজুলি সঞ্চারে।
অপরূপ ভূরু ফণী ধরিল গরুড়
গজমুক্তা শোভে নাসা খগচঞ্চু তুল।
মুখ দীপ নয়ন খঞ্জন ভুরু ফণী
দেখি শুভদিন হেন মানে নৃপমণি।
বান্ধুলি অধর পরে মুকুতা দশন
তাত অপরূপ ঝরে অমিয়া বচন।
অনেক তিলেক গণ্ডে শোভে পয়বলি
চন্দ্রে ভেল কলঙ্ক কমলে শোভে অলি।
অপরূপ কম্বুকণ্ঠে শোভে মুক্তা হার
সুরুচির অলিবীর রহে গঙ্গা ধার।
সুবলিত বাহুলতা রক্ত করতল
অপরূপ মৃণালেত এ থল কমল।
অপরূপ থল-কমলেত পঞ্চবাণ
কাম পঞ্চবাণে জিনে অঙ্গুলির ঠাম।
অত অপরূপ বড় চান্দ পাঁতি পাঁতি।
সলজ্জিত প্রবাল দেখিয়া নখ জুতি।
হেমলতা সমতল কুচগিরি ধরে
অপরূপ ক্ষীণ মাঝা ভারে ভাঙ্গি পড়ে।
নাসা বলি সর্বজন মনে ভাএ ভএ
নাভি সরোবর বলি অনঙ্গ এড়ি ধাএ।
ধাইতে না পারে ভএ গিরি মাঝে গড়ে
বিষ ভএ খগপতি নাগ নাহি ধরে।
নিঃসর নিশুম্ভ বাঁম সিংহাসন চারু
বিপরীত সে রাম কদলী উরু চারু।
অঙ্গুলি চরণ ফণী চম্পক কমল
হেম-কান্তি দেহ মৃগ মদ পরিমল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করেত কঙ্কন
পরিধানে পাটাম্বর নানা আভরণ।
নূপুর চরণে বাজে সে গজ-গামিনী
মৃদু মধু ভাষে কন্যা ছটকে দামিনী।
ভুরু ধনু অঞ্জনে রঞ্জিত চাপগণ
হানএ কটাক্ষ বাণ হাসি পুন পুন।...
রূপ দেখি কামনা দগধে যাক
মরণেই তার মাংস না খাইব কাক।

সম্ভোগ-চিত্র :

প্রথম শৃঙ্গার বালা লাজ ভএ রঙ্গে
কাঁপি কাঁপি উঠে বালা নম্র করি শির

কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর।...
রাতুল অধরে রাজা করে মধু পান
বিষ গেল আনদিশ রহিল পরাণ।
নয়নে বয়নে চুম্বে চাপিয়া অধরে
ইন্দু আর বিন্দু মধু পিবএ ভ্রমরে।
গাঢ় আলিঙ্গন হৃদে হৃদে জড়ি কেলি
শ্যাম অঙ্গে গৌরদেহ মেঘেত বিজলি।
ঘন পীন কুচকুম্ভ জড়ি দিল হাত
পুলকিত দেহ চমকিত নরনাথ।
লোহিত বরণ কুচ সঘন মথনে
জয়পত্র রেখাদিল নখের লিখনে।
উরু উরু জড়ি করে ধরি কণ্ঠদেশ
সঘন তাড়ন তরী যখন বিশেষ।
কাম সিন্ধু মাঝে পড়ি না রহিল জ্ঞান
উল্লাসি কুসুম্ব ধনু হাসে পঞ্চবাণ।
নবীন শৃঙ্গারে বালা কম্পে থর থর
বিষম সংগ্রাম দেখি হাসে পঞ্চশর।

এমনি বর্ণনা গ্রন্থের অন্যত্রও মেলে। চন্দ্ররেখা সূর্যবীর্যের বিহার স্মর্তব্য।

যুদ্ধ-বর্ণনও সুন্দর। কবি নিজে উজির-সেনানী বংশীয় ছিলেন। কাজেই যুদ্ধবিগ্রহ তাঁর কাছে কাল্পনিক ঘটনা নয়। সেজন্যেই সম্ভবত তাঁর হাতে যুদ্ধক্ষেত্রের সজীব চিত্র পাচ্ছি :

যুদ্ধযাত্রা :

বত্তিশবিধান দুন্দুভি নিশান
বীর-জয়-ঢোল বাজে
রথ সারি সারি চলে আগুসারি
উপরে কনক ধ্বজ
অলেখা তুরঙ্গ চলে মনোরঙ্গ
কোটি কোটি চলে গজ
চলে পায়দল ভূমি টলমল
ঘনসিংহনাদ ছাড়ে
ঢাকি ব্যোমপুর আচ্ছাদিল সূর
পদধূলি অন্ধকার
গজের গর্জন তুরঙ্গ হর্ষন
রথ নির্ঘোষ সার।

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ :

মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল সমর
বাসুকী বাসবে যেন যুদ্ধ ঘোরতর।
রথে রথে ঠেলাঠেলি রথ ভাঙ্গি পড়ে

গজে গজে বিমর্দন অস্ত্র মারিবারে।
নারাচ নালিকা গদা ভূষণ্ডি উস্বর
শূল শেল মুষল মুদগর কুন্তশর।
আশি পাশ অঙ্কুশ ত্রিকচ ভিন্দিপাল
সূচিমুখ শিলামুখ চক্র করবাল।
ঝাড়ে ঝাড়ে বিশিষ্ট গগন ভরি পড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী যেন গগনেত উড়ে।
মহা মহা রথী পড়ে পৃথিবীর সার
মহামত্ত গজ পড়ে পর্বত আকার।
অশ্ববার সৈন্য পড়ে শুনি ধরমরি
ভাঙ্গিল কদলীবন যেন মত্তকরী।
অলেখা পদাতি পড়ে শুনি হাহাকার
গগনে কবন্ধ নাচে, দেখি চমৎকার।
শোণিতের স্রোত বহে মাংসে হৈল পঙ্ক
শুনিতে হরিষ তনু শিবা গৃধ কঙ্ক।

এমনি যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটিই রয়েছে। এখানে বাণ-যুদ্ধের কিছু অংশ তুলে ধরছি। যুদ্ধের রূপকে সত্য-কলির পাপ-পুণ্যের ও ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই এখানে বর্ণিত।

সুযোগ্য সারথি বিন্ধি দিব্যবাণ এড়ে সন্ধি
সত্যধর্ম 'পরে বজ্রঘাত।
সহিয়া সে ঘাও পুনি কোপে সত্য গুণমণি
সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা বাণ।
চৈতন্য পাইল যবে ধনু ধরি উঠে তবে
ক্ষুরবাণে কাটিল কোদণ্ড ...
কোপে এড়ে ভল্লবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
দিব্যবাণে বিন্ধিল সারথি.....
সারথি চৈতন্য পাইল পুনি বাহু বাঢ়াই আইল
কোপে সান্ধি এড়ে ভিন্দিবাণ।
সত্যকেতু সৈন্য দহে দেবগণ কম্পে ভএ
প্রজ্বলিত প্রচণ্ড হুতাশ
চিন্তে সত্য ধনুর্ধর সান্ধিল আবরি শর
মেঘচয় এড়িল আকাশ।
আবর্ত সমর্থ দোন প্রখর আদি মেঘ সম
মুষলধারাএ ক্ষেপে জল
ঘন ঘন বজ্রঘাত কলি সৈন্য হৈল পাত
নিবাইল দারুণ আনল।
নিজ মনে আবকলি বাউ বাণ এড়িল কলি

মেঘচয় কৈল খান খান
সত্যকেতু এড়ে গিরি কলি-ইন্দ্র অস্ত্র জড়ি
পর্বত কাটিল তুরমান।
কলি এড়ে তম-শর অন্ধকার দিগন্তর
কার কেহ নাহি পরিচএ
সত্যকেতু এড়ে শর অন্ধকার হৈল দূর
কলিএ এড়িল নাগ-বাণ
ফণীগণে ফণাধরি রহে সত্যকেতু বেড়ি
সত্যকেতু বিষে কম্পমান।
গুরু অস্ত্র সান্ধি এড়ে নাগ সৈন্য কাটি পাড়ে
কলিএ এড়িল উল্কামুখ।
তবে সত্য ধনুর্ধরে ক্ষেমাবাণ সান্ধি এড়ে
ক্ষেমা হোন্তে মেঘ উপজিল
ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপে অগ্নি নিবারিল
চঞ্চলাস্ত্র কলিএ এড়িল।
পুণ্য সূর্য এড়ে সত্য দীপ্ত কৈল স্বর্গ মর্ত্য
পাপ হোন্তে পাইল উদ্ধার
এড়িল কৃপণে বাণ নাগ হৈল বিদ্যমান....
সত্যদাতা অস্ত্র এড়ে হর্যক্ষ আইল পরে
গরুড়ে এড়িল ফণী কৃপণের বুদ্ধিহানি
দাতার সমুখে পাইল লাজ।

এভাবে ইন্দ্রবাণ, ভৈরবশর, সপ্তশাল বাণ, সূচিমুখ বাণ, শার্দূলবাণ প্রভৃতি বাণ পরস্পরের প্রতি 'মন্ত্রে তন্ত্রে হুঙ্কারি এড়িলা'।

অন্যান্য অস্ত্রের নাম :

অর্ধচন্দ্র ক্ষুরবল্ল, নারাচ, নালিকা
শক্তি, শূল, মুষল, মুদগর কুম্ভপাল
ভূষণ্ডি, তুম্বুর চন্দ্র ভ্রমএ আকাশ।

রণবাদ্য : ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা নানা বাদ্য ধ্বনি।

খাদ্যবস্তু : মদ্য-মাংস দধি-দুগ্ধ নানা উপহার
ঘৃত মধু শর্করা বিবিধ ফলহার।
আম্র কষ্টকারী (?) মধু ছোলঙ্গ শ্রীফল
বদরিকা দাড়িম্ব যে গুয়া নারিকেল।
মত্তমান কদলিকা লাউ মিষ্ট নাড়ু
যথ বৃক্ষ ফল আদি দেখিতে সুচারু।...

ঘৃত-মাংস এক করি আনন্দে গরাসে...
দধি দুগ্ধ মধু-মিষ্ট করিয়া ভক্ষণ...
মত্তমান কদলিকা আম্র মিষ্ট-পাই
ভোগী বোলে স্বর্গভোগ মিলাইল গোঁসাই।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি পরকার
ভোগ করি করে ভোগী নানা ফলাহার।
ভোগ করি কর্পূর তাম্বুল দিল মুখ
ভোগী বোলে এহাত সংসারে নাহি সুখ।

. ফুলের মধ্যে শিরীষ, চম্পা, নাগেশ্বর, পদ্ম, বান্ধুলি, জাতী, যুথী, মালতী প্রভৃতির নাম পাই।
রাজ-রাজড়ার পোশাক : কিরীট কুণ্ডল হার বিচিত্র বসন।
প্রসাধন ও প্রসাধনসামগ্রী : সেকালের সুন্দরীরা কানড় ছাঁদের কবরী বাঁধত, কবরীতে মুক্তা, ফুল জাদ প্রভৃতি জড়িয়ে দিত। চোখে দিত অঞ্জন, কাজল কিংবা সুর্মা। কপালে সিন্দূর আর কপালে কপোলে চন্দন তিলক। এছাড়া মৃগমদ কুঙ্কুম ছিল প্রসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ।

কর্ম ও অদৃষ্টবাদে আস্থাও ছিল মন জুড়ে :

ক. দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন
খ. মোর খণ্ড ব্রতের কারণ
তাত পড়ে এথ অথান্তর।

রাজসভায় : বেদ পড়ে পুরোহিত ভাটে স্তুতি গাহে।

যুদ্ধের প্রাক্কালে : বৈতালিক স্তুতি পাঠ আগে করি
মিত্রকণ্ঠ বেদ পড়ে
লইয়া ধূপ দীপ হইয়া সমীপ
আগুদিল সত্যবতী।

সেকালেও কন্যা বাপ মাও প্রণামিয়া ইন্দুমতী বালি
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল স্বামী কাছে চলি
এবং রথে চড়ি নিজদেশে চলিলা তুরিত
শ্বশুর বাড়িতেও 'শ্বশুর-শাশুড়ী দুই করিলা প্রণাম'।

সে-যুগে সিংহাসনও ছিল প্রশস্ত তক্তপোশের মতো। তাই 'শুতিলেক রত্নসিংহাসনের উপর'। পাগল কিংবা যোগী-যোগিনী হয়ে নারী বা পুরুষ 'আউদল কেশ ভ্রমে নগরে নগর'।
একটি চিত্র শোকাকুলা : মুকুলিত কেশভার ছিণ্ডিল গলার হার
করঘাতে হৃদএ হৈল সূর

সিন্দূর লুকিত হৈল   কেশে মুখ আচ্ছাদিল
রাহু গ্রাসিলেক চন্দ্রসূর।

রূপবতীর রেখাচিত্র :   তোর লাস রভসের কেবা দিব সীমা
বিধিএ সৃজিল তোকে রূপের প্রতিমা।
দেখি রবি-রথ রহে মুনি-মন ভোলে
লীলাএ মোহিব সত্য মৃদু মধু বোলে।

খ. নীতিশাস্ত্র বার্তা

মুজাম্মিল বিরচিত

মুজাম্মিল সম্ভবত ষোলো শতকের কবি। তাঁর নীতিশাস্ত্রবার্তা বা 'সায়াৎনামা' মূলত লৌকিক ও স্থানিক সংস্কারভিত্তিক। এজন্যেই এ গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক।

মানুষ স্বভাবতই পৌত্তলিক। সে শক্তির পূজারী। দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা আর দানব থেকে ভয় তার মজ্জাগত। তাই অরি ও মিত্রশক্তিকে সে পূজা না করে পারে নি। আপাতদৃষ্টিতে নিরবয়ব মনে হলেও বিশ্বাস-সংস্কারই তার জীবনযাত্রার প্রমূর্ত অবলম্বন। দুর্বলচিত্তের এই বিশ্বাসপ্রবণতা নিহিত রয়েছে জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তাকামী আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় মানুষের জৈববৃত্তি-প্রবৃত্তির গভীরে। কেননা ভোগ ও আরামের অভাববোধই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগায়। অজ্ঞ অসহায় মানুষ যা চায় তা পায় না, পাবার পথে আশাপূর্তির পথে হাজারো বাধা। অথচ হতবাঞ্ছার বেদনাও তার অসহ্য। তাই বাঞ্ছাসিদ্ধির জন্যে সে বহিঃশক্তির সহায়তা বা আনুকূল্যকামী। বাঞ্ছাসিদ্ধির এ কামনা থেকেই জাদু ও টোটেম বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রবৃত্তিজাত ও প্রায় অবচেতন প্রবণতাপ্রসূত জৈবধর্মের প্রয়োজনামুখ আচার-আচরণ তথা অভিব্যক্তিই Paganism. যৌক্তিক চেতনার উন্মেষ-পূর্ব অবস্থার জীবন তাই অন্ধবিশ্বাস সংস্কারনির্ভর।

কিন্তু দুর্বল মানুষের এই বিশ্বাস-সংস্কার নির্ভরতা আজো ঘোচে নি; ঘুচবেও না কোনোদিন, কেননা মানুষের আত্মরতি ও ভোগেচ্ছা এতই প্রবল যে সে তার প্রবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির প্রভাবমুক্ত হবার মতো যুক্তির নির্দেশ গ্রহণে অসমর্থ। তাই সে তর্ক করে, যুক্তি মানে, কিন্তু বৃত্তি-প্রবৃত্তির অনুকূল না হলে কিছুই জীবনে গ্রহণ-বরণ করে না।

অতএব বিশ্বাস-সংস্কারই তার জীবনের অবলম্বন, তার পাথেয়; তার মানসজীবনের নিয়ন্তা। এই বিশ্বাস-সংস্কারই যখন মানবমনীষার প্রয়োগে, যুক্তির নিরিখে সকারণ ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়, তখনি আচার-বিশ্বাস পরিচিত হয় ধর্মশাস্ত্র নামে। কাজেই Paganism ও Religion-এর defferentia হচ্ছে Reasoning যার উৎস Rationalism. যেহেতু বিনাশর্তে বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব, সেহেতু যুক্তির বাহ্য প্রলেপে জাদু ও টোটেম বিশ্বাসপ্রসূত আচার-আচরণই দেশকালের পটে জীবনের প্রয়োজনানুগ রূপান্তর লাভ করে মাত্র এবং তা-ই অবিচ্ছেদ্য সংস্কাররূপে মানুষের মর্মমূল থেকে উৎসারিত হয়।

কালিক ব্যবধানে অনেক ক্ষেত্রে আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন আর জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। এগিয়ে যাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তনে তথা সমাজবিবর্তনে আদিম সংস্কারও পরিবর্তিত পরিবেশে নানা তাত্ত্বিক চিন্তার অনুপ্রবেশে কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। ধর্ম এবং জীবনের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আজও পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষণীয়।

আমাদের দেশের ব্রতকথায়, রূপকথায়, উপকথায়, প্রবাদে, প্রবচনে, ডাক ও খনার আপ্তবাক্যে এমনি বিশ্বাস-সংস্কারের আবেষ্টনীতে সীমিত ভীরু-জীবনের সজীব চিত্র মেলে। মানুষের মানস ও সমাজজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস নির্মাণে তাই Folk lore-এর গুরুত্ব অপরিমেয়।

বলেছি, মানুষের আদিম বিশ্বাস-সংস্কার মরে নি; কেবল এগিয়ে আসা মানবমনীষার সঙ্গে সংগতি রেখে রূপান্তরিত বিবর্তিত সূক্ষ্মায়িত ও তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত হয়েছে মাত্র। তাই বিজ্ঞান-দর্শনের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জীবনের অকপট ও নিবিড় অভিব্যক্তিতে তার প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তাই আমরা শাস্ত্রকথায় নীতিবাক্যে লোকাচারে ও প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং উচ্চ-তুচ্ছ সব ব্যাপারেই এর প্রভাব লক্ষ্য করি। শিক্ষা-সংস্কৃতি কিংবা বিজ্ঞান-দর্শন জানা লোকও ব্যক্তিজীবনে গরজের ও বিপদের দুর্বল মুহূর্তে এ সংস্কারের প্রভাবেই চালিত হয়, হাঁচি-কাশি ও টিকটিকি মানুষের জীবন ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আমরা শাস্ত্রে-সমাজে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এ বিশ্বাস-সংস্কারের গুরুত্ব অনুভব করি।

আলাউলের 'তোহফা'য়, মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদে', সেরবাজের 'মালিকার সওয়াল' বা 'ফখরনামা'য়, শেখ সাদীর 'গদা মালিকার পুথি'তে, এমনকি যোগশাস্ত্রীয় আলোচনায়ও এক বিশ্বাস-সংস্কারের আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে দেখতে পাই। একালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' এমনি জাদু ও টোটেম স্তরের জীবনবোধের আশ্চর্য সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বৌদ্ধ মন্ত্রযান এবং কালচক্রযানের উদ্ভবের মূলেও আদি জাদু ও টোটেম-বিশ্বাসই রয়েছে। বলা চলে এ বিশ্বাসই ঐ যুগে ধর্মমতের রূপ নিয়েছিল। দারু-টোনা, তুক-তাক, তাবিজ-কবজ, বাণ-উচাটন, গ্রহ-নক্ষত্রের দৃষ্টি খণ্ডন প্রভৃতি ঐ আদি বিশ্বাসেরই উন্নততর প্রয়োগপ্রণালী। এ সবের দ্বারা অপদেবতার ও জীবনে কুদৃষ্টি, গ্রহের প্রভাবজাত রোগ ও দুর্ভাগ্য এবং আরো নানা রোগের চিকিৎসা হত।

মুজাম্মিল বর্ণিত বিষয়গুলোর অনুরূপ বিষয়ের সন্ধান অন্যত্রও মেলে। যেমন 'তোহফা'য় নিদ্রা বসন, চাঁদ প্রভৃতির আলোচনা পাই। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. না লেপিও ঘর বেড়া গো-লাদ মিশ্রিত
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত।

খ. পতিপত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ।

গ. জ্ঞানচিত্তে নিদ্রা যাও মনে ভাবি সার
যে কর সে কর—মিত্র বাড়ে এইবার।

'সত্যকলি বিবাদসম্বাদে' মুহম্মদ খান 'গার্হস্থ্যবিধি' আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রবার্তার বিষয়গুলোই মুখ্যত বর্ণনা করেছেন। গৃহনির্মাণ, স্নান, রোগ, বসন, দেও-তাড়ান ও বিধির কর্ম— আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

আবদুল গনির ফালনামায় (ভাগ্য ও রাশি গণনার শাস্ত্র) আছে :

বুধবার রাত্রে যদি অঙ্গে তাপ হএ
আন সঙ্গে সেই দক্ষিণে গিয়াছএ।
গোছল করিছে কিবা জলের কিনারে
নতু বসন পরিলেক নহে অজু করে।
নতু সেই বস্ত্র পবনে উড়াইছে
'রক্তখানি' নামে দেও নজর করিছে।...
কলিজা দহএ অতি পেট ফুলে আর
বহু কাঁসিবেক অঙ্গে দরদ অপার।...

প্রতিকার—

বাঘের আরূপ এক অজার আরূপ
মনুষ্য আরূপ এক মরার আরূপ।
এই চারি প্রদীপ আর লাল সপ্ত ফুল
হলদীর 'বানা' এক ঘটিকায় চাউল।
এসব একত্র করি উত্তরে ফেলিব
পঞ্চদিনে মাত্র রুদ্র দিনে ভাল হৈব।

সেরবাজ চৌধুরীর 'ফকরনামা' বা 'মালিকার সওয়ালে' পাই;

ডান আঁাখি পুতলি যার কাঁপে একবার
নিশ্চয় জানিও সর্পে ডংসিব তাহার।
দক্ষিণের পিষ্ঠ পাশে যাহার নাচএ
রোগ ত্যাগি দুঃখ অতি আসিয়া মিলএ।
বাম পিষ্ঠ কাঁপে যদি তার নারী স্থানে
কন্যাপুত্র তার জন্মে তে কারণে।

'যোগ কলন্দর' গ্রন্থেও জন্ম-মৃত্যুর লক্ষণ এবং দিনক্ষণের দোষগুণ বর্ণিত রয়েছে।

মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তায় গৃহনির্মাণ, খঞ্জন বাখান, স্নান বাখান, নববস্ত্র, নিদ্রা, স্বপ্নবাখান, হাজামত বাখান, নহস, চাঁদ, নারীপদ্ম (রজঃস্বলা), ভূমিকম্প, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। কবি এসব হাদিস 'দেখিয়া' আরবি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন:

আরবী ভাষে লোকেঁ না বুঝে কারণ

দেশীভাষে কৈলুঁ তবে পয়ার রচন।
যে বলে বলৌক লোকেঁ করিলুঁ লিখন।
নিজ দেশ 'বুলি' ভানিলুঁ পাঞ্চালী
লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে। (বাংলায়)

এখানে বিষয়বস্তুর আভাস দানের জন্য কিছু উদ্ধৃত হল :

গৃহনির্মাণ : ক. শ্রাবণ মাসেত যদি কেহো বান্ধে ঘর
সেই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর।
মাধবী মাসেত নব মন্দির বান্ধিব
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী সব তাহার বাড়িব।

খ. আদিত্য বারে যদি সে গৃহ নির্মএ
অনলে দহিব কিবা ঝড়েত ভাঙ্গএ।
সোমবারে গৃহ যদি বান্ধে কোন নর
সূত না জন্মিব সুতা, জন্মিব সে ঘর।

খঞ্জন বাখান : পশ্চিম দিকেত যদি দেখএ খঞ্জন
সেই জনে সেই ফলে পাইবেক ধন।
পূর্ব দিকে কেহো যদি সে পক্ষী দেখএ
রহস্য কৌতুকে সেই বৎসর গোঞাএ।
দক্ষিণ দিকেত যদি দেখএ খঞ্জন
রোগ-শোক বাড়ে যেন দৈর নিযোজন।

স্নান বাখান : যুক্ত হএ সোমবারে স্নান করিবারে
আয়ু লাভ হইবেক নিশ্চএ তাহারে।
মঙ্গলে যদি কেহো অঙ্গ পাখালএ
সেই ফলে অল্প দিনে মরিব নিশ্চএ।

নববস্ত্র : রবিবারে কেহো যদি ফাড়এ বসন
মনোদুঃখ কভু তাব না যাএ খণ্ডন।

নিদ্রা : ক. মধ্যাহ্ন দিনে যদি কেহো নিদ্রা যাএ
ধন ধান্য সেজনের বাড়িব নিশ্চএ।

খ. যে প্রভাতে নিদ্রা যাএ 'চাস্ত' সমএ
ভিক্ষুক দরিদ্র সেই হইব নিশ্চএ।
অষ্ট দণ্ড বেলি যদি হইল উদএ
ফারসী ভাসে তারে 'চাস্ত' বোলএ।

স্বপ্নবাখান :

চন্দ্রের প্রথম আর দ্বিতীএ তৃতীএ
এই তিন দিনে স্বপ্ন যদি সে দেখএ
এই সব দিনের স্বপ্ন উলটা নিশ্চএ।

হাজামত :

সোম বুধ বৃহস্পতি আর জুমাবার
আর একদিন জান ভাল শনিবার।
করাইলে হাজামত এ পঞ্চ দিবসে
পুণ্য বাড়ে রোগ হরে দুঃখ সব নাশে।

নহস (অশুভ) :

যে সকল দিনে হএ নহস আকবর
সে দিনেতে কার্য কর্ম কভু নাহি কর।
প্রতি চান্দে দুই দিন নহস আকবর
একে একে কহি শুন তাহার খবর।
মহরমে চতুর্থেত আর একাদশে
সফরেত প্রথমেত বিংশতি দিবসে।...

চাঁদ :

মহরম চান্দ দেখি তৃণ নিরক্ষিব
সফরেত শশী দেখি দর্পণ হেরিব।
রবিউল আওয়াল চান্দে হেরে স্রোতজল
রবিউল আখের চান্দে হেরিব ছাগল।

নারীপদ্ম (রজঃস্বলা : প্রথম) :

বৈশাখ মাসেত যদি হএ ঋতুবতী
পতিপত্নী স্নেহপ্রীতি বাড়ে প্রতি নিতি।...
শ্রাবণেত পদ্ম যদি হএ প্রকাশিত
কথদিন নারী চিত্ত হৈব বিষাদিত।
ভাদ্রমাসে যদি বিকাশে নলিনী
অনুদিন অঙ্গে ব্যথা হএ সেই ধনি।
আশ্বিনেত হএ যদি স্বামী মরে আগে
কথদিন রহি থাকে বিরহের দুঃখে।

ভূমিকম্প :

বসুমতী কম্পে যদি রবিউল আখেরে
নানাবিধ ব্যাধি দুঃখ নিতি মনুষ্যের মিলে।.
ভূমিকম্প হএ যদি জমাদিউল আওয়ালে
দুর্ভিক্ষ হইব বহু সংসার ভিতরে।

চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ :

যদি রাহু ইন্দু গ্রাসে জমাদিউল আওয়ালে
ক্ষেতিতে ফলিব বহু শস্য সেই ফলে।

রবিউল আউলে সূর্য হইলে গ্রহণ
ধনী সব হইবেক ভিক্ষুক সমান।

জাদু টোটেম জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রভাবিত প্রাত্যহিক জীবনের অনুশাসনাবলির কিছু কিছু নমুনা দেয়া হল। 'গ্রহণ' রহস্য জানা সত্ত্বেও রাহু ও গ্রহণের পৌরাণিক তথা শাস্ত্রীয় তাৎপর্যে শিক্ষিত লোকেরও শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমে নি। কুম্ভমেলা ও স্নানযাত্রা তার প্রমাণ।

আসলে যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই দুর্বলতা এবং সেখানেই কল্পনার প্রশ্রয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মনুষ্যসমাজে বিজ্ঞান-বুদ্ধি তথা যুক্তিবাদের প্রসার হচ্ছে। তবু আজও যেখানে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ঘোর কাটে নি (ক্ষেত্রবিশেষে কাটলেও চিত্তদৌর্বল্য যুক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে) সেখানে পুরোনো কাল্পনিক বিশ্বাস-সংস্কারই মানবমনের উপর রাজত্ব করছে। আলোচ্য গ্রন্থেও দুর্বল মানুষের স্বাভাবিক অদৃষ্টবাদ নিয়তি-নির্ভরতা প্রাকৃতিক শক্তির সামনে অসহায়তা এবং জীবনে বিপন্মুক্তির উপায় সন্ধানে আকুলতার আভাস রয়েছে।

এসব বিশ্বাস-সংস্কারের জন্ম একদিনে হয় নি, একজনের দ্বারাও হয় নি। এগুলো বহুযুগের বহুলোকের ভূয়োদর্শন-জাত অভিজ্ঞতার ফল। এগুলো প্রাচীন বটে, কিন্তু সুপ্রমাণিত নয়। কেননা এসবের ভিত্তি হচ্ছে একান্তভাবেই কাকতালীয় যুক্তি ও তথ্য। তবু বাহ্যত না হোক, মানুষের মনোজগতে এসব ভূয়ো বুলিও ফলপ্রসূ হয়েছে, কল্যাণ এনেছে। কেননা এসব বিশ্বাস-সংস্কারপুষ্ট মন চিরকাল দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে ধৈর্য, লাঞ্ছনায় স্থৈর্য, বিপর্যয়ে বল, বেদনায় সহ্যশক্তি, ব্যর্থতায় অধ্যবসায় এবং নৈরাশ্যে আশার আলোক পেয়েছে এ-ধরনের বিশ্বাস থেকেই।

কাজেই যুগ-যুগান্তর ধরে এসব ছিল ব্যর্থ বঞ্চিত বিপর্যস্ত, দুর্বল, নিরুপায় ও অজ্ঞ মানুষের মনের অবলম্বন ও জীবনের নিয়ন্তা। তাই দুনিয়ার সর্বত্রই বিচিত্র বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব এত প্রবল। এদিক দিয়ে আমাদের তথা মানুষের পুরোনো সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলোর মূল্য কম নয়।

এসব সংস্কারে সত্যের, তথ্যের আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্পর্কও-যে নেই, তা নয়। যেমন আষাঢ় মাসে—

মনুষ্য থাকিতে যদি নিরমিল ঘর
সেই ঘরেত মশক হইব বহুল।

বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বর্ষাকালে এমনিতেই মশার উপদ্রব বাড়ে। তার উপর নতুন ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় মশা-যে আসর জমাবে, তা তো জানা কথাই।

আর একচা দৃষ্টান্ত :

রাত্রি অন্ন খাই দুই বিশ কাঞ্চিক দিব
খর্ব খর্ব কাঞ্চিক দিব হাঁটিব সত্বর।
[তুলনীয় : After Supper walk a mile]

মুজাম্মিল যদিও বলেছেন, আরবি হাদিস গ্রন্থই তিনি অনুবাদ করেছেন; তবু তিনিও

যে মুফতির আসনে বসে নিজেই বহু ফতোয়া হেঁকেছেন, তার প্রমাণ রচনার সর্বত্রই মিলবে। আসলে কবি বাঙলাদেশের মুসলমানের আচারিক জীবনশাস্ত্রই রচনা করেছেন।

গ. শরীয়তনামা
(১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ)
নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত

আঠারো শতকের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার (আনু : ১৭০০-৭৫ খ্রিস্টাব্দ) চারখানি গ্রন্থের প্রণেতা—ক. জঙ্গনামা, খ. মুসার সওয়াল, গ. হেদায়তুল ইসলাম ও ঘ. শরীয়তনামা। নামেই প্রকাশ যে, গ্রন্থগুলো শাস্ত্র ও তত্ত্ব সম্পৃক্ত। নসরুল্লাহ্‌র বংশপরিচয়ও মিলেছে : হামিদুদ্দীন-বোরহানউদ্দীন ইব্রাহিম-সুজাউদ্দিন-শেখরাজা ওর্ফে বাবু খান-কাজী ইসহাক-শরীফ মনসুর খোন্দকার-নসরুল্লাহ খোন্দকার। এঁরা যথাক্রমে উজির, লস্কর উজির, ঘোড়সওয়ার, যোদ্ধা, দরবেশ, শাস্ত্রী ও শিক্ষক (খোন্দকার) ছিলেন। কবির 'জঙ্গনামা' আজও সংগৃহীত হয় নি। শরীয়তনামায় রচনাকাল রয়েছে :

> পুস্তক আদায় সন লওত গুণিয়া
> চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।...
> চর্তুবিংশ অগ্রাণের জোহর সময়
> বিংশগ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয়।
> আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার
> সে দিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার।

অতএব, চন্দ্র-১, ঋতু-৬, সিন্ধু-৭, গগন-১ বা ৭ (মুসলিম মতে) ধরলে ১৬৭১ বা ১৬৭৭ শকাব্দ (এবং অঙ্কস্য বামাগতি ধরলে ১৭৬১ শকাব্দ) মেলে, এতে যথাক্রমে ১৭৪৯ বা ১৭৫৫ (অথবা ১৭৩৯) খ্রিস্টাব্দ হয়। অবশ্য অন্য নানা প্রমাণে ডক্টর আবদুল করিম নিরূপিত ১৭৪৯ বা ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দই রচনাকাল বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে (পাণ্ডুলিপি ৪র্থ খণ্ড ১৩৮১ সন)। গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৪ অগ্রহায়ণ, ২৯ রমজান রোববার। সে-বছর রোজা ২৯টিই হয়েছিল। ঈদ হয়েছিল সোমবারে।

শরীয়তনামায় কবি সমকালীন চট্টগ্রামের মুসলিমসমাজে ও শাস্ত্রীর আচারে যেসব হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-সংস্কার প্রবেশ করেছিল, সেসব বর্জনে প্রবর্তনা দেবার জন্যেই সেসবের নিন্দা করে ও অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তাই আমরা কবির সমকালে চালু ইসলাম-বহির্ভূত অনেক বিশ্বাস-সংস্কার আচার-পার্বণের সন্ধান পাচ্ছি। এগুলো নতুনভাবে গৃহীত হয় নি, দেশী দীক্ষিত মুসলিমের ঐতিহ্যসূত্রে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত সংস্কারই শাস্ত্রীর আবরণে মনে-মর্মে ঘরে-সংসারে রয়ে গিয়েছিল, তাই এগুলো সুপ্রাচীন বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। কবি হিন্দুয়ানি রীতি না বলে

প্রায়ই মঘদের রীতি বলেছেন। তার মুখ্য কারণ বোধহয় কবির নিবাস ছিল শঙ্খ (সাঙ্গু) নদের দক্ষিণতীরে। শঙ্খনদের দক্ষিণ থেকে টেকনাফ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম তখনো (১৭৫৬ সন অবধি) আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্ত ছিল। মঘ বা মগ (< মগধবাসী) অর্থে স্থানীয় ও আরাকানি বর্মী বৌদ্ধকে বোঝায়।

কন্যা বা বধূ প্রথম রজস্বলা হলে বাজনা বাজিয়ে এবং সহেলা ও নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করে উৎসব করা হত। প্রথম রজস্বলা হওয়াকে তথা সাবালেগা হওয়াকে 'পুষ্পদেখা' বলা হত। রজস্বলা নারীকে মুসলিমঘরেও অপবিত্র মনে করা হত।

রজস্বলা নারীকে ছুঁলে অন্যদের স্নান করতে হত। ঘরদোরও অপবিত্র মনে করা হত। হিন্দুদের মতো উপোস করিয়ে নাপিত দিয়ে নখ কাটিয়ে পরিধেয় বস্ত্র ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে পাঁচ বা সাতদিন পরে আবার শুদ্ধ করে নেয়া হত। হিন্দুদের মতো গোবরজলে ঘরও লেপন করা হত। এমনি প্রসূতি ও আঁতুড়ঘরও অপবিত্র বলে ধারণা ছিল তাদের এবং উপরোক্ত নিয়মে শুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল।

সেকালে মুসলিমঘরেও নারীপর্দা বিশেষ মানা হত না। মাথায় ধান-দূর্বা-ঘট-আমপাতাসমেত ডালা নিয়ে বউ-ঝিরা শিরনির জন্যে ভিক্ষা মেঙে গাঁয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরত।

শব যেখানে স্নাত হত, সেস্থান চল্লিশ দিন বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা, উপরে চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেয়া প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় আচারও ছিল। সদ্য মৃতের ঘর অপবিত্র বলে মনে করা হত এবং মৃতের পরিবার-পরিজন তিক্ত ব্যঞ্জনে (গিমা-নিম প্রভৃতি) অন্নগ্রহণ করত, উদ্দেশ্য যমের পুনরাগমনে বাধাদান। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে নাপিত ডেকে মৃতের পরিবারের পুরুষেরা খেউর (চুল দাড়ি কর্তন) করাত আর নারীরা কাটাত নখ শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে। কবরে খিলানস্বরূপ বাঁশ পাতার সময় বাঁশের হয় আগার অথবা গোড়ার গুঁড়িই দিতে হত; আগা-গোড়ার খণ্ডের যথেচ্ছ মিশ্রণ হলে মৃতের পরিবার উচ্ছন্নে যাবে এমন সংস্কার প্রবল ছিল। সদ্যোজাত শিশুর কল্যাণে 'নিমরিয়া পির'-এর উদ্দেশ্যে ঘরে গোপনে মানত-করা মোরগ জবেহ করে ফাতেহা দিত। এ পির ষষ্ঠীদেবতার মতোই শিশুর অরিদেবতা। শিশুর মৃত্যু না-ঘটাবার জন্যেই নিমরিয়া পিরের সেবা।

সেকালে মুসলমানরা আত্মকল্যাণে সূর্যমুখীকলার নৈবেদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণের দ্বারা 'পুষা' (পুষ্কর) দেবতার পূজা করাত। কারণ 'পূজা কৈলে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণ'। মুসলমানরা মহালক্ষ্মীর নামে হাঁস বলি দিয়ে রক্ত ধানের গোলায় ছিটিয়ে দিত। আবার 'কেহ কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস'— এটি সম্ভবত ডোমদের থেকে পাওয়া সংস্কার। 'কদলী-তণ্ডুল-আটা-কাঁচা দুধ আনি' অপক্ব শিরনি তৈরি করে ফাতেহা দিত এবং এ শিরনি ভক্ষণকালে গলায় 'তৃণ' বাঁধত। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ আচারও ছিল—

> অন্যজাতি হস্তে যত্নে পূজা করাওন্ত
> মঘিনীরে (বৌদ্ধ নারীকে) ছাগল দেওন্ত কিবা জানি
> জাগারাণ (?) দেওন্ত অন্য জাতি হস্তে আনি।

কোনো বালিকা যদি অন্যের বাড়িতে প্রথম রজস্বলা হত, তা হলে সেবাড়ি অপবিত্র হল বলে গণ্য হত এবং গোময় দিয়ে ঘর শুদ্ধ করতে হত। কবির মতে 'এহেন অকর্ম সব মগধ (মঘের— আরাকানি বৌদ্ধের) সবার।' আবার কেউ যখন 'পুষ্করণী খোদায় কিবা জাঙ্গাল দেওন্ত' তখনো 'বিষুর ভিতরে অকূপ করন্ত' এবং

'যুগল বছরে' (Even) পুকুর খনন করালে 'বহুদোষ' বলে মনে করা হত। বিষুব সংক্রান্তির দিনে মুসলমানরাও গরু-ছাগলের শিঙে গলায় ফুলের মালা দিত, কেউ-কেউ অঙ্গে হলুদ ও চন্দন মাখত। গোয়ালের উচ্ছিষ্ট খড় দিয়ে আগুন জ্বালাত এবং স্নান করে তিতা ভক্ষণ করত। এ সবই ছিল মঘদের (আরাকানি বৌদ্ধদের) শাস্ত্র।

বিয়ের সময়ে ঢোল বাজনার ব্যবস্থা অপরিহার্য ছিল। মেয়েরা বরকে গায়ে হলুদ দিয়ে পাঁচ পুকুরের পানি দিয়ে পাঁচ হাতে বর-স্নান করাত। বরের মাথায় 'মঘদের' মতো 'কুসুমের বন' নামে শোলার টুপি পরাত। আর ধূপ ধান্য পিঠা কলা শিলা পূর্ণ বরণডালা বর-কনের সামনে রাখা হত। নাপিত বরের চুল দাড়ি কামাত, কনেরও নখ কেটে দিত। নারীরা উৎসবে-পার্বণে নৃত্য বাদ্য সহযোগে উচ্চস্বরে সহেলা গাইত। বিয়ের সময়ে 'মারোয়া' বাঁধত, 'জুলুয়া' দিত, 'গেরোয়া' খেলত এবং 'পাশা' খেলারও ব্যবস্থা থাকত।

'মারোয়া' হচ্ছে সজ্জিত মঞ্চ। বরের (এবং কনেরও) বসবার স্থল। চারদিকে সাতনাল সুতো দিয়ে ঘিরে দেয়া হত। চ্যুতপত্র ও জলপূর্ণ মঙ্গল কলস এবং কদলীবৃক্ষও থাকত চারদিকে। চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান গাইত ছেলেমেয়েরা, এমনকি বয়স্করাও।

'গেরোয়া'— ফুলের স্তবক কিংবা বলের মতো গোলাকার পিণ্ড ছোড়াছুড়ি ও লোফালুফি খেলাকে বলে গেরোয়া খেলা। বর-কনেকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুদিক থেকে দুই দল এ খেলা খেলত। নারী-পুরুষ নিঃসংকোচে একত্রে খেলত এ খেলা এবং বর-কনেও যোগ দিত। বৈষ্ণব-পদেও এ খেলার উল্লেখ রয়েছে : ফুলের স্তবক (?) সঘনে লোফএ...ইত্যাদি।

'জলুয়া'— বর-কনের চারিচোখের মিলন (রুসুমত) অনুষ্ঠানই জলুয়া। এতে নারী-পুরুষনির্বিশেষে বর-কনে দেখার ছলে একত্রে মিলিত হত। এবং এ সময়ে হোলির মতো নারী-পুরুষের অবাধ রঙ্গ-রসিকতা চলত। রঙ পানি এবং কাদা ছোড়াছুড়ি এর অঙ্গ।

দীক্ষিত দেশী মুসলিমদের মধ্যে পূর্ব সংস্কারবশে, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল:

১. কেহ বলে তেলি কিবা হাজামের ঘরে
কিবা মৎস্য বেচে, কিবা যেবা মৎস্য মারে।
সে সবের ঘরে বোলে খাইতে না পারে।

২. কত কত মৌলানায় ফতোয়া দেওন্ত
ধীবরের ঘরে খাইতে নিষেধ করন্ত।

সেকালে গাঁয়ে গঞ্জেও 'শরাবী সিফতী ভাঙী বেনামাজী' দুর্লভ ছিল না। সেকালে মহররম মাসে শিয়াদের মতোই তাজিয়াদি নির্মাণ করে আশুরা উত্থাপন করা হত :

কত কত মৌলানায় আশুরার দিনে
হাসান হোসেন মূর্তি নির্মান্ত যতনে।
পড়শী সবারে আনি পূজা করাওন্ত
নাচি গাহি তিরি (স্ত্রী) সকলের শুনাওন্ত।

এখানে হাসান-হোসেনের প্রতীকী কবরপূজার কথা— কবর সালাম করার ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, স্ত্রীসঙ্গ বঞ্চিত সৈনিকরা সুযোগ পেলেই নারীধর্ষণ করত কিংবা অন্য অবৈধ উপায়ে রতিচর্চা করত। তাদের স্বপক্ষে যুক্তি এই :

আমরা সকল নিতি দেশে দেশে ফিরি
নিজ গৃহে নারী ছাড়ি হই দেশান্তরী।
আপনার নারী রাখিবারে শক্তি নাই
তেকারণে রতি ভুঞ্জি যার নারী পাই।

সেকালে চাষিরা **হাল-পালন** ব্রত উদ্‌যাপন করত। দেশী সংস্কারবশে তারা বিশ্বাস করত যে, আষাঢ়ের প্রথম দিনে সৃষ্টিসম্ভবা বসুমতী রজস্বলা হয়। এজন্যে আষাঢ়ের প্রথম সাতদিন জমিতে 'হল' কর্ষণ করতে নেই অর্থাৎ বসুমতীকে রজস্বলা নারীর মতোই মনে করা হত। চাষিরা জাদুপ্রতীক **ডিম** কিংবা **জামগাছের ডাল** জমির কেন্দ্রস্থলে পুঁতে প্রথম চাষ শুরু করত। হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কারবশে মুসলমানরা শব-ই-বরাতের সন্ধ্যায় পূর্বপুরুষের নামে গোস্ত-রুটি-ভাত ফাতেহা করাত— আজও করায়। একেক নামে একেক জোড়া রুটি মৃৎপাত্রে রাখত কিংবা একেক 'জড়া' (গ্রাস) ভাত আলাদা কলাপাতায় রেখে উৎসর্গ করা হত :

নামে নামে শতে শতে ফাতেহা দেওন্ত—
পূজা যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাৎ।

দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মুসলমানের স্ত্রী-কন্যারা স্ব স্ব বৃত্তি-অনুসারে কাঠ কাটত, মাছ ধরত এবং বাজারে বিক্রয় করত।

তামাকু সেবনকালে মঘ-মুসলিম জাতিভেদ মানত না, তারা একই হুক্কায় বা টেমিতে ধূমপান করত। কবির এতে অবশ্য ঘোর আপত্তি। অন্তত—'মসজিদে হুক্কাবাজি কভু না করিও।'

বিষুব সংক্রান্তির দিনে কিংবা বিবাহোৎসবে মুসলিম নারী-পুরুষ এ-যুগের মতো পরনারী-পরপুরুষের সঙ্গে নিঃসংকোচে মেলামেশা করত, এমনকি ক্রীড়ায়ও যোগ দিত। এটিও নিশ্চিতই একালের য়ুরোপীয় প্রভাবের মতো সেকালের মঘ-প্রভাবজাত। প্রাচীন মদনোৎসব বা হোলিও স্মর্তব্য :

আপনার তিরি (স্ত্রী) কন্যা সভাত পাঠাওন্ত
ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে খেলিতে দেওন্ত।
বিষুর দিবসে কিবা বিবাহের কালে
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনন্দ কুতূহলে।
সিফত ভক্ষন্ত কিবা হরিষ অন্তর
নারী বা পুরুষ সবই হই একত্তর।

সিফত খাইয়া অতি যেন মত্তকরী।
উন্মত্ত হএ কিবা পুরুষ কি নারী।
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মগধ (মঘ) ধরণ।
হাসন্ত গাহন্ত নটী-নাটকের গণ।
পুরুষ নারীর, নারী পুরুষের সঙ্গে
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙ্গে।
একঢোল বাজাওন্ত সিফত ভক্ষন্ত
আর পুনি তিরিগণে সহেলা গাহন্ত।
বেনামাজী শরাবী সিফতী মত্ত ভাঙী
এ সবের ঘরে না খাইবা কিবা ঢঙ্গী।

মুসলিমঘরে হিন্দু-পুরোহিতের প্রভাবও ছিল :

যে কিছু কহএ সে গন্ধর্ব পুরোহিত
মূরখ সকলে মানি লএ এক চিত।
গন্ধর্ব সকলে জল হিন্দুনি পিওন্ত।

এমন সংস্কার ছিল যে আউশ ধান কিংবা চাউল (তথা রুটি কিংবা ভাত)—

'ফাতেহাতে না লাগএ না পারে দিবার।'

কবি একে কুসংস্কার বলেই জানেন, তাঁর মতে—

যেই খাইতে পারে সে ফাতেহা দিতে পারে
আউশ কিবা সাইল তাত কি বিচারে।

দেশী দীক্ষিত মুসলমানরা এসব আচার-সংস্কার সাতশ বছর ধরে মেনেছে। বিদ্বানেরা একেই 'লৌকিক বা স্থানিক ইসলাম' নামে অভিহিত করেন। গত শতকের ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের ফলেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এসব বিশ্বাস ও আচার-সংস্কার মুসলমানরা ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে পরিহার করতে চলতে প্রয়াস পায়।

এবার কবির ভাষায় কবি-নিন্দিত আচার-পার্বণগুলোর পরিচয় তুলে ধরছি :

ঘর লেপনে গোময় : গোবরে লেপন্ত ঘর কাফের আকার।
গোবর নাপাক জান শাস্ত্র মাঝার॥
গোবরে লেপিলে ঘর শাস্ত্রে বহু দোষ।
অসন্তোষ রসুল ইবলিস পরিতোষ॥
ইবলিসের মসজিদ জান সেই ঘর।

গোবর বিষ্ঠাতুন ধিক নহে পবিত্তর ॥
গো-মল মনিষ্যের বিষ্ঠার সমান।
এথেক না লিপ ঘর যেবা মুসলমান ॥

কুমারীর প্রথম ঋতুকালে :

কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পকালে।
কতসন্ধ্যা উপাস রাখএ তিরি কুলে ॥
কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পকালে।
সিনান করিতে দুষ্ট সকলেরে বলে ॥
পঞ্চ কিবা সপ্ত দিনে লই খেলাওন্ত।
ধোপা নাপিতেরে আনি শুদ্ধ করাওন্ত ॥
শুদ্ধ করাই নিয়া জলে করে সিনান।
সহেলা গাওন্ত অনাদীনের ধরান ॥
ঢোল বাজাই যুবক সবারে জানাওন্ত।
আমার কুমারী বধূ পুষ্প দেখিছন্ত ॥

রজস্বলা ও প্রসূতির অপবিত্রতা :

রজঃস্বলা হৈলে নারী গৃহের অন্তরে।
অপবিত্র হয় বলে সবানের ঘরে ॥
এ সব বচন নাহি শাস্ত্র মাঝার।
নিশ্চয় জানিও এহি হিন্দুর আচার ॥
গর্ভবতী নারী যদি শিশু প্রসবন্ত।
বেদীনী নাপিতা আনি নউখ খুটাওন্ত ॥
অনাদীনি ছুঁইলে নারী কুল পবিত্তর।
এ মসলা তিরী কুল কিতাব অন্তর ॥
ইমাম আজমের কওলেতে হেন নাই।
শুদ্ধ করিতে যত মুসলমান ঠাঁই ॥
মাত্র হপ্ত দিন যত হইল তাহার।
ভালমন্দ দিন তাকে না কর বিচার ॥
শিশুর মুণ্ডের কেশ দূর করাইবা।

স্ত্রী-আচার : সংস্কার ও নারীপর্দা :

কত কত তিরী গণে ডালা শিরে দিয়া।
ইবলিসের পূজা জানি ধান্য তথা দিয়া ॥
সূতা তলে ঘট রাখি শিরেত লওন্ত।
নানা মতে বাস পিন্দি দেখিতে মহন্ত ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে গোধন সদৃশ একাত্তরে।
হাসিরসে শিরনী সালাহ দুয়ারে দুয়ারে ফিরে ॥

কেমন পুরুষ এ সকল নারী করে।
পশুর আকার ভিন্ন দুয়ারে দুয়ারে ফিরে ॥
তিরী নাম ধরি কৈল্যে পুরুষের কর্ম।
শাস্ত্রে বলএ তারে পাপিষ্ঠ অধর্ম ॥
মহাজনে সে নারীরে করএ বর্জিত।
তার হস্তে ভক্ষ্য না খাওন্ত কদাচিত ॥
নারীর উচিত রহিবার গুপ্তস্থান।

পর্দা :

ভিন্ন পুরুষেরে মুখ যে নারী দেখাইল।
আপনার সোয়ামীর দাড়িতে অগ্নি দিল ॥
নারীর বচন যদি শুনে ভিন্ন জনে।
আপনার সোয়ামীর মাথা মুড়াইল শানে ॥
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ দেখাইলে নারী
নরকের হুতাশনে যাইবেক পুড়ি ॥
মৃত্যুকালে মৃতের হইলে মিত্রজন।
মৃতের কারণে কভু না কর ক্রন্দন ॥
কত মূরখের কুলে উঠে দুষ্ট নারী।
উচ্চস্বরে কান্দে সবে মওতারে ধরি ॥

বিলাপ হারাম :

মৃত কাছে বসি কভু না কর কান্দন।
বিনাই কান্দিলে হয় মৃতের লাঞ্ছন ॥
শির বাস ন ফেলিবা ন কুটিবা হিয়া।
নিজ মুখ ন দেখাইবা সভা মেলে গিয়া ॥
রাজা বুলি ন কান্দিবা প্রভু ন বুলিবা।
প্রাণের ঈশ্বর বুলি কভু ন কান্দিবা ॥
এহেন কান্দন মৃত পরে দুঃখ ভার।

শব-স্নান :

মৃতরে গোসল দিতে গোসলের স্থান।
অতি যত্নে ধরিয়া যে করাইবা সেনান ॥
চাপি ন ধরিবা ন ধরিবা মুষ্ট ভিড়ি।
শীতল তাতল জলে ধুইবা যত্ন করি ॥
ধীরে ধীরে ধোলাইবা ন ঘস দিয়া ভার।
শরীর জর্জর রহিয়াছে মওতার ॥
বদরীর পত্র দিবা জলের উপর।
তাতল করিও জল অগ্নির অন্তর ॥

শবের প্রসাধন ও কাফন :

সুগন্ধি চন্দন শিরে দাড়িতে যত্তন ॥
সজিদার ঠামে ঠামে কাফুর লাগাইবা।

ন থাকিলে কাফুর সুগন্ধি তথা দিবা ॥
কাকইন ফিরাইবা মাথাত দাড়িত।
কিবা কেশ ন কাটিবা কদাচিত ॥
পারিলে কাফন দিবা না পারিলে নাই।

কাফন : ইজার চাদর আর তৃতীয়ে পিরান।
এই তিন বাস দিবা পুরুষ কাফন ॥
শির পদ ইজারে চাদরে যেন ঘোরে।
পিরান গ্রীবাথুন যেন অঙ্গ মাঝে পড়ে ॥
কাফন পরাইতে বাম পাশ দিয়া নিবা।
পুনি ডান পাশে বাম আনিয়া ঘুরিবা ॥
কাফন বান্ধিবা যদি বাতাসে উড়ায়।
বায়ু ভয় না হৈলে বান্ধিতে ন জুরায় ॥
তিন বাস দিতে যদি ন পারে কাফন।
ইজার চাদর দিবা শাস্ত্র বচন।
ইজার চাদর দিতে যদি ন পারএ।
পুরান কি নবীন দিবেক যে পারএ ॥
পঞ্চবাস তিরীর ইজার পিরান।
চাদর ঘোমটি সিনাবন্দ ই কাফন ॥
ইজার চাদর পিরান তিন বাস।
পুরুষ সদৃশ দিবা করিছি প্রকাশ ॥
বুকবন্দ বুক লই জানু যেন পায়।
তাত্থুন অধিক ন দিবেক জান সর্বথায় ॥
দিতে যদি ন পারএ সম্পূর্ণ কাফন।
ইজার চাদর দিব ঘোমটির সন ॥

কাফন : প্রথমে পিরান পরাইবা মওতারে।
কেশ দুই ভিতে রাখ পিরান উপরে ॥
ঘোমটি পরাই তবে ইজার চান্দর।
সিনা-বন্ধ পরাইবা তাহার উপর ॥
কাফন ন দিতে আগে সুগন্ধি ছিটিবা।

কবরস্থ করার সময়ে : যেবা এক মুঠি মাটি লই হস্ত পরে।
কোরান আয়াত পড়ি ঢালে গোরান্তরে ॥
সেই এক মুঠিতে আছএ রেণু যত।
প্রভু নিরঞ্জনে তারে পুণ্য দিব তত ॥
সেই মাটি প্রসাদে মৃত এ পুণ্য পায়।
গোরের অন্তরে অতি আনন্দে রহয় ॥

মৃত স্নানের স্থান : গোসলের স্থানে যদি বেড়াদি থাকএ।
ভাণ্ড ভরি জল রাখি চাঁদোয়া টাঙএ ॥
মূঢ় সকলে তাকে লহদ বুলএ।
লহদ ন হএ সেই ন জানি কহএ ॥
তাহাকে দেখিয়া রুহ্ হইব বেজার।
শাস্ত্রে ন কহিল যেই কর্ম করিবার।
কি সুখে করন্ত হেন মূরখ আকার ॥
গোরের পশ্চিমে খুদি রাখে মতারে।
আরবের ভাষে বুলে লহদ তাহারে ॥

মৃতের আত্মা : আপনার ঘরে চলি আসবে তখন ॥
কেমন করন্ত দান ফাতেহা দরূদ।
কোরান পড়ন্ত কিবা অল্প কি বহুত ॥
উজ্জ্বল করন্ত ঘর নতু আঁধিয়ার।
পুণ্য কর্ম দেখি দোয়া করে অনিবার ॥
যদি দান দক্ষিণা না দেখে কদাচন।
রুহ অসন্তোষ অতি মৃতের লাঞ্ছন ॥
এই মতে নবদিন আর পক্ষ মাস।
রূহ আসি ঘিরে আর চল্লিশ দিবস ॥
তেকারণে চল্লিশ দিনে ফাতেহা করাএ।
একদিন ন রাখিবা বিনি ফাতেহাএ ॥

মৃতের আত্মীয়-পরিজনের তিতা ভক্ষণ :

এহেন মরারে কেনে অশুদ্ধ বোলন্ত।
তার ঘরে কেহ বলে তিতা বা দেয়ন্ত ॥
তিতা অন্ন খাইলে বুলে কেহ ন মরিব।
তিতা বলে মৃত্যু বোলে কাছে ন আসিব ॥
মৃত ঘরে তিতা অন্ন দিতে অনুচিত।
মধু মিঠা ঘৃত লনী খাইতে উচিত ॥
শোকে দুঃখে চিন্তা ক্লেশে তিতা হইছে প্রাণ।
তাতে আরো তিতা আনি দেওন্ত বিদ্যমান ॥
শুনিয়াছি কাফের মুখে কেহ যদি মরে।
তাহারে দহিয়া যদি ফিরি আইসে ঘরে ॥
তিতা ভক্ষি লোহা দেওন্ত ভাগে করি সেনান।
যুগ পদতলে যত্নে রাখন্ত পাষাণ ॥
সে সবের দেখাদেখি মুসলমানগণ।
তিতা অন্ন ভক্ষ্য করে কিসের কারণ ॥

কুফরি আচার : (নাপিত ও খেউর)

তৃতীয় দিবস যদি হইল মরার
নাপিত আনিয়া বোলে খেউর করিবার ॥
আপনে করিয়া খেউর ইষ্ট ঘরে ঘরে।
খেউর হেতু যত্নে পাঠাওন্ত নাপিতারে ॥
ইষ্ট কুটুম্বের ঘরে নাপিত না দিলে।
অতি অসন্তোষ হয় সবে তারে বুলে ॥
মরা বিয়ালা নউখ কাটানোর ইষ্ট গেল।
তেকাজে আমার ঘরে নাপিত না দিল ॥
কুটুম্ব হইত যদি নাপিত পাঠাইত।
কন মুখে যাই তার ঘরে অন্ন খাইত ॥
শাস্ত্রে নাহি খেউর করাইতে মৃত্যু ঘরে।
প্রতি ঘরে ঘরে পাঠাইতে নাপিতারে ॥
তবে সে হিন্দুর মুখে শুনিয়া প্রকার।
মরা বিয়ালা কুটুম্বের যতেক বিচার ॥
ইষ্টজন মরে কিবা শিশু প্রসবএ।
রান্ধনের ভাণ্ড সব নিকালি ফেলায় ॥
নিরামিষ খাএ কর্ম করন্ত যাবৎ।
মৃত কর্ম করিত করাই হাজামত ॥

কবরের খিলানে বাঁশের প্রয়োগ :

কেহ বলে মণ্ডতার খাট বাঁধাইতে।
বাঁশ কিবা গাছ নারে আগা গুঁড়ি দিতে ॥
একমুখী দিলে আর কেহ ন মরিব।
আগা গুঁড়ি দিলে বোলে সঁকল মরিব ॥

ঘোমটা :

যে সব নারীর শিরে ন দেখিএ বাস।
এক এক নারীর মুখ যেন রবি হাস ॥
কেবল অবোলা যেন অতি রূপ ধরে।
বুকের হৃদে বাণ হানে আঁখি ঠারে ॥
সুরঙ্গ সুরূপ যেন চটকে দামিনী।
মাত্র শিরে বাস ভিনে কাক বাসা খানি ॥
বিনি বাসে শির যেবা রাখে অনুচিত।
মগধ ধবান সেই জানিও কুৎসিত ॥
নারীর যে সর্ব অঙ্গ মহা গুপ্তস্থান।
মাত্র কর পদ যুগ আর সে বয়ান ॥

সূতিকা-উত্তর আচার :

বালক জন্মিলে এক কুক্কুট রাখএ।
নিমুরিয়া পীর নামে ফাতেহা করাএ ॥

সেই কুক্কুটের মাংস রান্ধে একমতে।
গৃহের বাহিরে বলে নারে নিকালিতে ॥
নানান প্রকারে বলে ন পারে রান্ধিতে।
অভ্যাগত ভিক্ষুকেরে না পারএ দিতে ॥
যাহারে ভক্ষায় ভক্ষাওন্ত গৃহান্তরে।
ন জানি কহিল তারে কেমন বর্বরে ॥
সেইমতে নিমন্ত্রণ করে নিরন্তর।
তেমতে কবিরা তাকে বিচার ন কর ॥
নানা মতে রান্ধি পড়শীরে ভক্ষাইবা।
ভিক্ষুকেরে ভক্ষাইলে গৃহে নিতে দিবা ॥
এই মতে ভক্ষাইলে বহু পুণ্য পায়।
শিশুর খণ্ডিয়া বিঘ্ন আয়ু বাড়ি যায় ॥

হিন্দুয়ানি :

মোহর সাক্ষাতে আসি বলে হাসি হাসি।
সূর্য কদলীর কথা কহন্ত প্রকাশি ॥
ফাতেহা করাইমু অন্য জাতিরে কি দিব।
বুলিলা ফাতেহা করি আপনে খাইবা ॥
তা শুনি কুপিত হই দিল পদুত্তর।
মুসলমানে খাইতে মানা শাস্ত্র অন্তর ॥
ব্রাহ্মণেরে নিয়া দিব পূজার কারণ।
পূজা কৈল্যে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণ ॥
পূজার শুনিয়া নাম হইলাম কোপ মন।
বুলিলাম কহ কেনে কুফরি বচন ॥
বোলে আমি ন কহি কহে মওলানায়।
পূজা কর্মে ব্রাহ্মণেরে দিই আমরায় ॥
আমি কিবা মোহন্ত মোহন্ত সবে করে।
সেই মুমিনে খায় জিহ্বা ফুলি মরে ॥

অপক্ব শিরনি :

কত মুসলমানের কহি মুসলমানী
কদলী তণ্ডুল আটা কাচা দুগ্ধ আনি ॥
এসব একত্র করি ফাতেহা করন্ত।
সহরিষে লোক সবে তাহাকে খাওন্ত ॥
যাহারে রান্ধিয়া ভক্ষ্য রান্ধিতে উচিত।
বিনি সিদ্ধে ফাতেহা ভক্ষণ অনুচিত ॥
আর এক কুআচার কর্ম অনাধর্ম।
মুসলমান কর্ম নহে করিতে সে কর্ম ॥
ফাতেহা করিতে শিরনী কতকত মূরখে।
তৃণ এক গলে বান্ধে বহুল কতুকে ॥

তৃণ যেবা গলে বান্ধে তার এই গুণ।
মুমিন সকলে তারে বোলে মালাউন ॥
এই কর্ম পরিহারি সদায় রহিও।
সেই সবের দেখা দেখি কভু না করিও ॥

মহালক্ষ্মীব্রত :

আর এক পাপ কর্ম কেহ কেহ করে।
মহালক্ষ্মী হাঁস রক্ত দেওন্ত গোলা ঘরে ॥
লক্ষ্মী অপবিত্তর ধান্য করে একাত্তর।
মহালক্ষ্মী অলক্ষ্মী হাঁস রক্ত অপবিত্তর ॥
এতেক বেবুঝ লোক আছএ সংসারে।
কেবল হারাম দেওন্ত হালাল উপরে ॥
মহালক্ষ্মী কারে বোলে আমি নাহি চিনি।
হইলে হইব মহালক্ষ্মী ইবলিস ঘরণী ॥
তার সুতাসুত সবে করে এই কর্ম।
মাতৃকর্ম কইল্যে সে সবের মহাধর্ম ॥
আমার শাস্ত্রে ঐ কর্ম মহাপাপ।
কেহ কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস।
আলীম সভাতে তারে বহু উপহাস ॥
আর বহু মোহন্ত জনের তিরী কুলে।
নটীর সদৃশ নটী বেটী বিভা কালে ॥
সে সবের সোয়ামী সব ভূত কিবা পশু।
নিজ-নারী খেলিতে দেওন্ত আইলে বিষু ॥

মুসলিমের পূজা :

আর কত মুসলমানে অকর্ম করন্ত।
অন্য জাতি হস্তে যত্নে পূজা করাওন্ত ॥
মঘিনীরে ছাগল দেওন্ত কিবা জানি।
জাগারাণ দেওন্ত অন্য জাতি হস্তে আনি ॥
এই সকল শাস্ত্রমতে বহুল পাপ হয়।
নরকে পড়িয়া আর্তি পাইবা দুঃখ ময় ॥

প্রথম ঋতুস্রাব :

আর নব বধূ কিবা কাহার কুমারী।
কুসুম্ব দেখএ যদি পড়শীর বাড়ী ॥
গৃহ নষ্ট হইল বলে গৃহের ঈশ্বরী।
তাহার হেতু মোহর সম্পদ নিব হরি ॥
গোধনের রজ ফেক সক সেই জল।
আনি দিলে গৃহ হইব পবিত্র নির্মল ॥
ফুল ন হইল কুল জাতি হৈল কাল।
সুগন্ধিত গন্ধ অল্প গন্ধের বিশাল ॥

এহেন অকর্ম সব মগধ সবার।
তাহার জনম যার এই কর্ম তার ॥

পুকুর খনন :

আর বহু অবুঝ বেবুঝ কথা ধরি।
করন্ত বেবুঝ কর্ম বুঝ পরিহরি ॥
পুষ্করিণী খোদায় কিবা জাঙ্গাল দেওন্ত।
বিষুর ভিতরে কেনে অকূপ করন্ত ॥
সম্পূর্ণ খোদান যেবা কিবা নহি হএ।
তথাপি যে সকল পহির [পুকুর] এড়এ ॥
যুগল বছর হইলে বলে বহু দোষ।
সে সবের জ্ঞাতি সব নহে পরিতোষ ॥
আর পুষ্করিণীর মাঝে খুঁইল ন ধরিল।
অঘোষ ঘোষন্ত বলে কি পহির দিল ॥

বিষু-স্নান :

আর এক অপকর্ম হিন্দুর ধরান।
বিষুর দিনেতে লোকে গোসল করণ ॥
বৃষের অজার শিরে-গলে দেওন্ত ফুল।
পশুর সমান কর্ম করন্ত বহুল ॥
কেহ কেহ হলদি চন্দন লাগাওন্ত।
বিন্দু বিন্দু নানামতে অঙ্গেতে দেওন্ত ॥
এ সকল কর্ম জান কুৎসিত আকার।
বহু পুণ্য মঘদের শাস্ত্রের মাঝার ॥
গৃহের গোবর সব একত্র করিয়া।
বিষুর প্রভাতে অগ্নি দেওন্ত জ্বালিয়া ॥
সেনান ক-রি তিতা ভক্ষি খেলাওন্ত রঙ্গে।

বিবাহে বাজনা :

কেহ যদি বিবাহ করিতে কইল্যা মন।
শরীয়ত কর্ম হানি অকর্ম করণ ॥
প্রথমে আনিয়া ঢুলী ঢোল বাজাওন্ত।
আকাশ পাতাল আদি সব কাঁপাওন্ত।
শাস্ত্র মানা পেল [ঢোল] বাহি বিবাহ করিতে।
তোমা হেন মওলানায় কিসকে বাজায়।
সে সবে পারন্ত কেনে নারি আমরায় ॥
দামাদকে গোসল করায় তিরীগণে।
হলুদ দেওন্ত কেনে মূরখের বচনে ॥
হলদি অঙ্গেত দিলে শাস্ত্রে বাহু দোষ।
অসন্তোষ রসুল ইবলিস পরিতোষ।

বরণডালা :

মঘদের কর্ম নাহি শাস্ত্রের অন্তরে ॥

নিমিষ্ঠা শোলার নির্মে মাত্র এক বন।
অধিক নিকুঞ্জ বন যেহেন কানন ॥
কুসুম্ব বলিয়া তারে শিরেত দেওন্ত।
সুগন্ধি সৌরভ পুষ্প তাকে ন দেওন্ত ॥
আর এক ডালা ভরি ভূত পূজা খানি।
ধূপ ধান্য পিঠা কলা শিলা ভরি আনি ॥
দামাদ কন্যার আগে আনিয়া রাখন্ত।
যুগ করে ধূপ দিয়া অধিক পূজন্ত ॥
শাস্ত্রে বোলে পূজা কর্ম কাফের সবার।

সহেলা :

চতুর্দিগে বেড়ি যত কামিনীর গণ
উচ্চস্বরে সহেলা গাওন্ত রঙ্গ মন ॥
কেহ কেহ মহা ঠারে মুখ কুটি হাসন্ত।
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ নিজে দেখাওন্ত ॥
নটীগণ হন্তে শ্রেষ্ঠ সে সবের গীত।
ভিন্ন পুরুষের মন হয় উচলিত ॥
নটী যদি করিবারে চাহে নিজ নারী।
সে সবেরে মেলাতে পাঠাও যত্ন করি ॥
তিরী লোকে সহেলা গাহিলে বহু পাপ।
অঘোর নরকে পড়ি পাইব সন্তাপ ॥

মারওয়া :

আর পত্র ধার বহু কাঁচা বাঁশ আনি।
মারওয়া নির্মান্ত ইবলিস্সের বাসা খানি ॥
চতুর্দিগে সপ্ত নাল সূতায় বেড়িয়া।
ঠামে ঠামে মুছহি বহু দেওন্ত ঢুলাইয়া ॥
মারওয়ার বার্তা নাহি শাস্ত্রের মাঝার।
মুসলমান কর্ম নহে কাফের সবার ॥
বাঙ্গালে বাঙ্গালা বান্ধিবারে নাপারন্ত।
ইবলিস কারণে বাসা নির্মিতে জানন্ত ॥
সত্বর করি কলসী ভরিয়া আনি জল।
অতি মান্য করি রাখে মারওয়ার তল ॥
চারি পাশে ভ্রমি ভ্রমি গাহন্ত সুস্বরে।
কলসী মানাই শুনাওন্ত ইবলিসরে ॥
ঘট জলে দামাদকে সেনান করাইবার ॥
যদি সে কন্যার ঘরে শাহা চলি যায়।
মুণ্ডকেশ কাটাইয়া আঙ্গুল খুটায় ॥
কি সুখে খুটাও নখ চুল ন বাড়িলে।
নিজ মনে ভাবি চাহ তোমরা সকলে ॥

গেরুয়া : আর যত নবীন যৌবন তিরীগণ।
সমান বয়সী কত যুবকের মন ॥
কুমার কুমারী দুহ মুখামুখী করি।
গেরওয়া ধরন্ত দোহানকে উয়া দাঁড় করি ॥
উচ্চস্বরে মহাঠারে গেরওয়া ধরন্ত।
অন্যে অন্যে দুহ বুলে কতুকে হেরন্ত ॥

জলুয়া : জলুয়ার ছলে ভিন্ন নারীর বদন।
হাসি হাসি রতিভাবে করে নিরীক্ষণ ॥
ভিন্ন পুরুষের মুখ দেখি নারীগণ।
এক লক্ষে পাইল যেন স্বর্গের দরশন ॥
মুখ কুট হাসিয়া চক্ষু ভাঙ্গা বাঁশ তুলি।
মনপুরী হরে নিতি রতি রসে ভুলি ॥
এই কর্ম তোমরা সবের ভালা লাগে।
দধি থাল রাখ নিয়া বিড়ালের আগে ॥
আর দুহানরে একত্র নারীকুলে।
স্নান করান্ত কেনে কলসীর জলে ॥
কলসীর বার্তা নাহি শাস্ত্রের মাঝার ॥

পাশা : আর দোহানরে মুখামুখী বৈসাইয়া।
পাশা খেলাওন্ত কুপুরুষ যুক্তি দিয়া ॥
ভিন্ন নারী পুরুষ হৈয়া একাত্তর।
খেলা ছলে হাস লাস করন্ত বিস্তর ॥
ভিন্ন পুরুষের ভয় না রাখন্ত মনে।
পুরুষেহ ভিন্ন নারী হেন নাহি জানে ॥

মওলানার পোশাক ও চরিত্র :

শিরে বান্ধি মহা পাগ জুব্বা রাখি পৃষ্ঠ ভাগ
পরি মহা শ্বেত পিরহান ॥
হস্তে 'আসা' দণ্ড ভারি অধিক দীঘল দাড়ি
দেখিতে ফেরেশতা সমতুল।
নমাজ ন পড়ে ঘরে লোকের সম্মুখে করে
ধীরে ধীরে দীর্ঘল বহুল ॥
ঘরে ঘরে নিতি ফিরে লোকেরে মুরিদ করে
আপে যেন তেহেন লোকের।
কিঞ্চিত পাইয়া ধন ন বিচারি কত জন
খেলাফত দেওন্ত সত্বরে ॥
দক্ষিণার বাত্রা পাইলে মাংস যেন রাখে চিলে

ছুপ মারে আপনা পাসরী।
পাগল সদৃশ হএ খাওন্ত সত্বরে ধাই
উর্ধ্ব শোয়াসে যেন মত্তকরী ॥

কত কত মওলানায় শাস্ত্র নাহি জানে।
আচাউক জানিবা শাস্ত্র বাণী নাহি শুনে।
সে সব মওলানা জান ইবলিসের চর।
অবিরত তার মুখে নারদ উত্তর ॥

বেনামাজি দরবেশ : কত কত দরবেশ যে ফকিরের জন।
নমাজ করিলে বোলে কোন প্রয়োজন ॥
কেমন ফকির সেই রসুল উম্মত।
কেমন খলিফা তারে দিল খেলাফত ॥

অস্পৃশ্যতা : কত কত মওলানায় ফতোয়া দেওন্ত।
ধীবরের ঘরে খাইতে নিষেধ করন্ত ॥
কি বুঝি কহন্ত হেন অসখ্য কথন।
হালালরে হারাম বোলন্ত কি কারণ ॥
ব্যক্তিরে ন দোষে শাস্ত্রে তুমি দোষ কন।
মুসলমান যদি হয় নিশঙ্কায় খাইও।
নমাজ না করে যদি মুখ ন চাহিও ॥
আরো বোলে শাস্ত্র মাঝে মৎস্য বেচিবার।
যেবা বেচে তার ঘরে নারে খাইবার ॥
কেমন বর্বরে কহে শাস্ত্র নঁ জানিয়া।
শাস্ত্র ন শিখএ কেনে আলিমেত গিয়া ॥
শারাবী সিফতী ভাঙ্গী বেনমাজী ঘরে।
সে সব মাওলানা খায় কিসের কারণে ॥
যারা শাস্ত্র মানা করে তার ঘরে খায়।
নিষেধ ন করে যারে তথা নাহি যায় ॥

মহররমের তাজিয়া : কত কত মাওলানায় আশুরার দিনে।
হাসান হোসেন মূর্তি নির্মান্ত যত্তনে ॥
পড়শী সবারে আনি পূজা করাওন্ত।
নাচি গাহি তিরী সকলেরে শুনাওন্ত ॥
আপনে করিয়া পাপ পররে করায়।
লোকরে ভুলায় যেন ইবলিসের প্রায় ॥

সৈনিকের রতিচর্চা : আমরা সকল নিতি দেশে দেশে ফিরি।

নিজ গৃহ নারী ছাড়ি হই দেশান্তরী ॥
আপনা নারী রাখিবারে শক্তি নাই।
তেকারণে রতি ভুঞ্জি যার নারী পাই ॥
হেন যদি না করি কেমতে রহিব।
লাজহেতু আপনার কাজ নষ্ট হইব ॥
তিরী দেখি পুরুষে কি রহিবারে পারে।
অবশ্য উনায় ঘৃত অগ্নির যে আড়ে ॥

হালচাষ সংস্কার :

কত কত মওলানাতে কেহ যদি পুছে।
হালপালনের কথা বোলে শাস্ত্রে আছে ॥
আষাঢ়ের সপ্ত দিনে রজঃ পুথিম্বিরে।
উদরতুন ভগস্থলী নিকালে বাহিরে ॥
তেকারণে সপ্ত দিনে হাল ন জুড়িব।
হালজুড়ে যে সকল নরকে পড়িব ॥
রজস্বলা হইলে নারী পারে নি রমিতে।
রজস্বলা কালে ভূমি চষিব কেমতে ॥
এই মতে কহি যত পাপিষ্ঠ সকলে।
অজ্ঞান সবারে হাল পালাইতে বোলে ॥
হাল পালনের পিঠা এ লবণ ন দিব।
ক্ষেতি মধ্যে নিয়া এ বলে ফাতেহা করিব ॥
এহেন অসখ্য বাণী কিসকে কহন্ত।
আপনে ন জান যদি কি বুঝি বোলন্ত ॥
শাস্ত্র মধ্যে নাহি হাল পালনের বাত।
হাল পালাইতে তাত কিছু নাহি ফল।
হিন্দু সব দেখা দেখি পালন্ত সকল ॥
কত কত মুসলমানে হাল লামাইতে।
ডিম্ব এক মধ্যে রাখি চষে চারি ভিতে ॥
কেহ কেহ জামডাল কুপি মধ্যভাগে।
চারি পাশে হাল জোড়ে যেন চক্র লাগে ॥
কিসকে করন্ত হেন মূরখের আকার।
ভাল দিন বুঝি যুক্ত হাল লামাইবার ॥
যে দিন লামান্ত হাল কিবা জালা ফেলে।
কিবা গুছি লয় কিবা ধান্য আগা লইলে ॥
কেহ দ্রব্য খুঁজিলে সেদিন ন দেওন্ত।

ফাতেহা :

পীর সব শিরনী করে অধিক যত্তন ॥
সেনান করি পবিত্র বসন সব পরে।
গোবর লিপিয়া ঘর অপবিত্র করে ॥

ফাতেহা করাইতে নেওন্ত বাহির ভবন।
ফাতেহা করন্ত জল ছিঁটিয়া যত্তন ॥
নমাজ করিতে পারে গৃহের অন্তরে।
ফাতেহা করিতে বোলে তথা নাহি পারে ॥
ফাতেহা করিতে নারে নমাজের ঘর।
রান্ধিতে পারএ যথা লেপিছে গোবর ॥

ফাতেহাপদ্ধতি

মৃত্তিকার কুজা এক সমুখে রাখিব।
এক নামে এক জোড় রুটি তুলি দিব ॥
বুলিব ফাতেহা কর মৌলানা সত্বর।
ফাতেহা করিলে রাখে মৌলানা গোচর ॥
আর এক জোড় তুলি দিবেক তখন।
ফলনার নামে দিতে বুলিব সঘন ॥
এই মতে শতে শতে ফাতেহা করএ।
মৌলনার মুখ জল সব শুকাই যাএ ॥
আর কেহ অন্ন যদি ফাতেহা করান।
এক পত্র বিছাইব পবিত্র স্থান ॥
অল্প অল্প ঠাঁই ঠাঁই অন্ন রাখি তাত।
পূজা যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাৎ ॥
নামে নামে শতে শতে ফাতেহা দেওন্ত।
কত কত সজ্জন ভাজন মহাজনে।
কাষ্ঠ হেতু নিজ নারী পাঠাওন্ত বনে ॥
পুরুষের কর্ম কিবা মৎস্য মারিবারে।
শাস্ত্রে কহিয়াছে তিরী গুপ্তে রাখিতে।
ন কহিল কাষ্ঠ মৎস্য হেতু পাঠাইতে ॥

ধূমপান :

মসজিদে হুক্কাবাজি কভু না করিও।
যেবা পিয়ে তারে তুমি নিষেধি রাখিও ॥
কেহ কেহ পীর কর্ম একিন করন্ত।
বেনমাজী সব আনি শিরনী রাধাঁওন্ত ॥
যার ঘর শুদ্ধ হইছে তাকে ন ডাকন্ত ॥

জাতিভেদে ধূমপান

একহি হুক্কাতে কিবা একহি টেমিতে
মগধের সঙ্গতি লইছু ধূম পিতে ॥
এক নলে হুক্কাবাজি আনন্দে করন্ত।
নিজ জাতির সম অন্য জাতিরে জানন্ত ॥
মগধ সঙ্গতি যদি ধূম্র পিতে পারে।
কিসকে ভক্ষণ নাহি পারে ভক্ষিবারে ॥

সে সবের কন্যা কেনে বিভা ন করন্ত।
আপনা দুহিতা সে সবে ন দেওন্ত ॥
নৈরাকারে যাহার উপরে অসন্তোষ।
তুমি কেনে তার পরে হও যে সন্তোষ ॥
আপনার তিরী কন্যা সভাত পাঠাওন্ত।
ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে খেলিতে দেওন্ত ॥
বিষুর দিবসে কিবা বিবাহের কালে।
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনন্দ কুতূহলে ॥
ছিফত ভক্ষন্ত কিবা হরিষ অন্তর।
নারী বা পুরুষ সব হই একত্তর ॥
ছিফত খাইয়া অতি যেন মত্তকরী।
উন্মত্ত হএ কিবা পুরুষ কি নারী ॥
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মগধ ধরনে।
হাসন গাহন্ত নটী নাটকের গণ ॥
পুরুষ নারীর নারী পুরুষের সঙ্গে।
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙ্গে ॥
এক ঢোল বাজাওন্ত ছিফত ভক্ষন্ত।
আর পুনি তিরীগণে সাহেলা গাহন্ত ॥
এহেন নিলজ্জা পাপী সংসারেত নাই।
নিশ্চয় জানিও তারে ইবলিসের ভাই ॥
বেনামাজী শরাবী ছিফতী মত্ত ভাঙ্গী।
এ সবের ঘরে না খাইবা কিবা ঢঙ্গী ॥

হিন্দু-পুরোহিতের প্রভাব :

যে কিছু কহএ সে গন্ধর্ব পুরোহিত।
মূরখের সকলে মানি লয় এক চিত ॥
পণ্ডিত সবের বাক্য কভু না ধরন্ত।
গন্ধর্ব সকলে জল হিন্দুনী পিওন্ত ॥

তামাক :

কেহ ধূম্রবাজী করে ধূম্র ছোড়ে তার পরে
একে এড়ে আর জনে লয় ॥

আউশ ধান্য :

যত আউশ ধান্য আছে সংসার মাঝার।
ফাতেহাতে ন লাগএ ন পারে দিবার ॥
অন্ন কিবা রুটি দিতে কদাপি ন পারে।
কেমন বর্বরে ফতোয়াবাজী করে ॥
যেই খাইতে পারে সে ফাতেহা দিতে পারে
আউশ কিবা নতু শাইল তাত কি বিচার ॥

অস্পৃশ্যতা : তেলি জেলে :

কেহ বোলে তেলি কিবা হাজামের ঘরে।
কিবা মৎস্য বেচে কিবা যেবা মৎস্য মারে ॥
সে সবের ঘরে বোলে খাইতে ন পারে।
কেমন আলিমে এ ফতোয়াবাজি করে।

গ্রন্থরচনাকাল :

পুস্তক আদায় সমএ লওত গুণিয়া ॥
চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস ॥
পুস্তক গ্রথন দুঃখ কহন ন যাএ।
মাত্র জানে যেই নারী বালক প্রসবএ ॥
যত দুঃখ পাইলুম আমি মূরখের কারণ।
অবশ্য দুঃখের ফল দিব নিরঞ্জন ॥
কাহারে নৈরাশ না করএ নিরঞ্জন।
সন তারিখ লেখিবারে, শ্রদ্ধা বাড়ি গেল ॥
চতুর্বিংশ অঘ্রাণের জোহর সময়।
বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয় ॥
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার।
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার ॥

ঘ. তোহফা

(১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত)

আলাউল বিরচিত

আলাউল মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবিদের একজন। মূলত অনুবাদক হলেও তাঁর পাণ্ডিত্য-কবিত্ব তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। তাঁর অনূদিত কাব্যগুলো : পদ্মাবতী (১৬৫১ খ্রি.), সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-৬৯), তোহফা (১৬৬৪), সপ্তপয়কর (১৬৬৮), সিকান্দরনামা (১৬৭৩); রাগতালনামা ও পদাবলী এবং কাজী দৌলতের কাব্যের সমাপ্তি অংশ।

১. বিদ্যা ও আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে :

নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কর দুঃখ কাজ।
লজ্জা না করিও তাহে মাগিলে সে লাজ।
বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদসম যে আলস্য করে ॥...

পৃষ্ঠে মুণ্ডে আনিব পর্বত কাষ্ঠ শিলা।
পরগৃহ অন্ন হোতে শতগুণে ভালা ৷৷
শাক অন্ন রুক্ষ শুষ্ক যেই মিলে খাও।
স্বাদ হেতু নৃপতির গৃহেতে না যাও ৷৷
মনেত করিয়া আশা কতক্ষণে খাও।
পর-গৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায়।
পর-গ্রাসে আশা ভাবি না থাকিব মনে।
কুকুর সমান তারে দেখে সর্বজনে ৷৷

২. সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে :

সুস্বর ঈশ্বর দান বড়হি পদার্থ।
শ্রুতি মাত্র মনেত উপজে পরমার্থ ৷৷
হাদিসে খবর দিছে রসুল ঈশ্বর।
তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর ৷৷
মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার।
মহৎ চরিত্র সত্যভাব জন্মে যার ৷৷
ভাব উপজিলে মন ঊর্ধ্বগতি হএ।
না মরে জলের হেটে অগ্নি না দহএ ৷৷
সারে প্রবেশিব মন অসার তেজিয়া।
অশ্রু স্রবে শ্বাস রোখে না দিব ছাড়িয়া ৷৷
এমত হইলে তারে বোলে শুদ্ধভাব।
কপটে নাচিলে হানি, বিন্দু নাহি লাভ ৷৷
গাহিতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব।
প্রভু ভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব ৷৷
একরীত হোতে চিত্ত হএ আন রীত।
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত ৷৷
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব।
নহে অশ্রুপাতে প্রভু স্মরণে রহিব ৷৷
যন্ত্রকুল হারাম হইলে এই রীত।
তবল বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত ৷৷
তাম্ব ঢোল নিঃস্বার্থে বাহন নিষেধ।
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ ৷৷

৩. আদব-লেহাজ সম্বন্ধে :

মজলিসে গেলে মৌল হইয়া বসিবে।
বিনা জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিবে ৷৷
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে।
নহে পুনি শুনিয়া থাকিব সাবধানে ৷৷

না ঝুরিব, না বসিব হেলি পদ মেলি।
অঙ্গে নখ না লাগাবে হেট বস্ত্র তুলি ॥

৪. বিয়ে সম্বন্ধে :

[যে নারী]
অতি স্থূল, পুষ্টকায়া, অধিক দুর্বল।
কর পদে লোমাবলী থাকে যে সকল ॥
না ঢাকএ মস্তক সাক্ষাতে দেএ গালি।
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি ॥
কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাষে।
করিয়া পীড়ার ছল নিকটে না আসে ॥
[তার চেয়ে]
আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল।
কিনিয়া সুন্দরদাসী গোঙাইলে ভাল ॥
দাসী ভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।
সদা ত্রাস যুক্ত থাকে, বুঝে কার্যমর্ম ॥

৫. দাসী সম্ভোগ সম্বন্ধে :

যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন।
তৎমাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন ॥
উদর পবিত্র আছে বুঝিয়া মরম।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম ॥
বেচিলে বেচিবে দাসী পবিত্র উদরে।
মাসাধিক যায় সে চরিত্র বুঝিবারে ॥

৬. ভিখিরির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ইদানীং কোরআন-হাদিসের বাণী-সম্বলিত বহু কবিতা রচিত হয়েছে। আলাউলের এ অংশ ওসব কবিতার পাশে হীনপ্রভ হবে না :

কৃপাভাবে ভিক্ষুক করিলে এক দৃষ্টি।
তৌমা 'পরে ঈশ্বরে করিব কৃপাবৃষ্টি ॥
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পরদুঃখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু কৃপা-ভাগী ॥
দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।
না দিয়ে ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি॥
ঈশ্বরে বোলএ, 'আমি গেলুঁ তোর দ্বারে।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলে আমারে' ॥
দ্বার হতে কেহ যদি মাঙুয়া খেদাএ।
'মোকে খেদাইল'—হেন বোলএ খোদাএ ॥
গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক।
সহস্র বৎসর দোজখেত পাইব দুঃখ ॥

৭. লৌকিক-সংস্কার সম্বন্ধে :

১ না লেপিও ঘর বেড়া গোলাদ মিশ্রিত।
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত ॥
২ পতি পত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ।

৮. যাত্রার তিথি : কিবা শনিবারে নিঃসরিব গৃহ হোন্তে।
তুরিতে আসিব ফিরি নিষ্কণ্টক পন্থে ॥
কর্কটে থাকিতে চন্দ্র যাত্রা না করিব।
চৌদিকে উল্টাবার বুঝিয়া চলিব ॥
না যাইব আদিত্য, শুক্রে পশ্চিমের ভিতে।
সোম শনি পূর্বে না যাইব কদাচিতে ॥
গুরুবারে দক্ষিণেত নাহিক কুশল।
উত্তরে মঙ্গল বুধ বড় অমঙ্গল ॥
রহিতে না পার যদি যাইবে অবশ্য।
মন দিয়া শুন তার ঔষধ রহস্য ॥
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই
গুরুবারে দক্ষিণে চলিব গুড় খাই ॥
উত্তরে মঙ্গলে যে ধনিয়া মুখে দিব।
দর্পণ হেরিয়া সোমে পূর্বেতে চলিব ॥
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিয়া মুখে।
বাহাঙ্গ ভক্ষিয়া শনি পূর্বে চল সুখে ॥
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিঅ বুধবারে।
কোন বিঘ্ন না হইব কহিলুঁ সাদরে ॥

৯. আযান-মহিমা :

উচ্চস্বরে বাঙ্গ দিলে শীঘ্র পন্থ পাএ ॥
আযানের কথেক মহিমা গুণধরে।
ভূত দেও বহুল সঙ্কট ধাএ দূরে ॥
বাঙ্গ নামাযের গুণ মহিমা অপার।
উজ্জ্বল যাহার জোতে সকল সংসার ॥

১০. বধূবরণ : এয়োদশ বাবে শুন সুধীরেক।
যেন মতে নিজ নারী গৃহে আনিবেক ॥
পিতৃগৃহ হন্তে নারী গৃহেত আনিব।
প্রথমে তাহার দুইপদ পাখালিব ॥
তবে সেই রমণীর পাখালনা পানি।
চারি কোণে বাসগৃহে ছিটিবেক আনি ॥

প্রভাতে শক্তি অনুরূপ করি মেহ্‌মানি।
উত্তম লোকেরে ভাল ভুঞ্জাইব আনি ॥

১১. রমণ-বিধি : রাত কালে প্রথমে আল্লার নাম লৈব।
দেও-পরী রক্ষাহেতু 'আউজ' পড়িব ॥
মনে না করিঅ পরনারী কামভাব।
যদি গর্ভ হএ তবে হএ অন্যলাভ ॥
ফলবন্ত বৃক্ষতলে, না করিঅ রতি।
অপত্য জন্মিলে হএ জালিম দুর্মতি ॥
বিনি ওযু না করিঅ কভু রতিরণ।
পুত্র-কন্যা হইব কৃপণ অভাজন ॥
চন্দ্র-তারা হেটে যদি করএ সঙ্গম।
অপত্য জন্মিলে হএ কুরূপ অধম ॥
মোহন্ত করিতে কেলি উদ্যান জমাএ।
সেই লাগি উপরেত চান্দোয়া টাঙ্গাএ ॥
সঙ্গমকালেত কথা কহন অশুভ।
অপত্য জন্মিলে হএ সেই দোষে বোব ॥
যদি সে ভ্রমে লোভে রসে কহে কথা।
খলনের কালে কথা না কহ সর্বথা ॥
রতির সমএ যোনি-দ্বার না হেরিব।
বালক আমূল কিবা নির্লজ্জ হইব ॥
সূর্যোদয়ে সঙ্গম করিতে না জুয়াএ।
উপস্থিত নানা ব্যাধি হএ তার গাএ ॥
প্রথম রজনী রতি নাহি ধিক সুখ।
নিশি শেষে রতি রস বড়হি কৌতুক ॥
চন্দ্রের প্রথম, মধ্য কিবা শেষ কাল।
রতি কর্মে ব্যাধি জন্মে নহে সেই ভাল ॥
রতি সাঙ্গে শীঘ্র ভিন্ন হৈঅ নারী হোতে।
তপ্তজলে অঙ্গ পাখালিবা ভাল মতে ॥
শির-পীড়া জ্বর হন্তে পাইবা কল্যাণ।
কোন কর্ম না করিবা বিনু রতি-স্নান ॥
যুবা নারী সঙ্গে সুখে ভুঞ্জ রতি-রঙ্গ।
সুখহীন শক্তিহীন বৃদ্ধরামা সঙ্গ ॥
ঘন ঘন পশু প্রায় না করিঅ রতি।
আয়ু বল ক্ষীণ হএ নয়ানের জুতি ॥
দাগা দিলে শ'তানে করিঅ আগে স্নান।
তবে সে রমণী সঙ্গে সঙ্গম কল্যাণ ॥

১২ খাদ্যগ্রহণ বিধি :

চতুর্দশ বাবে শুন মনের হরিষে।
ভক্ষ্য বস্তু যেমত ভক্ষিব সুপুরুষে ॥
নিশি দিশি এক সন্ধ্যা ভক্ষণ উচিত।
শরীর সুসার থাকে করে অতি হিত ॥
ক্ষুধা ভক্ষ্যে স্বাদ গুণে যেই দ্রব্য খাএ।
আকণ্ঠ ভোজনে অসুখ জন্মে গাএ ॥
আপনা সম্মুখে যেই পাএ সেই খাইব।
কদাচিৎ আন আগে হস্ত না ক্ষেপিব ॥
ছোট গ্রাসে ভক্ষিবেক বহুল চর্বণে।
আগে পাছে দুই হস্ত ধুইব সাবধানে ॥
প্রতি গ্রাস মুখে দিতে বিচমিল্লা পড়িব।
পরম সমাদরে অন্ন ভক্তিএ খাইব ॥
খাট 'পরে না খাইব অঙ্গ হেলাইয়া।
যে কিছু সমুখে পড়ে খাইব তুলিয়া ॥
আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্ট দ্রব্য খাএ।
যে খাএ সে জীর্ণ হএ ব্যাধি যে পলাএ॥
নিমন্ত্রণ লইলে ঘরে কিছু না খাইব।
কার অন্ন না দূষিব যেই পাএ খাইব ॥
না বুলিব তিক্ত কটু তাহাতে আস্বাদ
সোকরেত সুখ প্রভু নিকটে প্রসাদ ॥
অতিথ আইলে করি বহুল আদর।
যে থাকে তরল ভক্ষ্য করিব গোচর ॥
আপনে অতিথ হই পরগৃহে গেলে ॥
যথা স্থল পাও তথা বৈস কুতূহলে ॥
কোন বস্তু না মাগিব গৃহপতি স্থানে।
যেই পাএ যথোচিত খাএ হৃষ্টমনে ॥
যদি কেহ আসি নিমন্ত্রণ সংবাদএ।
এইসব স্থানে না যাইব সদাশএ ॥
যদি জান তথা গেলে কলহ বিবাদ।
ক্ষেমা সে মাগিবা গেলে পাইবা বিষাদ ॥
সন্দেহ থাকিলে মনে না খাইবা তথা।
মৃত্যু-অন্ন ঢোল বাদ্যযন্ত্র বাজে যথা ॥
ভণ্ড বাক্য কহে কিবা নিন্দাচর্চা করে।
কিব সুরা পান তথা করে খল নরে ॥
সৎকর্ম না হএ কপট নিমন্ত্রণ।
আদর করএ মাত্র দেখি ধনীজন ॥
নিধনীরে হেলা ফকিরেরে মন্দ বোলে।
শুন সাধু কদাপি না যাইবা সেই মেলে ॥

১৩. বস্ত্র পরিধান : ষষ্ঠদশ বাবে শুন সাধু সুচরিত।
যে মতে বসন পরিব শাস্ত্র রীত ॥
অতি ঢিল না পরিব কিবা অতি টান।
চিরদিন থাকে হেন পরিব সমান ॥
কীট সূতা তানা হৈলে না পিন্দিব তারে।
পাগ বাজুর হস্তে খাট পরিব ইজার ॥
সর্ববস্ত্র হস্তে পিন্দ ইজার মলিন।
তবে তার ধিক শোভা হইব প্রবীণ ॥
ধবল বসন পরিবেক অনুক্ষণ।
পীত রক্ত কুসুম্বিত না পর সুজন ॥
চর্ম পাট বাজু যদি যুবা জনে পরে।
বহুক্ষণ না রাখিব গাএর উপরে ॥
পাট বস্ত্র চমেত সেজদা না জুয়াএ।
তুলাবাসে সেজদাএ বহু পুণ্য পাএ ॥
সপ্তগজ নিয়মিত বান্ধিব দস্তার।
বান্ধিব পাতল বস্ত্র দেখিয়া ওসার ॥
পিঠভাগে 'শামলা' রাখিব অনুমানি।
শামলা বিহীনের পাগ জানিঅ শয়তানি ॥
বহুদিন থাকে বস্ত্র রাখিলে পবিত্র।
শাস্ত্র অনুরূপ বাস সৃজন চরিত্র ॥
কোশা মৌজা পরিলে জরদ অতি ভালা।
চৌস্ত দেখে সুজনে যদি সে পরে কালা ॥
মোজা কৌশা পরিব দক্ষিণ পদে আগে।
নিকালিব পদ তার উল্টা সঞ্জোগে ॥
বসিয়া ইজার পিন্দ আগে বাম পদ।
দণ্ডাই বান্ধিলে পাগ খণ্ডিব আপদ ॥
ধুইতে নবীন বস্ত্র জল লই কর।
দশ বার পড়িবেক ছুরত 'কঁদর' ॥
ফুকি ফুকি সেই বস্ত্র জল বসনে ছিটিব।
সেই বস্ত্র পরিলে পুণ্য দোষ না রহিব ॥
লোহা তাম্র রাঙ সীসা পিত্তল কাঞ্চন।
এ সব অঙ্গুরী না পরিব বুধজন ॥
ইচ্ছা সুখে ছাপাঙ্গুরী সাধু না পরিব ॥
হাকিম হইলে ছাপ রজতে গঠিব ॥
হেমরত্ন অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
যুবতী নারীকে মাত্র শোভএ ভূষণ ॥
পৌরুষ কেবল পুরুষ অলঙ্কার।
বিশেষত দান ধর্ম পর উপকার ॥

অলঙ্কার পুরুষে পরিলে সে হারাম।
বিদ্যাগুণ অলঙ্কার প্রতিষ্ঠা সুনাম ॥

১৪. শয়ন : একসর না সুতিব গৃহের মাঝার।
ভক্ষ্য শেষে দিনে শুতে, খণ্ডে দুঃখ জাল ॥
রাত্রির ভোজন করি তুরিতে শুনাতে।
শরীরে নানান ব্যাধি জন্ম হএ তাতে ॥
নিশিতে ভোজন শেষে হাঁটিব বিস্তর ॥
যথেক বিলম্ব হাটে গুণ বহুতর ॥
ভূমি শয্যা শয়ন করিলে নহে ভাল ॥

১৫. স্বপ্ন : স্বপ্ন দেখি পরীক্ষিঅ পণ্ডিতের স্থানে।
না কহিঅ শিশু, শত্রু, নারী হীনজ্ঞানে ॥
মন্দ স্বপ্ন পরীক্ষিয়া ভাল কৈলে হিত।
ভালরে বুলিলে মন্দ ফলএ ক্বচিৎ ॥

১৫. দাস ও পড়শী :
যদি দাস কিন ভ্রাতৃসমান দেখিবা।
সম ভক্ষ্য দিবা যোগ্য বস্ত্র পরাইবা ॥
অপরাধ করিলে ক্ষেমিবা ধর্ম্ম মানি।
পাত্র ভাঙ্গে গালি না দি' আর দেও কিনি ॥
মনে দুঃখ পাএ হেন কার্যেত না দিবা।
রোযাদার হৈলে যোগ্যকাজে নিয়োজিবা ॥
পড়শীরে মনদুঃখ কদাপি না দিবা।
দয়া করি যথ পার সহায় হইবা ॥

১৬.পিষুন : পিষুনী সকলে কভু ভালাই নাহি পাএ।
আনলেত তৃণ যেন সব পুণ্য খাএ ॥
তেজ ঝাটে গর্ব 'কেনা' [প্রতিহিংসা] হও শুদ্ধ মতি।
'কেনার' নরক বিনু আর নাহি গতি।
যদি তুমি লোক আগে কার দোষ কও।
শত দোষ আপনা আঞ্চলে বান্ধি লও ॥
কঠিনতা মক্কর চক্কর তেজ ঝাটে।
শীঘ্র ঘটে তার ফল আপনা নিকটে ॥
গর্ব না করিঅ সকলেরে জান বড়।
গরবে গরল ধিক মন্দ জান দড় ॥
দেখিলে শিশু বা বৃদ্ধ করিঅ আদর।
শিশু পাপহীন বৃদ্ধে পুণ্য বহুতর ॥

মুমীনে গরব 'কেনা' মনে না রাখিব।
চিত্তের পিষুন ধুই নিশিতে শুতিব ॥
থাউক মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে উত্তম।
করিব সালাম তারে হইয়া নরম ॥

১৭. জুয়া : কিন্তু মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীত ॥
একে বন্দিআল হএ মাগিয়া না পাএ।
আপনারে ক্ষুদ্র হেন জানিয়া খেলাএ ॥
সঙ্গে করি রক্ষক যদি সে খেলা খেলে।
প্রাণ রক্ষা পাএ খেলা জিনি ধন পাইলে ॥
দ্বিতীয় যাহার পরিবারে উপবাস।
কোন হেতু ভক্ষণের নাহি তার আশ ॥
খেলা খেলি জিনি যদি ধন কিছু পাএ।
তার পরিবারের জীবন রক্ষা হঁএ।
তৃতীয় জালিমে যদি দণ্ডন করএ।
না দিলে তাড়না পাএ বন্ধন পড়এ ॥
সর্বস্ব হরিল কিছু নাইক উপাএ।
খেলা জিনি ধনে যদি বন্ধন এড়াএ ॥
এই তিন জনের হালাল খেলা-বাদ।
অন্যবাদ করিলে পশ্চাতে পরমাদ ॥

১৮. দিনের শুভাশুভ :

শনিবারে বনপন্থে করিব আখেট।
সেদিনে শিকার সঙ্গে হএ বহু ভেট ॥
রবিবারে গৃহসজ্জা কৃষির বাগোয়ান।
আরম্ভএ কূপ পুষ্করণী অকল্যাণ ॥
গৃহ তেজি দূর গ্রামে কার্যহেতু যাএ।
সোমবারে অতি ভাল সিদ্ধি ফল পাএ ॥
মঙ্গলে খেউর কর্ম করে অমঙ্গল।
যেন শরীরের রক্ত পড়এ সকল ॥
বুধেত গোসল করে ব্যাধির ঔষধি।
রাজপাএ ভেটিবারে গুরুবারে সিদ্ধি ॥
শুক্রবারে স্নান করে ভুঞ্জি সুখ রতি।
পাএ বহু পুণ্য হএ উত্তম সন্ততি ॥
শনি মঙ্গলেত বস্ত্র পরে কিবা ফাড়ে।
নানা ব্যাধি সঙ্কট আসিয়া শীঘ্র ধরে ॥
তিন, অষ্ট, তের, অষ্টাদশ বিংশতিন।

অষ্টবিংশ, মাসে অমঙ্গল ছয়দিন।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হস্তে গণিয়া আসিব ॥

১৯. ৪০ প্রকারের সুখ :

একুণে চল্লিশ বারে শুন সাধু সত্যভাবে
চল্লিশ অবধি সুখরীত।
করিলে এসব কাম লক্ষ্মী নাই সেই ঠাম
তেহি না করিবা কদাচিত ॥
চল্লিশ ভিতরে বিভা সাধুলোকে না করিবা
করিলে মগজে ঘুণ ধরে।
বৃক্ষসার-গুণ-রাত, চল্লিশেত সুপূর্ণিত।
অপূর্ণ বীর্যের ফল মরে ॥
গোসল হাজত যবে, কিছু না ভক্ষিব তবে
তৃষ্ণা হৈলে খাইবেক জল।
ভগ্ন ঘট না রাখিব শূন্য ঘরে না শুতিব
বিনি বস্ত্রে না কর গোসল ॥
গৃহে যথ ভাণ্ড থাকে, না রাখি না রাখ তাকে
নারীর নাম ধরি না বোলাএ।
অন্যে অন্যে পতি নারী, কিবা পুত্র সুকুমারী
মা-বাপের নাম না ধরএ ॥
আদর বিহীনে জান, না ডাকিব কদাচন
পুত্র কন্যা কভু না শাপিব।
ভগ্ন রুটি ভিক্ষা দিব, পাইলে ভিক্ষুক সব
কভু তাহা কিনি না খাইব ॥
ইজার না পিন্দ উঠা পাগড়ী না বান্ধ বৈঠা
অযোগ্য গোপন ব্যক্ত করে।
দাণ্ডাই আউল কেশ সিতা না করিব পাশে।
ভাঙ্গা ফণী না রাখিব ঘরে ॥
কঠিস্থল অধদেশ লজ্জাস্থানে যেই কেশ
চল্লিশ দিনে তু না রাখিব।
না হাঁটিব বৃদ্ধ আগে না বসিব ঊর্ধ্বভাগে
সর্বকাষ্ঠে দন্ত না ঘষিব।
রসুন পিঁয়াজ ছাল পুড়িলে সে নহে ভাল
না রাখ মাটি জাল ঘরে।
যদি সে উকুন পাও জীববন্ত না ফেলাও
নামাযে আলস্য-সুখ হরে ॥
মিছাবাক্য প্রতিনিত না অভ্যাস কদাচিত

লজ্জাস্থলে দৃষ্টি না করিব।
দাউনে না মুছ মুখ আসিয়া ঘটিব দুঃখ
পিন্ধিরা বসন না সেলাইব ॥
ফযর গুজার যবে মসজিদ হন্তে তবে
শীঘ্রগতি বাহির না হৈঅ।
বিনি সূর্যোদয় হৈলে না সুতিঅ প্রাতঃকালে
ছিঁড়ি দন্তে নখ না কাটিঅ ॥
ফল-বিচি দণ্ডে ভাঙ্গি না খাও কৌতুক লাগি
দিব্য না করিও সত্য হইলে।
পরিবার ভক্ষ্য কষ্ট কৈলে হত লক্ষ্মী ভ্রষ্ট
ভক্ষেৎ কিবা হন্তে দুঃখ দিলে ॥
পতি-নারী অনুক্ষণ কলহ করিলে ক্ষণ
গৃহ হন্তে লক্ষ্মী দূরে যাএ।
কহিলুঁ চল্লিশ কথা যে হেন রতন গাঁথা
একচিত্তে রাখিবা হৃদএ ॥

২০. গর্ভপাত ও সঙ্গম :

গর্ভপাত রমণীর পারে করিবার।
যাবতে না হই থাকে জীবন সঞ্চার ॥
কিতাবে কহিছে জান দোষ নাহি তাএ।
কিন্তু যদি রাখএ অধিক পুণ্য হুএ ॥
রেমন সমএ কিবা অন্দরে বাহিরে।
নারী আজ্ঞা বিনু রূপে যাইতে না পারে ॥
নিজ নারী হএ, কিবা দাসী পরাঙ্গনা।
না লই নারীর আজ্ঞা যাইবারে মানা ॥
যদি দাসী সঙ্গম ঈশ্বর ইচ্ছা হএ।
কিতাবের কথা মিছা না জান নিশ্চএ ॥

ঙ.বাঙলার সূফি সাহিত্য

(১৯৬৯ সনে প্রকাশিত)

সুফিতত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্যকারের রচনা সংকলন : (১৬-১৮ শতক)

ভারতে তথা বাঙলায় সুফি মতবাদের বিভিন্ন শাখা ভারতীয় সাংখ্যযোগ-তন্ত্রের প্রভাবে স্থানিক ও লৌকিক রূপ লাভ করেছিল। অধিকাংশ সুফি ছিলেন অদ্বৈতবাদী এবং

দেহতত্ত্বরসিক। তাই তাঁরা ছিলেন যোগ-সাধনাপ্রবণ। বৌদ্ধ চতুষ্পদ্মে ও হিন্দু ষড়পদ্মে এবং ত্রিনাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুমা বা গঙ্গা-যুমনা-সরস্বতীতে আস্থা রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণভিত্তিক দেহচর্যাই এ পথে অধ্যাত্মসিদ্ধির উপায় বলে তাঁরা জানতেন।

ষোলো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান, সতেরো শতকের কবি শেখচাঁদ, হাজী মুহম্মদ, মীর মুহম্মদ সফী, শেখ জাহিদ ও আঠারো শতকের কবি শেখ মনসুর, আলিরজা প্রমুখ সুফিতত্ত্ববিদ কবিদের বক্তব্য-মূল এখানে বিধৃত হয়েছে। এঁদের বইগুলোর নাম জ্ঞানপ্রদীপ, হরগৌরীসম্বাদ, তালিবনামা, অজ্ঞাতকবির যোগকলন্দর, নূরজামাল, নূরনামা, সির্নামা, আগম ও আদ্যপরিচয়।

ভারতে বিভিন্ন সুফিমতের উপর স্থানিক প্রভাব পড়েছে প্রচুর। নকশবন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্ব ও যোগের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। তারাও স্বীকার করে কুণ্ডলিনী শক্তি। ষড়কেন্দ্রী দেহে ষড়রঙের আলো সন্ধান করা এবং সেই ষড়বর্ণের জ্যোতিকে বর্ণহীন জ্যোতিতে পরিণত করাই সাধনার লক্ষ্য। এটি শিবশক্তি মিলন-জাত আনন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের আদলে পরিকল্পিত।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বাংলা-পাক-ভারতে ক. চিশতিয়া, খ. কাদেরিয়া, গ. সোহরওয়ার্দীয়া ও ঘ.নকশবন্দিয়া— এ চারটি মতবাদই প্রধান। অন্যান্যগুলো এ চারটির উপমত মাত্র।

সুতরাং শাত্তারিয়া, মদারিয়া, কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি উক্ত চারটির যে-কোনো-একটির উপমত।

১. অদ্বৈতবাদ
২. সর্বেশ্বরবাদ
৩. দেহতত্ত্ব (কুণ্ডলিনী শক্তি)
৪. বৈরাগ্য
৫. ফানাতত্ত্ব
৬. সেবাধর্ম ও মানবপ্রীতি
৭. গুরু বা পিরবাদ
৮. পরব্রহ্ম ও মায়াবাদ
৯. ইনসানুল কামেল তথা সিদ্ধ পুরুষবাদ
১০. স্রষ্টার লীলাময়তা প্রভৃতি ধারণার বীজ বা প্রকাশ ছিল আরব, ইরানের সুফিতত্ত্বে।

ভারতের মাটিতে অনুকূল আবহে এসব প্রবল হতে থাকে সুফিতত্ত্বে। এখানে সুফিমতে স্থানিক প্রভাব লক্ষণীয়। ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতেও দেখা দেয় চিন্তাবিপ্লব। আমরা এদেশে ইসলামি প্রভাবের দু-চারটে নমুনা দিয়ে পরে দেশী প্রভাবের পরিচয় নেব মুসলিম জীবনে ও চিন্তায়।

"ভারতে একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড় দেশে নবীন ইসলামধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই! দক্ষিণ-ভারতে এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে।... ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন।.....

শঙ্করাচার্যের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং 'অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্কারাচার্যের পর রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য ও নিম্বাচার্যের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে, দেখা যায়....। ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমান বিচার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতির স্তরে নেমে এলেন।" [বিনয়ঘোষ]। এই মতই ব্যক্ত হয়েছে তারার্চাদের Influence of Islam on Indian Culture গ্রন্থেও।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও বলেন : "একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল, বাহির হইতেও আসিয়াছিল— উভয়ে মিলিয়া দশম-একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়।... তাহাদের (মুসলমানদের) একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচবোধ হইতেছে।" উত্তর-ভারতেও সন্ত ধর্মের উদ্ভব হয় মুসলিম প্রভাবে। রামানন্দ, কবির, নানক, দাদু, একলব্য রামদাস প্রমুখ কমবেশি মরমিয়াবাদই প্রচার করেছেন।

ভারতে এসে এদেশী ধর্ম, আচার ও দর্শনের প্রভাবে পড়েছিল মুসলমানরা। রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণের রূপকে বান্দা-আল্লাহর তথা ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, ভক্তি, প্রেম, বিরহবোধ কিংবা মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন মধ্য-উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা। কবির, এয়ারী, রজব, দরিয়া, কায়েম প্রমুখের গান তার প্রমাণ। বাঙলাদেশেও চৈতন্যোত্তর যুগে মুসলমানরা অধ্যাত্মপ্রেম বা হৃদয়াকূতি প্রকাশ করেছেন রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকের মাধ্যমে। সৈয়দ মর্তুজার ফারসি গজলে রাধা-কৃষ্ণ নেই, আবার নূর কুতুবে আলমের বাঙলা পদ্যে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের রূপক— এতেই বোঝা যায়, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় দেশী ভাষানুগ রূপক অবহেলা করেন নি তাঁরা। দেশজ মুসলমানের পূর্ব-সংস্কারবশে, চৈতন্যোত্তর যুগে রেওয়াজের প্রভাবে এবং ভাবসাদৃশ্যবশত সুফিতত্ত্বের রূপক হিসেবে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক মুসলিম মরমিয়ারা গ্রহণ করেছেন।

সুফিমতের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ লীলায়। তাই একেশ্বরবাদী ও অবতারবাদে আস্থাহীন মুসলমান কবিগণের কল্পনায় সাধারণত রাস, মৈথুন, বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি প্রশ্রয় পায় নি। কেবল রূপানুরাগ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক ও ব্যঞ্জক বলে। তাঁদের রচনায় অনুরাগ. বিরহবোধ এবং জীবন-জিজ্ঞাসাই (আত্মবোধন) বিশেষরূপে প্রকট।

সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপ। এ সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কবোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে—এটিই বংশী, আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে উপ্ত হয় আত্মসমর্পণব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা— এটিই অভিসার। এর পর সাধনায় এগিয়ে গেলে আসে অধ্যাত্মস্বস্তি—তা-ই মিলন। এরও পরে জাগে পরম আকাঙ্ক্ষা—একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা— এর নাম বাকাবিল্লাহ—এ-ই বিরহ।

বাঙলা-পাক-ভারতে সাধারণত ইসলাম প্রচার করেন সুফি দরবেশরাই। অধিকাংশ

মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর। পূর্বপুরুষের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কার মুছে ফেলাও পুরোপুরি সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে। সুফি সাধকের কাছে দীক্ষিত মুসলমানেরা শরিয়তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয় নি অশিক্ষার দরুন। কাজেই সুফিতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই অংশগ্রহণ করেছে মুসলমানেরা। বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ততন্ত্র, যোগ প্রভৃতি এভাবে করেছে তাদের আকৃষ্ট। এরূপে তারা খাড়া করেছে মিশ্র দর্শন। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন: "পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যত ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।— বাঙ্গালাদেশে ইসলামের সূফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। সূফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।" সুফিরা গুরুবাদী। শেখ, পির কিংবা মুর্শিদই তাঁদের পথপ্রদর্শক; এতে বৌদ্ধমতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। ফানা ও বাকাবাদী হোসেন বিন মনসুর হল্লাজ, বায়জিদ বিস্তামী কিংবা ইব্রাহিম আদহাম প্রভৃতি সুফিদের কেউ ছিলেন জোরাস্ট্রিয়ানের, কেউ জিনদিকের, কেউবা বৌদ্ধের বংশধর এবং জাতিতে ইরানি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পিরপূজা চালু হয় এভাবেই। হিন্দুর গুরুবাদও বৌদ্ধ প্রভাবিত।

ভারতে এসেই ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে পড়েছিলেন ইরানি সুফিরা। সুফিসাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেই তাঁরা শুরু করেন নতুন সুফিচর্যা। পাক-ভারতের মুসলিমের অধ্যাত্মসাধনা যোগ-দেহতত্ত্ববিহীন নয় এ-কারণেই। অতএব সঙ্গীত, যোগ, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতিই রচনা করেছে বাঙালি মুসলমানের অধ্যাত্ম তথা মরমিয়া সাধনার ভিত্তি।

মুসলমানদের বিশ্বাস, হযরত মুহম্মদ হযরত আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। আলী থেকে প্রাপ্ত হন সে জ্ঞান হাসান, হোসেন, খাজা কামিল বিন জয়দ ও হাসান বসোরী। এই কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসোরী (খ্রি. ৭২৮ পৃ.), রাবিয়া (মৃত ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহাম (মৃ. ৭৭৭) আর হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দাউদ তাই (মৃ. ৭৮১), মারুফ কার্কী (মৃ. ৮১৫) প্রমুখই সুফিমতের আদি প্রবক্তা।

পরবর্তী সুফি জুননুন মিশরী (খ্রি. ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সুফিমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন।

"আল্লাহ আকাশ ও মর্ত্যের আলোস্বরূপ। আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি।" [কোরআন] —এইপ্রকার ইঙ্গিত থেকেই সুফিমত এগিয়ে যায় বিশ্বব্রহ্ম বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে। যিকর বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে : "অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারকমাত্র।" সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্যলীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্যে বোধি তথা ইরফান কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সুফিদের করেছে বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহউস্ত' (সবই আল্লাহ) বা বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা 'সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম-বাদ'। এ-ই হল 'তোহিদ-ই-ওজুদী তথা আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'— এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপনের ভিত্তি।

বায়জিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরসানী (মৃ.১০৪৯ খ্রি.) প্রমুখ যুগের অদ্বৈতবাদী সুফি। শরিয়তপন্থ বিরোধী এসব সুফিদের অনেককেই প্রাণ হারাতে হয় নতুন মত পোষণ ও প্রচারের জন্যে। মনসুর হাল্লাজ, শিহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রমুখ শহীদ হন এভাবেই।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন : "ভারতে সূফি প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সূফি মতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে। খ্রিস্টীর একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফিমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সূফিমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্টছাপ দেখিতে পাই। তাঁর মতে ভারতীয় পুস্তকের আরবি ফারসি অনুবাদ, ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্য এবং আল-বিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল যোগ আর কপিল সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্যকারণ। বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধুদেশীয়) গুরু বু আলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।"

তিনি আরো বলেন : "(বাঙলা) দেশে সূফিমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সূফিমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গেই সূফি মতবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে এবং সূফি মতবাদ সাধনপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দুপদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে। চিশতীয়াহ ও সুহরবদীয়হ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতে আগমনের পর এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল।"

ভারতীয় যোগ-চর্যাভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সুফিরা গ্রহণ করলেন তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয়, নামত। কেননা, আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত রইল এই ইসলামি রূপায়ণ। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দীয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড়লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এঁদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর ঊর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর হয়ে ওঠে আলোকময়— এ হচ্ছে এক আলোকময় অদ্বয়সত্তা। এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় 'সামরস্য'-জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধি-চিত্তাবস্থার।

ভারতিক প্রভাবে, যোগীর ন্যায় প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল সুফির যিকর। বহির্ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে ইরানে সমরখন্দে, বোখারায়, বলখে এ ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দুপ্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতিবশে) অপরিহার্য হয়ে উঠল সুফি সাধনায়। সুফিমাত্রই তাই পির-মুর্শিদ নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনার ও সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই কবরপূজারও [দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর 'স্তূপ' পূজারই মতো হয়ে উঠল] রূপ পেল পরিণামে। আল্লাহর নামের প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পিরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন সুফিরা। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য যোগ্য হয় আল্লাহতে বিলীন হওয়ার সাধনার। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানাফিশশেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ'। প্রথমটি রাবিতা (গুরু সংযোগ), দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহর ধ্যান)। এই 'মুরাকিবাহ'য় গৃহীত হয়েছে যৌগিকপদ্ধতি। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই

চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পিরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দ'রা (আল্লাহর নামকীর্তনের আসর), হাল (মূর্ছা), সাকী, ইশক প্রভৃতি চিশতিয়া খান্দানের সূফিদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির আমল থেকেই। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও গৃহীত হয় এই রীতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় রয়েছে এরই অনুসৃতি।

বৌদ্ধতন্ত্র ভিত্তি করেই হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব। আবার হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বাঙালি সুফির যৌগিক কায়া সাধনের উদ্ভব। বাঙালি সুফিরা দুই কূল রক্ষার প্রয়াসে দেহতত্ত্ব ও সাধনচর্যার অসমন্বিত মিলন ঘটিয়েছেন। ফলে মোকাম, মঞ্জিল, হাল, সুফিতত্ত্ব প্রভৃতি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁদের চিন্তায়। বাঙলাদেশের বাইরে কলন্দর ও কবীরই প্রথম সমন্বয়কারী। তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যের হাতে বাঙলায়ও বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত আধ্যাত্মসাধনা শুরু হয়। এ প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ক. বৌদ্ধ চতুর্কায়ের আদলে তন লতিফু, তন কসিফু, তন ফানি এবং তন বকাউ কল্পিত।

খ. চার 'দীল'ও পরিকল্পিত হয়েছে : দীল আম্বরী (বক্ষের দক্ষিণাংশে), দীল সনুবরী (বক্ষের বামাংশে), দীল মুজাওয়ারী (মস্তকে), দীল নিলুফারী (উদর ও উরুর সন্ধিস্থলে)। এটিও বৌদ্ধ চার তত্ত্বের— আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের অনুকৃতি।
আবার হারিস, মারিস, মুকিম ও মুসাফির— এই চার রুহও হয়েছে কল্পিত। (তালিবনামা)

গ. হিন্দুর ষটচক্র এবং ষড়পদ্মও স্বীকৃত। বিশেষ করে মূলাধার মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রের বহুল প্রয়োগ সর্বত্র সুলভ।

ঘ. কুণ্ডলিনী ও পরশিব শক্তিকে এঁরা অভিহিত করেছেন জ্যোতি (লতিফা) নামে।

ঙ. আবার ষড়পদ্মের আদলে ষড় 'লতিফা'ও কল্পনা করা হয়েছে : কলব (হৃদয়, রুহ, আত্মা), সির্ (গুপ্তহৃদয়), খাগি (গুপ্তআত্মা), কসফ (বিবেকি আত্মা) ও নসফ (দুষ্প্রবৃত্তি)। এগুলো বিশেষ করে নকশবন্দীয়া খান্দানের পরিকল্পিত। রুহও চার প্রকার—
১ নাতকি
২ সামি
৩ জিসিমি ও
৪ নাসি। (মির্সামা)

চ. ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা) ও সুষুম্না (সরস্বতী) নাড়ি এবং প্রাণ-অপ্রাণ-বায়ুর (দমের) নিয়ন্ত্রণ ও উল্টাসাধনা এদের লক্ষ্য।

ছ. চক্রের অধিষ্ঠাত্রী বৌদ্ধদেবতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা, তারার মতো কিংবা হিন্দুতন্ত্রের চক্রদেবতা ব্রহ্মা-ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতির মতো চতুর্দ্বারের জন্যে জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও

আজরাইল— এই চার ফিরিস্তা প্রহরীরূপে কল্পিত।

জ. হিন্দুর মন্ত্রতন্ত্র, সঙ্গীতাদি প্রায় সব শাস্ত্র ও তত্ত্ব যেমন শিবপ্রোক্ত বলে বর্ণিত, তেমনি মুসলমানদের কাছে রসুলের পরেই আলির স্থান এবং সব ইসলামি গুহ্যতত্ত্বই আলিপ্রোক্ত।

ঝ. শরিয়ৎ-নাসুত, তরিকত-মলকুত, হকিকত-জবরুত, মারফত-লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি নাম রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু তত্ত্ব ও তাৎপর্যের পরিবর্তন ঘটেছে।

ঞ. অদ্বৈততত্ত্ব তথা সর্বেশ্বরবাদ সর্বত্রই স্বীকৃত এবং বাকাবিল্লাহ লক্ষ্যে সাধনাও দুর্লক্ষ্য নয়। 'হমহ্ উস্ত' (সবই আল্লাহ) বিশ্বাস এবং হাহুত (পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম অবস্থা) লক্ষ্যে সাধনায় বৌদ্ধ নির্বাণবাদ এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি লক্ষণীয়।

ট. আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ প্রভৃতিও হয়েছে সুফিদের যিকরের অপরিহার্য অঙ্গ। রেচক, পূরক ও কুম্ভক সুফিদের দম নিয়ন্ত্রণ চর্যার অঙ্গ।

ঠ. 'পিরবাদ' চালু হয়েছিল বৌদ্ধ গুরুবাদের প্রভাবেই। বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে সুফিসাধনায় পিরের উপর অপরিমেয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধ্যাত্ম সাধনামাত্রই গুরুনির্ভর। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ।

ড. প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধির অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা (গুরু সংযোগ), মুরাকিবাহ (আল্লাহ্‌র ধ্যান) তথা 'ফানাফিশশেখ' ও 'ফানাফিল্লাহ্' পরিকল্পিত।

ঢ. আল্লাহ্‌কে বৌদ্ধ 'শূন্য'-এর সঙ্গে অভিন্ন করেও ভেবেছেন কোনো কোনো সুফি সম্প্রদায় :

> দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
> তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
> নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
> সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
> শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
> যথাতে পরম হংস তথা যোগধ্যান।
>
> [জ্ঞানপ্রদীপ]

ণ. পরকীয়া প্রেমসাধনা তথা বামাচারী যোগসাধনাও কারো কারো স্বীকৃতি পেয়েছে:

> স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
> পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।
>
> [জ্ঞান সাগর]

ত. ঘর্ম থেকেই যে সৃষ্টিপত্তন তা সব বাঙালি সুফিই মেনে নিয়েছেন।

তুর্কি বিজয়ের পরে ভারতিক সুফিমতেরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে এই যোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিমসমাজে যোগ সামান্য আচারিক পার্থক্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এককথায়, অধ্যাত্মসাধনার তথা মরমিয়াবাদের ভিত্তিই হল যোগপদ্ধতি।

বৌদ্ধ সিদ্ধা, সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থি, হিন্দু শৈব, শাক্ত, মুসলিম সূফি ও হিন্দু-মুসলিম বাউলদের মধ্যে আজও তা অবিচল। বাঙলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, নাথ-গীতিকায়, গোর্খ সংহিতায়, যোগীকাচে, চৈতন্যচরিতে, মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপ বর্ণনে, আর যোগচিন্তামণি, বাউল গান প্রভৃতি গ্রন্থে ও রচনায় যোগ আর যোগীর কথা পাই।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, আলাউল, শেখ জাহিদ, শেখ জেবু, আবদুল হাকিম, শেখ চাঁদ, যোগ কলন্দরের অজ্ঞাত লেখক, আলিরজা, শুকুর মাহমুদ রমজানআলী, রহিমুদ্দিন মুনশী প্রভৃতিকে যোগপদ্ধতির মহিমা-কীর্তনে মুখর দেখি।

আজ অবধি আমরা প্রায় বিশটি সুফিশাস্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। যথা ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয়', অজ্ঞাতনাম লেখকের 'যোগকলন্দর', মীর সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ', ও 'জ্ঞান চৌতির্শা', হাজী মুহম্মদের 'নূরজামাল,' মীর মুহম্মদ সফীর 'নুরনামা', শেখচান্দের 'হরগৌরীসম্বাদ', ও 'তালিবনামা', আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম ভেদ' ও 'সিহাবুদ্দীন পীরনামা,' আলিরজার 'আগমজ্ঞানসাগর,' বালক ফকিরের 'জ্ঞান চৌতিশা, নেয়াজের 'যোগকলন্দর,' মোহসেন আলির 'মোকাম-মঞ্জিলের কথা,' শেখ মনসুরের সির্নামা,' শেখ জাহিদের 'আদ্যপরিচয়', শেখ জেবুর 'আগম', রমজান আলির 'আদ্যব্যক্ত,' রহিমুল্লাহর 'তনতেলাওত' ও সিহাজুল্লার 'যুহ্গীকাচ'।

শূন্যতত্ত্ব : দেখিতে না পারি যারে তারে বুলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
ইত্যাদি

এর সঙ্গে শেখ চান্দের তালিবনামা, আলিরজার জ্ঞানসাগর ও ফয়জুল্লাহর গোরক্ষ বিজয়ের শূন্যতত্ত্ব তুলনীয়।

দেহের প্রতীকী পরিচয় :শরীরের মধ্যে জান চারি চন্দ্র হএ
আদি নিজ গরল উন্মত নিশ্চএ।
শরীরের মধ্যেত অপূর্ব তিন পরী
শ্রীহাট, কামরূপ আর কনক পুরী।
হৃদেত কনকপুরী গ্রীবাএ যে বৈসে
কামরূপ গর্ভে তালুত শ্রীহাট প্রকাশে।
অজুদের চক্রের মধ্যে ঋতুর উদএ
স্বাধিষ্ঠান চক্রের মধ্যে বাবিত নিশ্চএ।
অনাহত চক্রেত শরৎ বৈসএ
বিশুদ্ধ চক্রেত সে শিরি প্রকাশএ।
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ঋত বৈসে
আজ্ঞা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে।

যোগতত্ত্ব : সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী।
চৌরাশী আঙ্গুল হেন সর্বলোকে ঘোষি।...
[স্ব স্ব আঙুলের মাপে দেহ ৮৪ আঙুল পরিমিত]
উরু হোন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
চক্ষু হোন্তে ভুরু মধ্য অর্ধ আঙ্গুল
এহি স্থানে জানিও যোগের আদি মূল।
নাভি স্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবা রাত্রি নীর বিন্দু বহে।
তালুমূলে ধেয়াইব পূর্ণসম ইন্দু
নাসিকাত ধেয়াইব দেখিয়া প্রাণ বন্ধু।

মুদ্রা : এখানে কহিব শুন মুদ্রা বিবরণ
প্রথমে কহিএ শুন মুদ্রা খেচরী
সর্ব-সিদ্ধি হএ যে রোগ পরিহরি।
সাপে খাইলে তবে সে নাহি বাহে
নিদ্রাতে না টলে বিন্দু কামিনী পাশএ।
তালুমূলে সুষুম্নার পদ্মের সন্ধান।
জিহ্বা তুলি দিব সেই বন্ধের স্থান।
তুলি দিলে জিহ্বাএ অমৃত লাজ পাএ
সে অমৃত পাকে যে অজর হএ কাএ।

মহামুদ্রা : প্রথমে বুক 'পরে চিবুক পড়িব
গুহ্যদ্বারে বামপদে দড় করি দিব।
দক্ষিণ পাও তুলি দুই হাতেত ধরিব
পিঙ্গলাএ পুরি বাউ কোষেত ভরিব।
যথাশক্তি কুম্ভকেত পিঙ্গলে রেচিব
কুম্ভকে পিঙ্গলাএ সমান করিব।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা যদি সমন্বয় হএ
তবে সেই মুদ্রা যেন এড়িতে জুয়াএ।
ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার।...
জলকুণ্ড কুম্ভজল একহি মিলন।...
নির্মল উঝল সেই শুদ্ধ সুধাকর
নিশ্চয় সে রূপ বৈসে সভার অন্তর।
ঢেউ জল জল ঢেউ নহে ভিন্নকার
তেলএ বাবিত যেন বৈসে হতাশন
তনু মধ্যে তেনমতে আছে নিরঞ্জন।
তনু মধ্যে সহস্রদলেত বৈসে নিত
তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।

থাবর জঙ্গম যথ বৈসে সর্বঠাম
থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম।
দিশিনিশি রবি শশী নাহি স্থান স্থিত...
দিশিনিশি আপেত আপনা লক্ষণ...
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন
প্রেম রসে মগ্ন হই করে নিরীক্ষণ।

—হরগৌরী সম্বাদ ও তালিবনামা স্মরণীয়।

বিন্দুবিন্দু নাদ বিন্দু নহে ভিন্না ভিন।

—শুক্রই ব্রহ্ম কৃষ্ণ, হেবন্দ্র প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতিধ্বনি রয়েছে এই চরণে।

গুরু : ভজহ গুরুর পদ বুঝি আপনার
ভ্রম ভাঙ্গি যেই কহে সেই গুরু সার।

অদ্বৈতসিদ্ধি : মিলাও জীবেতে জীব তেজি আপনার।
জগত জীবন ব্রহ্মা মহাশিব কর
যত্ন করি রহিয়াছে সবার অন্তর।
রবির কিরণ কিবা কহিবারে নারি
রবি হোন্তে ভিন্ন তানে বুলিতে না পারি।
লখন অলখ লখ লই তার নাম
লীন হই সর্বত্রে আছএ সর্বঠাম।
বাউত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ।

সহস্রার : সহস্রদলে গুরু শতদলে শিষ
ষট চক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।
সহস্র দলত রঙ্গি দেখি সর্বময়।
সূর্যের দৃষ্টেত যেন চন্দ্রের উদয়।

গুরুসাধন : শ্রুতি নাসা দিঠে জান শিষ্য হেরে তিন
শক্তি বিন্দু ইচ্ছা কার্য গুরুর অধীন।

বায়ু : সম্পূর্ণ আছএ বাবি নাভিকুণ্ড পাইয়া
সরএ নাসিকা নালে সরএ দধিয়া।

শিবশক্তি : শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্ন মাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম।

ক্ষেমা (সংযম) : ক্ষেমা হোন্তে ধিক জান নাহি পৃথিবীতে
ক্ষেমা তপ জপ হৈলে আত্ম হিতহিত।

জীবে ব্রহ্ম : হীনজন দেখিয়া না কর হীন জ্ঞান
হীনেত আছএ জান পুরুষপুরাণ।

—এই তত্ত্ব, এই আচার, এহেন ধর্মই বাংলার প্রাচীনতম ধর্ম, আচার ও দর্শন। আমাদের বাউলেরা বাংলার এই প্রাচীনতম তন্ত্র ধর্মেরই ধারক এবং বাহক।

শুক্র রহস্য : চন্দ্র-সূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস।

শূন্যতত্ত্ব : অষ্টকলে তালি দিয়া রহত আনন্দে।
অনাহত শব্দ উঠে অষ্ট কলে সাজে
অষ্টগণ করি মুখ্য মধ্যে মধ্যে বাজে।
শূন্যময় করতার শূন্যে বান্ধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যে আয়ু শূন্যে বায়ু শূন্যে মোর মন
আকল ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন।
শূন্যে দম শূন্যে খোম শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জীউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা।

[কবি বলেন, সাধনার দ্বারা "কায় সিদ্ধি হৈলে তবে তরিব যে ভবে।"]

শূন্যতত্ত্ব : সংসারে ফকির শূন্য শূন্যরূপে শূন্য নাম
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
যে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই যে যুগল
যে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।
[আলিরজা]

উল্টা সাধনা : পিরীতি উল্টা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জীয়ে সংসারে।
[আলিরজা]

সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ।

কবির মতে,

প্রভুর গোপনতন্ত্র আছিল গোপনে
সেই রত্ন মোহাম্মদ জানাএ আলি স্থানে।
সে রত্ন প্রভাবে হৈল যোগিগণ সব

এবং

শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যকার
রূপের সাগরে সিদ্ধি যথ বনিজার।
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর

দেহে আছে

ষট পদ্ম ষষ্ঠ চক্র ষষ্ঠ ঋত গতি
যথা চক্র তথা পদ্ম ঋতুর বসতি।
মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র অনাহত
আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান এই চক্র ধুলি ঋত।
শ্রীগোলার হাটে তথা সত্যানন্দ রাজার
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেয় পশার।
সর্বভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন নর নহে নর সমতুল
প্রভু হন্তে বিচ্ছেদ না হএ নর-কুল।

কেবল

কায়া সঙ্গে জীবাত্তমা সতত মিশ্রিত
পরমাত্তমা মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত।

আর

কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন
অনাহত শব্দ কহে যে ধ্বনির নাম
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম।
সে হুঙ্কার মূলেত পরম তত্ত্বসার
তার পরে যোগসিদ্ধি পন্থ নাহি আর।

সাধনতত্ত্ব :

শব্দ স্থির হএ যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন।

পরকীয়াসাধন :

স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।

যোগই হচ্ছে একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি পন্থ। তাই—

যোগ বিনু পুণ্য বলে স্বর্গ যদি পাএ।
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ।

আর,

লাহুত মোকাম কিছু পাইলেক যবে
বাক্যসিদ্ধি কেরামত হএ তার তবে।

দ্বৈত-অদ্বৈত তত্ত্ব :

জাত সিফত ছিল গোপত ভাণ্ডার
জাত হোন্তে সিফত হইল পরচার।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন হইল জাহির।
জাত সিফতে সেই নূর অনুপাম
নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম।
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা
সেই নূর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা।
এক হোন্তে হৈল দুই দুই হোন্তে সকল

মূলত সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন :

বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ— এই তিন নাম হএ
একে হএ তিন জান তিনে এক হএ
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহো ভিন্ন নহে।

কিন্তু,

তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ।
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়
তেন রূপে জানিঅ যে বান্দা আর খোদায়।
দরিয়ার পানি যেন গৌরসে উথলে
গৌরসে দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে।
সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
সেই সিন্ধু উথলিলে গৌর নাম হএ।
তেনরূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে।
বান্দা হীন নামমাত্র আপনে সকল
গৌর হেন নামমাত্র হএ সর্ব জল।

কাজেই,

তুহ্মি আহ্মি নামমাত্র সকল সেই সে
নানারূপে করে কেলি নানান যে বেশে।

ব্যক্ত অব্যক্ত আপে ব্যাপিত সর্বঠাম
বাসনা করিয়া মাত্র রাখিয়াছে নাম।

এবং, জলস্থল অন্তরীক্ষে যথ চলাচল
আপনে করন্তি খেলা সৃজিয়া সকল।
পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ।

যদি 'আল্লা হোন্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে।' তবে কেন 'বান্দার পীড়নে সে আল্লারে না পীড়এ।'— এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন :

ঢেউ আর সাগর একই পানি হএ

কিন্তু, ঢেউ মৈলে কভু সাগর না মরএ।
তেনমত জানিঅ বান্দা আর খাদাএ।

কিংবা, গাছ আর ফল যেন হএ এক কায়
তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নহে।
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
বান্দার দুঃখেত কভু খোদা দুঃখী নহে।
বান্দার আজারে কভু খোদা না পীড়এ
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরএ।

খোদা আর বান্দা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন।

তাই, আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ
জন্ম মৃত্যু নাহি তান আওনা গমন।

চ. সঙ্গীতশাস্ত্র

মধ্যযুগের রাগ-তালনামা (মৎ-সম্পাদিত ও প্রকাশিত)

বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রকারের রচনার সংকলনগ্রন্থ (১৭-১৯ শতক)

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ, সুলতান-সুবাদার, শাসক-সামন্তের প্রতিপোষণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সঙ্গীতে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু বাঙলায় দেশী রাজা-বাদশাহর

কতকটা অভাবে এবং বিশেষ করে সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য ও শাসনকেন্দ্র উত্তর-ভারতের প্রবল প্রভাবে দেশী-সঙ্গীতের কদর করবার লোক ছিল না এদেশে। তাই বাঙলাদেশে দেশী-সঙ্গীত ছিল অবহেলিত। তবু অগণিত গণমানব একেবারেই বঞ্চিত ছিল না। দেশী ভাষায় গান বেঁধে সুর আরোপ করে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সাধনা করেছিল তারা। তারই সাক্ষ্য রেখে গেছেন দেশী সঙ্গীতবিদরা তাঁদের রচিত রাগ-তাল ও গানের মাধ্যমে। ষোলো-সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকে ফয়জুল্লাহ, আলাউল, দানিশকাজী, আলিরজা, বখশ আলি, তাহির মাহমুদ, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, চম্পাগাজী, চামারু, সাগর আলি, মুজাফফর, দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামতনু, দ্বিজ ভবানন্দ প্রমুখ অনেকেই রাগ-তালের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

মধ্যযুগের রাগ-তালনামা

মধ্যযুগের গোটা পাক-ভারতব্যাপী যখন সঙ্গীতচর্চার বান ডেকেছে তখন বাঙলার অবস্থা কী? বাঙলাদেশের কোনো অবদানের কথা তো শুনতে পাইনে। একমাত্র 'লালাবঙালী' ছাড়া কোনো বাঙালির নামও মেলে না। এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আমাদের অনুমিত কারণগুলো এই : এক. ফারসির পরেই উত্তর-ভারতীয় ভাষাই দরবারি মর্যাদা ও Lingua Franca হবার সুযোগ পেয়েছে। সেজন্যে সে-ভাষাতেই সঙ্গীতকলার অনুশীলন হয়েছে। সে-ভাষায় অনধিকারী প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালির পক্ষে যানবাহন-বিরল সে-যুগে নতুন সঙ্গীতকলা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি। দুই. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সঙ্গীতের অনুশীলন ও উৎকর্ষের মূলে রয়েছে বিভিন্ন দরবারের প্রতিপোষণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে বাঙালি বাদশাহ ছিল না কখনো, কাজেই বাঙলাভাষায় সঙ্গীতসাধনার অনুকূল পরিবেশ কখনো গৌড়-সুলতানের দরবারে সৃষ্ট হয় নি এবং সামন্তদের অধিকাংশও ছিল অবাঙালি। তিন. বাঙলাভাষা লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বিকশিত হবার মুখেই ধর্মান্দোলন শুরু হয়। ফলে তাঁদের সাধন-ভজন ও কীর্তনের জন্যে বিশেষ ধরনের গান রচিত হতে থাকে। সে-স্রোতে অবৈষ্ণবও গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। নইলে গানের দেশ বাংলায় কালোয়াত জন্মাবে না কেন! তবু যে-দেশের লোকের ঘটে ঘটে সতেজ প্রাণ এবং গোলায় গোলায় ধান না থাকলেও গলায় গলায় গান রয়েছে; যে-দেশে সহজিয়া, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, ঝুমুর প্রভৃতি সঙ্গীতের প্লাবন বয়ে গেছে; সে-দেশে কেন যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, বড় বড় কালোয়াত, সঙ্গীতশাস্ত্রকার এবং রাগ, তাল ও বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবকের আবির্ভাব ঘটে নি, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

তাই বলে বাঙালি সঙ্গীতবিমুখ ছিল না। দেশী-বাদশাহ্-বিহীন ও সামন্তবিরল হয়েও তারা সাধ্যমতো এক্ষেত্রে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। বাঙলার হিন্দুগণ সংস্কৃতে সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, বাঙলায়ও কিছু কিছু করেছেন। মুসলমানেরা এ বিষয়ে সংস্কৃতে ও ফারসিতে কোনো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কি না, সে সন্ধান কেউ করেন নি। কিন্তু তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে বাংলায় বহু রাগ-তালের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে মধ্যযুগে যে নতুন জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য ও রসতৃষ্ণা উত্তর-ভারতে সুরের অন্বেষায় রসিকগণকে আকুল ও একাগ্র-সাধনায় নিমগ্ন করেছিল, সে-রেনেসাঁস বাঙালির হৃদয়কে উদ্বেল করে নি। বাঙালির প্রাণের ঐশ্বর্য তখন বৈষ্ণব ও সুফি আন্দোলনের মাধ্যমে ভাগবত উৎকণ্ঠার নিবৃত্তিসাধনে তৎপর ছিল এবং সেভাবেই ব্যয় হয়েছে।

এছাড়া উপায়ও ছিল না। পার্থিব সম্পদে বঞ্চিত হয়ে, অপার্থিব ধনে ধনী হওয়ার মানস-প্রয়াস না করলে চলত না, জীবনে তো একটা অবলম্বন চাই। কাজেই আমাদের সংগীতকলা নতুনের স্পর্শ বিশেষ পায় নি, প্রায় গতানুগতিক ধারাতেই চলছিল। তারই প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে রাগ-তালের নানা গ্রন্থে। তবু সূর্য উদয় হলে যেমন তার রশ্মি ছিদ্রপথেও প্রবেশ করে, তেমনি আমাদের সঙ্গীতকলায়ও সৃষ্টির অঙ্কুর মাঝেমধ্যে দেখা গেছে। তার প্রমাণ পাচ্ছি কিছু কিছু মিশ্র রাগ-রাগিণীতে— যা ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর অতিরিক্ত— যেমন ধানসী-বেগরা, ধানসী-দীপিকা, ধানসী-কেদার, ধানসী-দ্রৌপদী, তিবরিয়া-ধানসী, দিগর-ধানসী, ধানসী-বেরুণী, মালসী-বেরুণী, দিগর-মালসী, দিগর-রামসিয়া, দিগর-আশাবরী, বেরুণী-সিন্দুরা, গৌড়সিন্দুরা, দিগর-গৌড়সিন্দুরা, করুণা ভাটিয়াল, নাগোধা-ভাটিয়াল, আকুমারী-ভাটিয়াল, রাগজালালী, দেওগিরি রাগ, কল্যাণ-জালালী, তুড়ি গুঞ্জরী-কেদার, কামোদ ভাটিয়াল, পরছ কামোদ, রাগ পরছ, কহু-কৃপালি, পঞ্চম সিন্দুরা, তুড়িপরছ, তুড়ি কেদার, তুড়ি গুঞ্জরী কেদার, তুড়ি-গোড়ী আসোয়ারী, রাগ সারাঈ, সৃহি সারাঈ, সৃহি সিন্দুরা, সৃহি বেলোয়ার, বেউরপূরী ভাটিয়াল, ভাক্কা কামড়া, ভাটিয়াল বৈরাগী, নট-গান্ধার, শ্রীগান্ধার, গান্ধার পঞ্চম ইত্যাদি আরো কয়েকটি।

সুফি সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই মুসলিমসমাজে সংগীতকলার চর্চা প্রতিষ্ঠা পায়, আর সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রই তাঁদের আদর্শ ছিল। সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রে সংগীতের পৌরাণিক উদ্ভব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। সংগীতও শিবপ্রোক্ত। তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা-নারদ-ইন্দ্রসভা, সঙ্গাপাখি, বানর প্রভৃতি হয়ে মর্ত্য-মানুষের কাছে এসেছে নারদ, ব্যাস, কর্ণ, মতঙ্গ, সোমেশ্বর, কল্লিনাথ, ভরত, দণ্ডিল প্রমুখ ঋষি-রসিকের আগ্রহে ও অনুশীলনে। এঁদেরকে জড়িয়ে সঙ্গীতকলার উদ্ভব সম্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী গড়ে উঠেছে। মুসলমান সংগীততাত্ত্বিকবর্গ এই কথা-অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন তো বটেই, তাতে আবার জাত্যভিমানের অপবুদ্ধিবশে সঙ্গীতকলার ইসলামি উদ্ভব কল্পনা করতে যেয়ে, এক হাস্যকর খিচুড়ি-তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। যেমন আলি রজা বলেন :

> (শঙ্কর) গোপ্ত ব্যক্ত মহামন্ত্র রসুলের হোতে।
> চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র করিলা জগতে ॥
> বহু বহুকাল সেই আছিল গোপেত।
> ভাবিনী ভাবক হই শঙ্কর সাক্ষাতে ॥

তারপর,

> শঙ্কর প্রণমি নবী মর্ত্যেতে আসিল।
> বেকত সকল কথা সভাত কহিল ॥

—-কিন্তু একদিন আলির অনুরোধে নবী গুপ্ততত্ত্ব ও মন্ত্র আলিকে না দিয়ে পারলেন না। আলি সে মহামন্ত্রের তেজ সহ্য করতে না-পেরে নবীর পরামর্শে গভীর অরণ্যে মন্ত্র রেখে-এলেন।

এদিকে,

> মন্ত্র শুনি কম্পি গিরি বহে জলধার।

মহাজলাকার হৈল জঙ্গল ভিতরে।
সে জল খাইল যথ বনের বানরে।
জলপানে হনুমানে মহামত্ত হইয়া
লক্ষিবারে লাগিলেন্ত বৃক্ষেত উঠিয়া।
লাফাইতে বৃক্ষাঘাতে যথ হনুমান।
উদর ছিঁড়িয়া কথ তেজিল পরাণ।

কিন্তু গাছে গাছে বানরের 'রগ' (শিরা, নাড়ি) সব রহে টানা দিয়া' এবং যখন বসন্ত ঋতু এল, আর—

সে রগে লাগিল যদি মলয়া বাও
কহিতে লাগিল তাল যন্ত্র রাও।
বসন্ত সমীর সেই রগেতে লাগিল
ঋতু রাগ তাল নানা যন্ত্র নিঃসরিল।
দগর, নাগর (নাকাড়া) ঢোল কথ বাদ্যধ্বনি
রবাব, দোতারা, বংশী, সানাই বেগুনি।
ভেত্তর কন্নাল যথ রস বাদ্য রঙ্গ
পিনাক ডম্বুর বেনু কর্তাল মৃদঙ্গ।
নহবত ঝাঞ্ঝরি বাদ্য যথেক সংসারে
ব্যক্ত কৈল হনুমান হোন্তে করতারে।
রাগতাল গোপেত আছিল হরপাশ
হনুমান হোন্তে হৈল সংসারে প্রকাশ।

তারপর,

আর দিন নবী কহে মর্ত্তুজার ঠাঁই
মন্ত্র যথা ছাড়ি দিছ দেখ তুমি যাই।
নবীর আদেশে আলি যেই বনে গেল
ঋত রাগ যন্ত্র তথা বাজিতে দেখিল।
নানা রাগ যন্ত্র দেখি মহানন্দ আলি
সকল শিখিল শাহা হৃদয়ে আকলি।
সারিন্দা করিল মৃত কপি অঙ্গ আনি
বানরের চর্মে দিল সারিন্দার ছানি।
বানরের রস দিয়া রবাব সাজায়
সারিন্দার মন্ত্র শাহা প্রথমে শিখিল
পাছে রাগ তাল সব অভ্যাস করিল।

বিধৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহই শঙ্কর বা শিব। তিনি হযরত মুহম্মদকে বেদাদি চতুর্দশ গুপ্তব্যক্ত শাস্ত্রে ও মন্ত্রে জ্ঞান দান করেন। হযরত আলি এ জ্ঞানের উত্তরাধিকার পান এবং তাঁর অক্ষমতায় ও হনুমানের আত্মদানে রাগতাল বসন্তসমীর সহযোগে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। এবং নর-মধ্যে আলিই আবার আদি সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীত-যে ভাগবত উৎকণ্ঠার

তথা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা নিবৃত্তির ও সাধনার বাহন তাও আলি রজা স্পষ্ট করেই বলেছেন—

আলি হোন্তে সে সকল সন্ন্যাসী ফকিরে
শিখিল সকল যন্ত্র রহিল সংসারে।
ভাবের বিরহে সব শান্ত হৈতে মন
রাগতাল কৈল প্রভু সংসারে সৃজন।
গীততন্ত্র শুনি মহামুনি ভ্রম যাএ
সর্ব দুঃখ দূর হয় গীত যন্ত্র রাএ।
গীতযন্ত্র মহাযন্ত্র বৈরাগীর কাম
রাগযন্ত্র মহাযন্ত্র প্রভুর নিজ নাম।
জীববন্ত যথ আছে ভুবন ভিতর
সর্বধর্মে সর্বঘটে গীতের সুস্বর।
ঘটে গোপ্ত যন্ত্রগীত যোগিগণে বুঝে
তেকারণে সর্ব জীবে সে সবারে পূজে।
গীতযন্ত্র সুস্বর বাজায় যে সকলে
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তার মেলে।
শুদ্ধভাবে ডুবি নৃত্য করে যেই জনে
গীত রসে মজি প্রভু থাকে তার সনে।

অপর একজনও বলেন—

কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার
রাগযন্ত্র নাদ সব ঘটে আপনার।
অষ্টাঙ্গ তনমধ্যে আছএ যে মিলি
তনান্তরে মন-বেশী করে নানা কেলি।
মোকামে মোকামে তার আছএ যে স্থিতি
ছয় ঋত তার সঙ্গে চলে প্রতিনিতি।
রাগ ঋত অন্ত যদি পারে চিনিবার
জীবন মরণ ভেদ পারে কহিবার।
কিবা রঙ্গ কিবা রাগ কিবা তার রূপ
ধ্যানেতে বসিয়া দেখ ঘটে সর্বরূপ।

মুসলিমসমাজে সঙ্গীতচর্চা-যে সূফিপ্রভাবেরই ফল, আমাদের সে অনুমান উক্ত চরণ কয়টির দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হল।

রাগের বই 'রাগনামা' বা 'রাগমালা', তাল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম 'তালনামা' বা 'তালমালা' এবং রাগ ও তালের মিশ্রগ্রন্থের নাম 'রাগতালনামা' বা 'মালা'। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে ১৯খানি 'রাগনামা' বা 'রাগমালা', ১৩খানি 'রাগতালনামা' রয়েছে। এগুলো ছাড়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছে ও বাঙলা একডেমী'তে কয়েকখানি রাগ ও তালের পুঁথি রয়েছে। এসব গ্রন্থের রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী

হিন্দু ও মুসলমান। মধ্যযুগে চট্টগ্রামে সঙ্গীতের বিশেষ অনুশীলন হয়েছিল এবং বহু মুসলমান সংগীতচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এসব মুসলমান সাধারণ্যে 'পণ্ডিত' নামে পরিচিত হতেন, তাঁরাই দেশের স্বস্ব মণ্ডলীতে সঙ্গীতবিদ্যা শেখাতেন। চট্টগ্রামে নমঃশূদ্র শ্রেণীর হাড়ি ও ডোমেরাই সাধারণত বাদ্যকার পেশা নিয়ে থাকে। উক্ত 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী মুসলমান সঙ্গীতবিশারদরাই এসব হাড়ি-ডোমদেরকে গান-বাজনা শেখাতেন। চট্টগ্রামে এরূপ বহু পণ্ডিতের নাম আজও লোপ পায় নি। চম্পাগাজী পণ্ডিত, কমর আলী পণ্ডিত, জীবন পণ্ডিত, বখশআলী পণ্ডিত, ওয়ারিশ পণ্ডিত, পরাণ পণ্ডিত, ফাজিল নাসির মুহম্মদ পণ্ডিত প্রমুখ আজও লোকস্মৃতিতে বিদ্যমান রয়েছেন; এঁদের কেউ-কেউ সংগীতগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

রাগতালনামাগুলো প্রায়ই সংকলনগ্রন্থ। একেক রাগ-রাগিণীর দৃষ্টান্তস্বরূপ যেসব পদ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলো নানাজনের রচনা তো বটেই; আবার রাগ-রাগিণীর ধ্যান, ভাষা ও নানা বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে উৎকলিত। তবে ফাজিল নাসির মুহম্মদের 'রাগমালা' এবং আলি রজার 'ধ্যানমালা' এসবের ব্যতিক্রম। এঁরা ধ্যানের ভাষ্য রচনায় আর কারো সাহায্য নেন নি, তবে দৃষ্টান্তচ্ছলে পদ বা গান উদ্ধৃত করেছেন নানা কবির।

রাগমালাগুলোতে প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর পরিচয় প্রসঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকে ধ্যান ও পরে বাংলা পয়ারে তার তর্জমা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন্ সংস্কৃত সংগীতগ্রন্থটি আদর্শরূপে চালু ছিল, তা জানবার উপায় নেই। তাই আমাদের রাগমালাগুলোর ধ্যান 'সঙ্গীত রত্নাকর', 'সঙ্গীতপারিজাত' প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতিক গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ খুব কমই মুদ্রিত হয়েছে। যে-কয়টি মুদ্রিত হয়েছে, তাদেরও সব কয়টি এখানে পাওয়া গেল না। স্বভাবত সবাই সঙ্গীতপ্রিয় হলেও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় লোক 'লাখে না মিলএ এক'। তাই বড় বড় গ্রন্থাগারেও সঙ্গীতশাস্ত্রগ্রন্থ দুর্লভ। এ কারণে এদিককার পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তালের ধ্যান এবং তাল নির্দেশও আছে।

আজ অবধি আবিষ্কৃত রাগমালাগুলোতে যে-কয়জন সঙ্গীতশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া গেছে, তাঁরা হচ্ছেন : ষোলো শতকের মীর ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের আলাউল, আঠারো শতকের ফাজিল নাসির মুহম্মদ, কাজী দানিশ, আলি রজা, চম্পাগাজী, বখশ আলী মুজফফর, তাহির মাহমুদ, দ্বিজ রঘুনাথ, পঞ্চানন, ভবানন্দ তনু, দ্বিজ রামতনু, রামগোপাল, মুহম্মদ পরাণ, চামারু [ইনি সৈয়দ সুলতানের নবী বংশের এবং ফাজিল নাসিরের রাগমালার লিপিকার], গুল মুহম্মদ খলিফা এবং আকবর শাহ পণ্ডিত। এবং সম্ভবত উনিশ শতকের দেবান আলি, সন্তু খাঁ, মুহম্মদ আজিম, জীবন আলি, মুহম্মদ নকী, সাগর আলী, আমজাদ কাজী, মুহম্মদ শাহ ফকির এবং বিশ শতকে আব্দুল ওহাব সংগীতশাস্ত্র সংকলন করেন। তাঁর ছাপাগ্রন্থের নাম 'সৃষ্টি পত্তন রাগনামা শত ময়না' [সৃষ্টি পত্তন রাগনামা সতীময়না]। এতে সতীময়না ও রত্নামালিনীর উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্বলিত 'বারমাসী' নানা রাগের দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের উক্তরূপ নামকরণ সেজন্যেই।

প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ [১৬ শতক]

ক. ইউসুফ-জোলেখা
(১৩৯১-১৪১০খ্রিস্টাব্দ)
শাহ মুহম্মদ সগীর বা সগিরী

কোনো দেশ-কালের প্রেক্ষিতে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা অতিবড় জ্ঞানী-মনীষীর পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। দেশে-কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বহুমুখী মানস-শিকড় দিয়ে মানুষ আহরণ করে জীবন-রস। তার মন-মননের পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ। কখন কোন্ বিশ্বাস-সংস্কার, আদর্শ বা অভিপ্রায়ের প্রেরণায় মানুষের কোন্ ভাব, চিন্তা বা কর্ম অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া সমকালের সব পরিবেশ, ঘটনা, আচার সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। তাই জীবনের সর্বতোমুখী চেতনা কোনো এক মানুষের চিন্তায়, কর্মে কিংবা আচরণে ধরা দেয় না।

এ-যুগেও পরিবেশ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন মহৎ শিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাজনীতিকের রচনায় সমকালীন জীবনের ও ঘটনার সব খবর মেলে না। মনের প্রবণতানুসারে তুচ্ছ ঘটনাও কারো গুরুত্ব পায়, আবার গুরুতর বিষয়ও পায় অবহেলা। তা ছাড়া দৃষ্টি আর বোধেও রয়েছে মাত্রাভেদ। জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করতেও পারে না কেউ। বিদ্যা-বুদ্ধি, বোধি-প্রজ্ঞা, বিশ্বাস-সংস্কার-আদর্শ-নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানাকিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি ও বোধ নিয়ন্ত্রিত। কেউ অনপেক্ষ নয়, সবারই তাই রয়েছে রঙিন চশমা এবং আপেক্ষিক বোধ ও বিচারপদ্ধতি। মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ-সংস্কৃতির যা-কিছু চিত্র মেলে সবটাই আদর্শায়িত। রাজপুত্র-রাজকন্যার রূপকথাভিত্তিক কাব্যে নিম্নমধ্যবিত্ত কবি কল্পনার সাহায্যেই রাজৈশ্বর্য ও রাজকীয় উৎসব-পার্বণ-অনুষ্ঠানাদি বর্ণনা করেছেন। তাই এসব রচনায় সর্বস্তরের মানুষের জীবন-জীবিকার বাস্তবচিত্র মেলে না। তবু যেহেতু বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা লোকশ্রুত জ্ঞান

সম্বল করেই কবি কল্পনায় ত্রিভুবনে বিচরণ করেন, সেহেতু ফাঁকে-ফুকরে বাস্তবের আদল থেকেই যায়। যেমন মণিমাণিক্য হীরা-জহরতের না হোক, কবি স্বচক্ষে সোনা-রুপা-পিতলের অলঙ্কার দেখেন; সোনার পালঙ্ক না হোক, কাঠের তক্তপোশ তাঁর অদেখা থাকে না। রাজভোগ চোখে না দেখলেও উচ্চবিত্তের মহাভোগও অজানা থাকে না।

শাহ্ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যপ্রণেতা। তাঁর কাব্যের উপক্রমে একটি রাজপ্রশস্তি মেলে :

তৃতীএ প্রণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর।
রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নৃপ ধার্মিক বিদিত।
মনুষ্যের মধ্যে যেহ্ন **ধর্ম** অবতার
মহানরপতি **গ্যেছ** পৃথিম্বির সার।
'ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজ আপনা বিজয়
পুত্র শিষ্য হন্তে তিঁহ মাগে পরাজয়।'
—মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিয়া
লইলেন্ত রাজ্যপাট **বঙ্গাল**-**গৌড়িয়া**।
রমণীবল্লভ নৃপ রসে অনুপমা
কনে বা কহিতে পারে সে-গুণ মহিমা।

এই অংশের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিদ্বানেরা শাহ মুহম্মদ সগীরকে (সগিরী?) সুলতান সিকান্দর শাহর পিতৃদ্রোহীপুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর (১৩৯১-১৪১০) কর্মচারী ও সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তার কাব্যে আল্লাহ বা স্রষ্টা অর্থে ধর্ম বহুলব্যবহৃত হয়েছে, এও প্রাচীনতার তথা বৌদ্ধপ্রভাবের নিশ্চিত নিদর্শন। কাব্যখানির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

বন্দনা : ১. করিম সত্তার পরবাদিগর দেবতা মনুষ্যরূপ সৃজিলা জগত
আপনার ইচ্ছাহে যেই করে ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান মহাধ্যান তদন্তরে যথ।

অন্যত্র : ব্রহ্ম/নিরঞ্জন/ঈশ্বর/ধর্ম/পুরুষ পুরাণ ব্যবহৃত।
২. দেবধর্ম আরাধি বহুল পুণ্য ফলে।
৩. ধর্মরূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল।
৪. ধর্মকে স্মরিয়া কন্যা হৈলো দণ্ডবৎ
৫. কুম্ভ 'পরে বলিলেন্ত ধর্ম অনুমতি।
৬. ধর্ম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারিদিক
ধর্ম আজ্ঞা হৈলা তুহ্মি রাজ্য অধিকারী
৭. ধর্মপদ স্মরি করে সত্বরে গমন
৮. ধর্ম আজ্ঞা তোহ্মার পূরিব মনস্কাম।

৯. ধর্মপদে ইউসুপ মাগন্ত যেহি বর
ততক্ষণে সেহি বর পাইলা সত্বর।

১০. মনে মনে ধর্ম আরাধন

১১. ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।

১২. বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাএ।

১৩. তোহ্মপুত্র কর্মে যে লিখিছে ধর্মে

১৪. ধর্ম ভাবি রহ মন।

১৫. ধর্ম নাম লই কিরা করিল শপথ।

১৬. ধর্মের প্রসাদ আছে পূরিলেক আশ।

১৭. জালিয়ার বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।

১৮. কহিলেন দেবধর্মপদে আরাধন
ধর্ম স্মরি ইউসুফে মাগিলা একবর।

সূফিতত্ত্ব : নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিলা
এহি লক্ষ্যে যথ জীব সৃজন করিলা।

মাতাপিতা : দ্বিতীয় প্রণাম করোঁ মা ও বাপ পাএ।
যা'ন দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধাএ।
পিপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত
কোল দিলা বুক দিয়া জগতে বিদিত।...
না খাই খাওয়াএ পিতা ন পরি পরাএ

ওস্তাদ : ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হন্তে বাড়
দ্বিতীয় জনম দিলা তিহঁ সে আহ্মার।

বাংলা রচনায় পাপ ও ভীতি :
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ
দূষির সকল তাক ইহ ন জুয়াএ।
গুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।

উপমা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কামদেব, বলি, কর্ণ, অপ্সরী, মদন, মুনি, পদ্ম, ডমরু, রামকদলী, শরৎচন্দ্র, সফরী, চাতক, দাদুরী ইত্যাদি।

আসবাব : পালঙ্ক, কনক জড়িত পাট, কটোরা, সন্দুক, উয়ারী, উচ্চরন্ত টঙ্গী, মন্দির (গৃহ), থালাবাটি ইত্যাদি।

: টোন হতে অলক্ষিতে ছুটে যেন বাণ।

সংস্কৃতি : তাম্বুল যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে
কেহো নৃত্য করে, কেহো বাহে কপিনাস

বসন : বহুল বিবিধ বাস/নাটি পাট শাড়ীলাস/চারিদিক অঙ্গ সুরচিত

অলঙ্কার : হীরার হার, শ্রবণে রতনমণি, অঙ্গুরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া নথ (মুক্তা ও কনকনির্মিত), তাড়, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নেউর (নূপুর), বলয়া, সিন্দূর, মেহেন্দী, নেতপাট শয্যা, চন্দন, কুঙ্কুম, আগর, রত্নাভরণ।

: পাট পাটাম্বর নেত কনকমণ্ডিত।

আদি মানবসমাজ পৌত্তলিক :

: কেহ বোলে এহি (ইউসুফ) ব্রহ্মারূপ প্রজাপতি
তান পূজা কৈলে হৈব মুক্তি পদ গতি।

দাসী : সহস্রেক দাসী দিব চন্দ্রমুখ অভিনব
মণিমুক্তা অলঙ্কার পুর।
[দাসী কেবল কাজের জন্যে নয়— কামচর্চার জন্যেও]

তৈজসপত্র যৌতুক : কনকের বাটাবাটি বহু ভাণ্ড ঘট ঘটি
সুবিচিত্র ঝাড়ু গাড়ু বর্গ
রতন প্রদীপ জ্যোতি সহস্র নক্ষত্র জিতি-
যেহেন উঝল মণি স্বর্গ।

ভাণ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পূরি
মণিময় আভরণ সাজ
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাতি
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ।

রথসজ্জা-কন্যা যাত্রা: দশ সহস্র রথ সজ্জা তাহার উপরে ধ্বজ
রথ 'পরে বিচিত্র মন্দির
পুরি মাঝে অন্তসপট সুবর্ণ নির্মাণ ঘট
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর। (পর্দা)

আজিজ মিশির : কনক অম্বারী পরে চড়ি রঙময়/সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শিরের উপর।
: চারিদিক চামর দোলায় চমকিত।

বাদ্য : ১. দুন্দুভির শব্দে পূরিল দিগন্তর

ঢাক ঢোল দণ্ডি কাসি বাজত সুস্বর।
২. সানাই বিগুল বাজে বাঁশি করতাল।
৩. কবিলাস বিপঞ্চিক মন্দিরা মৃদঙ্গ তবলা বাজে দুন্দুভি-নিশান
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিশাল বিধান।

শিবির : ১. তাম্বু তাঙ্গি আজিজ রহিলা সেই স্থান
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান।
২. নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্য করে।
৩. এ ঝাম ঝাঝঁরি ধ্বনি বাজে ঝণ কারে।
৪. নাচএ গাবএ ছন্দ মেলা।

পারিতোষিক [আজিজ মিশির] :
সভান প্রসাদ দিলা পিরীতি বচনে।

সমাজনীতি : তুহ্মি অকুমারী বালা জগতবিদিত
বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী) দেখা অনুচিত।

বরের বাহন : চলিলেন আজিজ চৌদোলে আরোহণ।
ধ্বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি।

জোলেখার বিয়েতে আনুষ্ঠানিক আচার :
ব্রাহ্মণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি
কবিত্ব পড়এ ভাই পিঙ্গল বিচারি।
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেতে উল্লাস।

জন্মান্তর, অদৃষ্ট নিয়তি :
১. তোর কর্মে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ।
২. কর্মফল লিখিত তোহ্মার হেন জান।
৩. না জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত লিখিত।
৪. বিধির নিবন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
৫. দৈবের নিবন্ধ আছে কর্মের লিখিত।
৬. মোর শুভদশা আছে কর্মের লিখন।

অভ্যর্থনাপদ্ধতি : ১. অজিজের অন্তঃপুরে যথ নারীগণ
বাড়িয়া নিবারে আইল হরষিত মন।
ঘট-দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান
যুবক-যুবতী সবে ধরিল যোগান।

দোহান উপরে কৈলা পুষ্প বরিষণ
গুলাল চামেলী চম্পা সুবর্ণ গঠন।
রতন মণ্ডিত মালা কুসুম নির্মাণ
আজিজ জলিখা গলে করিল সন্ধান।

২ নারীরা :
কেহ সিঞ্চে নানা পুষ্প সুবাসিত গন্ধ
কার হাতে দূর্বাধান্য নানান প্রবন্ধ।
নৃত্যগীত আনন্দিত স্তুতি পড়ে ভাট।

ফুল ও ফল : আম, জাম, নাগেশ্বর, লবঙ্গ গুলাল,
চম্পা, যুথী চামেলী গুলাল।

বালক ইউসুফের সজ্জা :মাথেত পাগড়ী দিলা অঙ্গেতে ভূষণ (তুল : কৃষ্ণ)

অবতার : মনুষ্যমূরতি এহি দৈব অবতার।

রাহাজানি : পন্থে বাটোয়ার সব আছে দুষ্টজন।

মুদ্রা :
১. তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার (ইউসফের)।
২. বহুল সুবর্ণ মণি রতন প্রবাল
হীরা নীলা মাণিক্য মুকতা কসা লাল।
রত্ন মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন।

বৈরাগী বেশ : মণ্ডন করিলা শয্যা তবল্ বিরলে
পাটাম্বর তেজি মৃগ-চর্ম পরিধান
পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমি করিল শয়ান।
ঘৃত মধু এড়িয়া বনের শাক ভক্ষ্য
নীলগঙ্গা তীরের ঘোফের মধ্যে বাস
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মন উদাস।

দেবপূজা : যেন ইষ্ট দেবতা পূজয়ে নিতি নিতি।

নীতিশাস্ত্র: মহাদেবী যেন গুরু পত্নীর সমান
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান।

পক্ষী : কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শারী শিখী
চকোয়া চাতক বর্ণ রাজহংস পাখী।

পান সুপারি : কাহাক খাওয়ায় কেহো কর্পূর তাম্বুল

মিষ্টি খাদ্য — কনক কটোরা ভরি মধুমিষ্ট সুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইসুফক মুখে।
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি
সুধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি।

খোঁপা : বন্ধএ কানড়ী খোপা লাস।

সজ্জা ও প্রসাধন : শীষেত সিন্দূর, শ্রবণে গুম্ফিত মোতি রতন কুন্তল,
গীমাগত হীরাহার, বিরাজিত গজমোতি পাঁতি
কুস্তুরী কুঙ্কুম বিন্দু, কপালে তিলক চন্দ,
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, কেশর সুগন্দি সঙ্গ।
কাঁচুলি মণ্ডিত হার, করেত কঙ্কণবর,
কনক মাণিক্য জ্যোতি সার।
বাহু দণ্ডে তাড় তারি, চূনিমণি বিচিত্র নির্মাণ।
অঙ্গুরা মাণিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভরিপুরি, কটিত কিঙ্কিনী বাজে,
চরণে নূপুর বাজে, রঙ্গ বিচিত্র বাস
আগর চন্দর ফাগু সুবাসিত রঙ্গে।

নারী ও পুরুষ : অগ্নি ও তূলা, ঘৃত ও বহ্নি সদৃশ।
লোহা ও অসি, জতু ও অগ্নি
(লোহা যেন অগ্নি পাই জতুক আকৃতি)

ঢুলনী : তার একশিশু তিন মাসের সুন্দর
শয়ন করিয়া ছিল ঢুলনী উপর।

শয্যা : ইসুফক দিলা যথ খাট, পাট পাটি
তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটাবাটি।

যোগিক সাধনা–
ইসুফ :

১. আপনার জ্ঞান ধ্যান সমাধি সংযোগ
সর্বক্ষণ এহি চিন্তা অল্প উপভোগ
জ্ঞান ধ্যান বিনু তান আন নাহি মতি
ধর্ম কর্ম বেদ মন্ত্র পরমার্থ গতি।
২. সর্বলোকে বলে এহি দেব অবতার
মহাসাধু সিদ্ধারূপ প্রকৃতি তাহার।

ছড়িদার (এ যুগের অগ্রগামি Surgeant) :

আজিজ মিসির যদি আরোহণ গতি।
দুই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি।

হিন্দুয়ানি দাম্পত্য ধারণা :
শুন হে ইসুফ তুহ্মি হঅত তৎপর
জলিখা তোহ্মাক পত্নী জন্ম-জন্মান্তর।

পুতুল নাচ : পোতলা নাচায় যেহ্ন সূতের সাতার
বাদিয়া আলোপে যেহ্ন সূত রাখি কর।

বাদ্যযন্ত্র : ১. বিয়াল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিতে...
২. যথবাদ্য ভাণ্ড আছে সর্ববাজ্য দেশ
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে পূরিয়া বিশেষ।
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুভি নিশান
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ।
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল
শঙ্খনাদ শিঙ্গা ভেরী বাজএ তম্বুল।
জয়তুর স্বরমণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পূর
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ সেইপুর।
ঝনঝান ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনাকার
বাঁশী কাঁসী চোরাশী বাজন অনিবার।
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কর্ণাল
করতাল মন্দিরা বাজয়ে সুমঙ্গল।
বিপঞ্চী পিনাক বাজে অতি-মৃদুস্বর
কপিলাস রুদ্র বাজয়ে নিরন্তর।

অলঙ্কার : কাঞ্চন দোছড়ি মল

বাহন : শিবিকা চৌদোল আরোহণ

বাদ্য ও বিবাহ মঙ্গল : দুই রাজ বাদ্যবাজে জয় শঙ্খধ্বনি
বিবাহ মঙ্গল গাহে দেবের রমণী।

উৎসবে মঙ্গল গান : ১. সুরচিত মঙ্গলা গাহেন্ত
২. পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গল গীত গাহে
৩. এহিমতে মন্দুলা করিলা মহোচ্ছব।
৪. সুরূপী সুন্দরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ঘন
যেহ্ন মোতি ভূমি বিস্তারিত।

বাসরে : পুষ্পক পালঙ্গী 'পরে দুহু প্রেম রস ভরে
সুখ শয্যা বাস নিরন্তর।

টঙ্গী : রচিলেন্ত এক টঙ্গী অন্তঃপুর থান
উষ্ণ দেবপুরী সম ফটিক নির্মাণ।
চন্দন আগর পাট শয্যা সুবলিত
স্তম্ভে স্তম্ভে রজত কাঞ্চন সুরচিত।
চিত্রকারী বিচিত্র অক্ষর চমকিত
কাঞ্চন রচিত বর জ্যোতি প্রদীপিত।
মধ্যে মধ্যে পাটাম্বর গুপ্ত ওড় আড়
অতি মনোরম ভাতি মুকুতা সঞ্চার।
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তারা জ্যোতি
দেবের বৈকুণ্ঠ কিবা অপরূপ ভাতি।

অন্য টঙ্গী : একঘর আজিজে নিমিছে মনোহর।
মণিরত্ন কাঞ্চন মন্দির পূর সাজ
বেড়া প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সার।
রক্তবর্ণ পাষাণ পূরিত বররাজ।

গর্ভকাল : দশমাস দশদিনে পুত্র উতপতি।

দুর্ভিক্ষে মানুষ বেচাকেনা :
ভক্ষ্য দিয়া আক্ষা পুত্র-পরিজন
দাস-দাসী করিয়া রাখহ প্রাণ-ধন।
মিশ্রির সকল লোক হৈল দাস-দাসী

রাজদর্শনের কায়দা : নবী বোলে দ্বারে ত রহিবা আগুয়ান
অন্তঃপুরে প্রবেশিবা আজ্ঞা পরমাণ।
নৃপতির মুখ দেখি করিবা প্রণাম
সচকিত ন হেরিবা নতু ডানবাম।
আশীর্বাদ করিয়া রহিবা ধৈর্যমান
আজ্ঞা হৈলে বসিবা আজিজ বিদ্যমান।
পুছিলে সে কহিবা বচন রত্নবান
বিস্তারিত ন কহিবা অল্প সমাধান।
ন বৈসে বিমুখ হৈয়া নৃপতি গোচর
সময় বুঝিয়া যাইবা নিজ বাসা ঘর।
নৃপতিক প্রকৃতি বচন তত্ত্ব জানি
কার সঙ্গে না কহিবা বেকত কাহিনী।

আসন : বিচিত্র বসন আনি বিছাইলা সত্বর।
রাজ আজ্ঞাএ বসিলেন্ত দশ সহোদর।

আপ্যায়ন ভৃঙ্গারের জল কোহ্ন সেবকে যোগাএ
চামর সমীর কেহো করে তান গাএ।
সুবর্ণের বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুল
সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল।

সৈন্য : ক্ষেত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভূষিত
ধনুর্বাণ খর্গ চর্ম সন্ধান পূরিত।...
দশ সহস্র ছড়িদার সচেতন রাজে...
মণিময় কৃপাণ করেত সুশোভিত
চৌদ্দ অক্ষোহিণী সৈন্য করহ সাজন।

পিতা : বাপবাক্য যেহ্ন মহাবেদ।
পিতৃপদ সেবা কৈলে স্বর্গলোক গতি।

বেশ্যা নর্তকী : যত নৃত্য বেশ্যা আছে সুরূপ সুঠান
সুললিত নৃত্যগীত কর সাবধান।

মুসলিম-মানস—
আল্লার বাণী : কাফের সকল মারি করহ অধীন।
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে যেই জন
তাহার উপরে কর অস্ত্র-বরিষণ।
কাফের মথিতে চলে মিশ্র অধিকারী

নারীর অতিথি ও গুরুজন বরণ :
কার হাতে দূর্বাধান নানা পুষ্প পাতা..
নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান...
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখিমুখ।
(ভৃঙ্গারের জলে)
বাপ পদ আপনে পাখালে নৃপমণি
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা।

রাজা : সুসজ্জ করহ সৈন্য যথ অশ্ববর
সুবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাখর।
বিশুদ্ধ সুবর্ণ মণি বিরচিত রথ...
বিচিত্র কনক মণি কনক শোভিত।

মঙ্গলাচরণ

ভট্ট সবে স্তুতি পঠে জুড়ি দুই কর
স্বামী বরদাতা শিব
তবে কন্যা মহেশ পূজিয়া ততক্ষণ
(ইবন আমিনের ভাবীপত্নী বিধুপ্রভা)
অতিথি আইল জানি করিলা গমন।...

দৈববাণী :

এহিস্থানে তোল টঙ্গী ঘর সুরুচির
তার মধ্যে থাকি শিব পূজহ ভকতি
তবে সে পাইবা জান তুহ্মি নিজপতি।

কদমবুচি :

চরণ বন্দিল তান শির 'পরে ধরি।

বিধুপ্রভার স্বয়ংবর-
কনে সাজ :

চিকুর কুচিত বেণী সিঁথিপাঁতি শোভা
অর্ধচন্দ্র আকৃতি মোহন তুল খোপা।
তিলক ভূষণ পত্রাবলী চারু সাজ
নক্ষত্র নিকর যেহ্ন শোভে দ্বিজরাজ।
তিলফুল জিনি নাসা মুকুতা মণ্ডিত।

খ. সৈয়দ সুলতান

নবীবংশ (১৫৮২-৮৪ খ্রি. মৎ-সম্পাদিত)

সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আঠারো শতক অবধি চট্টগ্রামের কবিগণ তাঁকে বাল্মীকি-ব্যাসের মতোই কবিগুরু বলে মানতেন। ষোলো শতকের চট্টগ্রামের মুসলিমসমাজ সৈয়দ সুলতান প্রভাবিত। তাই এ দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন।

বৈদিক যুগ থেকেই সুপ্রাচীন অনার্য সাংখ্য-যোগতত্ত্ব ভারতিক ধর্মচিন্তায় ও অধ্যাত্মসাধনায় প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক প্রভাবে হিন্দু শাক্ত-শৈব তন্ত্রমত গড়ে উঠেছে এবং পরবর্তীকালে মুসলমানরাও এ যোগতন্ত্র এড়াতে পারে নি। পনেরো শতক অবধি যে-তত্ত্ব আচরণের মধ্যে ছিল, তাই ষোলো শতক থেকে লিপিবন্ধ হতে থাকে। আমরা যোগ-যোগীর কথা কেবল হিন্দু-বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বাঙলাভাষায়ও নানাসূত্রে শুনতে পাই। কেবল চর্যাগীতিতে নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যচরিত মঙ্গলকাব্য ও প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতিতেও যোগীর সন্ধান পাই। সমাজের সর্বক্ষেত্রে যোগী-সন্ন্যাসী-পির-ফকিরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণই ছিল। কুতুবউদ্দীন আইবক থেকে মীরজাফর অবধি । ও বাঙলার সুলতানদের অনেকেরই জীবন পির-ফকিরের পরামর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে সন্ন্যাসীর ভূমিকা প্রায় অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ওহাবি ফরাইজি প্রভাবের পরেও আজকের দিনে শরিয়তি মুসলমান পির ও মারফতের মোহ ত্যাগ করতে পারে নি।

ষোলো শতকে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবে যে ভাব-বিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাব গণমনের সংকীর্ণ ও ক্রূর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করেছিল। উদার মানবিকবোধ বাঙালির চিত্তের প্রসার এবং রুচির বিকাশ ঘটেছিল চৈতনোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে ও অসূয়ামুক্ত আবহ সৃষ্টি করা তাই হয়েছিল সম্ভব। এসময় নিশ্চিতই রাধাকৃষ্ণ লীলামহিমা বাঙালির চিত্তহরণ করে। নরে নারায়ণ দর্শন কিংবা জীবে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব করা যুগের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজে-ধর্মে ও রাষ্ট্রশাসনে আকবরের উদার নীতি এই বোধ আরো উজ্জীবিত করেছিল। তাই ষোলো শতক বাঙালি জীবনে ছোটখাটো রেনেসাঁসের যুগ।

এই শতক অনিবার্য কারণে বাঙলা সাহিত্যেরও সোনার যুগ। পনেরো শতকের বাঙলা রচনা বিচ্ছিন্ন ও বিরল প্রয়াসে সীমিত। কিন্তু ষোলো শতকের নব-বৈষ্ণবীর উচ্ছল ভাববন্যায় বাঙালি-হৃদয় প্লাবিত হয়ে ভাষা-সাহিত্যের আঙিনায়ও উপচে পড়েছিল। কবির সংখ্যাধিক্যে, সৃজনপটুতায়, রচনার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে এ শতক গোটা মধ্যযুগের মধ্যমণি। ভাবে ভাষায় এবং রূপ ও চিত্রকল্পের স্বতোৎসারে এ শতকের সাহিত্য অনন্য। কিন্তু এ রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণপ্রাচুর্য চৈতন্যদেবেরই দান। তাই অবৈষ্ণবরা এই বিপুল বন্যায় বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষোলো শতকে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল। এই বন্যায় প্রথম তোড় মন্দা হবার মুখে ষোলো শতকের শেষপাদে অবৈষ্ণবরা সম্বিৎ ফিরে পেতে থাকে। কিন্তু তখন তাদেরও অজ্ঞাতে তাদের চিত্ত চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে সমর্পিত। যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধদের যারা ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রচ্ছায় নিজেদের ধর্মমত প্রচ্ছন্ন রেখেছিল তারাও চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্রর দোহাই দিয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলাবাদকে সম্বল করে নিল। এরাই নতুন বৈষ্ণব সহজিয়া। শাক্তসমাজে শক্তির বাৎসল্য ও করুণাময়ী রূপের প্রাধান্য, শৈবসম্প্রদায়ে 'ভোলানাথ' শিবের জনপ্রিয়তা, তান্ত্রিক কাঠিন্যে প্রীতিরসের প্রবণতা প্রভৃতি বৈষ্ণব প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

ষোলো শতকে চৈতন্যোত্তর কালে তথা ষোলো শতকের শেষপাদে আমরা নিশ্চিত রূপে দুইজন হিন্দু-কবির সাক্ষাৎ পাই। দুইজনই রচনা করেছেন চণ্ডীমঙ্গল এবং উভয়েই চৈতন্য-চরণে আত্মনিবেদন করেছেন। দ্বিজ মাধব (বা মাধবাচার্য) তাঁর গঙ্গামঙ্গলের এক ভণিতায় বলেছেন :

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল
দ্বিজমাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।

আর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্যবন্দনা তো রয়েইছে।

পনেরো শতকের হিন্দুকবি বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই আর ষোলো শতকের প্রথমপাদের কবি হচ্ছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরদান, শ্রীকরনন্দী, দ্বিজ শ্রীধর। এঁদের মধ্যে পাঁচজন সুলতান বা সামন্ত প্রতিপোষণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অতএব এঁদের সাহিত্যিক প্রয়াস নতুন-গড়ে-ওঠা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রথম দান।

নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বিতীয় দান বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস এবং হিন্দুমনে নতুন জীবন স্বপ্নের উদ্ভাস [গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা হৈব হেন আছে ।]

এর তৃতীয় দান উত্তরভারতিক সন্তধর্মের অনুসরণে, সুফিপ্রভাবে দক্ষিণ-ভারতিক অদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তিবাদের ভিত্তিতে নব অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ও প্রেমবাদের উদ্ভব। চৈতন্যের ব্যক্তিক মনীষায় এই নব অধ্যাত্মবাদ প্রচারিত হলেও, এ কোনো আকস্মিক অকারণ ঘটনা নয়। জন্মসূত্রে বিন্যস্ত সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন নিয়তির অমোঘ বিধানের মতো পৈতৃক পেশার নিগড়ের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে পুরুষানুক্রমিক পীড়ন, দারিদ্র্য, তাচ্ছিল্য ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না তাদের। এতে দেহ-মন ও আত্মার উপর যে-জুলুম হত, নতুন কোনো আশার বা আদর্শের আলোর অনুপস্থিতির দরুন তা সহ্য করতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের ফলে তারা চোখের সামনে দেখল আজ যে ক্রীতদাস— বুদ্ধি, সামর্থ্য ও নৈপুণ্য বলে কাল সে বাদশাহী তখ্ত অলঙ্কৃত করছে। দিল্লি ও গৌড়ে এই আজব কাণ্ড হামেশাই ঘটছে। দেখতে পাচ্ছে সামান্যের মধ্যে রূপকথার নায়ককে। মানুষের আত্মপ্রসারের এই অনিঃশেষ ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাঁধন ছিঁড়বার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। মানুষ অবিশেষের জীবনের বিরাট সম্ভাবনার সন্ধান যখন একবার পেল, তখন তাদের ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্য সমাজ যতই বাঁধন শক্ত করতে চাইল ছিঁড়বার আশঙ্কা ততই বাড়ল। কিন্তু পাখি যখন নবদিগন্তের সন্ধান পেয়েছে, সে উড়বার চেষ্টা করবেই।

ব্রাহ্মণ্যবাদীর এ প্রয়াস যখন ব্যর্থ হল, তখনি চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে স্মৃতি ও শর্মাদ্রোহী সমাজগঠন আন্দোলন হল শুরু এবং এ উদ্দেশ্য মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে। কেননা অন্যথায় যারা ইসলাম গ্রহণ করত, মুখ্যত তারাই বৈষ্ণব হল যেমন সমাজে পতিত হওয়ার পর খ্রিস্টধর্ম বরণ করা ছাড়া যাদের অন্য উপায় রইল না, তারাই ব্রাহ্মমত সৃষ্টি করে নতুনে পুরানে সন্ধি ঘটিয়ে স্বধর্মের প্রচ্ছায় আত্মরক্ষা করল।[১]

বৈষ্ণবসাধনপদ্ধতিতে ও সামাজিক আচার-আচরণে ইসলামি রীতিনীতির হুবহু অনুকৃতি রয়েছে অনেক। তবু মানুষের চারিত্রিক স্খলন-পতনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, আর পতিতাত্মার জন্যে করুণাবোধ করা— বৈষ্ণবীর উদারতার সুন্দরতম প্রকাশ।

অতএব, মুসলিম সংস্কৃতির মোকাবেলায় দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে যা ঘটেছে, ষোলো-শতকে বাঙলায়ও একই ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক কারণে তা-ই ঘটেছে। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের সূচনা আগেই হয়েছিল, চৈতন্যদেবের মনীষা ও ব্যক্তিত্ব তাকে পূর্ণাবয়ব দিল। নতুন পরিবেশের প্রেক্ষিতে পুরোনো জীবনবোধ পরিবর্তনের যে বাস্তব ও মানস প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তা এই উপায়ে সিদ্ধ হল। সবাই অবশ্য বৈষ্ণব হয় নি। কিন্তু এ সত্য অনস্বীকার্য যে, কেউই আর স্বধর্মে ও স্বমতে সুস্থির থাকতে পারে নি, অবচেতনভাবে বৈষ্ণবীয় উদার মানবিকতার প্রভাবে পড়েছে। তারা সুস্থ থাকতে পারল না বটে, তবে সুস্থ মানস-আবহ পেল। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজ সে উদারতা অবৈষ্ণবের মতো কাজে লাগতে পারে নি; যেমন শিখেরা পারে নি নানকের মতো সমন্বয়ী উদার আদর্শকে ধরে রাখতে। তারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎকণ্ঠ ও উগ্র হয়ে ওঠে এবং এ

---

১ *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ,* ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত

উদ্দেশ্যে তারা সংকীর্ণতাকেই সম্বল করে। আত্মরতি সর্বাবস্থায় পরপ্রীতির পরিপন্থি কেবল ব্যক্তি-জীবনে নয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও তা সত্য। শিখদের মতে বৈষ্ণবেরাও উদার দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে নবগঠিত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়নে ও তাদের ধর্মতত্ত্বে আভিজাত্য আরোপ প্রচেষ্টায় সময়ের, শক্তির ও মনীষার অপব্যয় করতে থাকে। দৃষ্টি এমনি সংকীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ হওয়ায় তারা নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে রইল।[২] চৈতন্য ও তাঁর পারিষদের জীবনীগ্রন্থগুলো তাঁদের সংকীর্ণতার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন— বৃন্দাবন দাস অবৈষ্ণব হিন্দুকে 'পাষণ্ডী' বলেই জানতেন, বৈষ্ণবসুলভ বিনয় কিংবা সহিষ্ণুতাও তাঁর ছিল না। মনের মধ্যে তিনি সবসময় পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষপ্রসূত উত্তেজনা বহন করতেন। তাঁর একটি গালি তিনি ধূয়ার মতো আবৃত্তি করেছেন :

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।

ফলে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের আরেকটি প্রাচীর উঠল—মিলন-ময়দানের পরিসর আরেকটু সংকীর্ণ হল মাত্র। বৈষ্ণবেরা এভাবে যখন বাস্তবজীবন ও প্রয়োজনকে আড়াল করে পারলৌকিক জীবন-স্বপ্নে অভিভূত এবং দৃষ্টি মাটি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আকাশে নিবদ্ধ করেছে, তেমনি সময় সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাব।

সৈয়দ সুলতানের মনীষার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এ প্রভাবে অভিভূত তথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। এই প্রভাব স্বীকার করেও তিনি ইসলামি-জীবন কামনা করেছেন। সুফিমতের অনুকূল ছিল বলে তিনি রাধাকৃষ্ণ রূপক ব্যবহারে দ্বিধা করেন নি। অদ্বৈতসিদ্ধির লক্ষ্যে যোগপদ্ধতিকে সম্বল করে ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অনুসরণে জীবনচর্যা গ্রহণ করে তিনি ইসলামকে একটি বিবর্তিত স্থানিক রূপদান করেছিলেন। পারিবেশিক প্রভাবেই দেশ-কালের সঙ্গে বিদেশাগত ধর্মের এমনি সামঞ্জস্য কল্পনাও যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

এবার যোগ সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণার পরিচয় নেয়া যাক। নবীবংশে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা— জানাইলা জ্ঞান।
কুমারীক যোগশাস্ত্র জানাই নৃপতি।
কঠিন হৃদয় হেন মোমের আকৃতি।

আদিমানব আদমের তথা মানুষের দেহ-পরিচয় :

অধঃ রেত শিবশক্তি লিঙ্গেতে রহিল
নাভিদেশে পঞ্চবারি একত্র হইল।

2 *Bengal under Akbar & Jahangir* PP/P 118-19 T.K.Roy Chowdhury

দশমীর দ্বার থুইলা দশমীর পাট
চৌকি প্রহরী সব থুইলা ঘাট ঘাট।
অনাহত পঞ্চস্বরে বাজিবার তরে
লুকাই রাখিল তারে গহীন অন্তরে।
তিনশত ষাট শিরা দিলেন্ত টানাই
নাভিকুণ্ড দেশেত মিলিল সবাই (।)
সুষুম্নার মধ্যেত রহিল বড় থানা
হইবারে যত কিছু আওনাগমনা।
ইচ্ছা সুখে শিব-শক্তি জীবাত্মা দিলা।

যোগী শিব :

কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান মুণ্ডের জটা ধরে
সর্পসনে মুণ্ডমালা কণ্ঠের উপরে।
বৃষ 'পরে আরোহণ ভস্ম দিলা অঙ্গে
প্রতিগৃহে ভিক্ষা নিত্য করিলেন্ত রঙ্গে।
দুই পাশে আছিলেক তান দুই ভার্যা
কায়মনে সদায় করিলা পরিচর্যা।

সমাজে-যে যোগী-যোগিণীর প্রভাব ছিল তার প্রমাণ দুঃখিনী নারী বলেছে (কাবিলের মৃত্যুতে) :

ধরিমু যোগিনীবেশ কর্ণে নিমু কড়ি
একহাতে পাত্র আর করে দণ্ড বাড়ি।
অঙ্গেত লিপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ
কথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ।

অন্যত্র :

সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

আমিষভোজনের কুফল

খাইতে পশুর মাংস দেহ হএ জান ধ্বংস
অবোধে আত্তমা পায় জয়।
দেহমধ্যে পঞ্চভুল আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তাহার বাড়এ।

দেহতত্ত্ব :

দেখন শুনন বাক্য জানন অপার
প্রভুর এ সব জান শরীর তোক্ষার।
সপ্তম আকাশ সপ্তপৃথিবীর মণ্ডল
একে একে আছে সব শরীরে সকল।

শিবশক্তি মূলাধার ধরে নাভিদেশ
সহস্রদলেত তোর করতার বেশ।
অনাহত দুমদমি বাজএ নিরন্তর
কনক মৃণাল পুষ্প তাত মনুহর।
ভালমতে শতদলে হৈছে প্রকাশ
নানা পুষ্প বিকাশ হৈছে চারিপাশ।
মধুপ ভ্রমরা তথা পাই দিব্যস্থান
কৌতুকে সদায় তারা করে মধুপান।

অদ্বৈত তত্ত্ব :

১. আদমের বাক্য তুমি   নিরঞ্জনে কহে পুনি
সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার
তার মোর নহে ভিন   এক অংশ পরিচিন
পিরীতি বড়হি মোর তার।

২. জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।
৩. জীবরূপ ধরি প্রভু বৈসে সর্বঠাম
সুচারু সুরূপ প্রভু ধরিছে উপাম।
ফটিকের অন্তরে যেন সুবর্ণের লত
কনক পত্রিকা পুষ্প বাহিরে বেকত।
৪. আপনাকে আপনি চিনিতে পার যবে
প্রভু সনে তোহ্মার দর্শন হৈব তবে।
সর্বঘটে ব্যাপিত আছএ নিরঞ্জন
আপনার ঘটেত পাইবা দরশন।
আপনারে আপে যদি পার চিনিবার
নিশ্চয় দেখিবা তুহ্মি প্রভু করতার।
সর্বথায় পাইবা তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন।
৫. আহাদ আহমদ মহাসুর ভিন
এই মহাসুর মধ্যে ত্রিভুবন চিন।
আহমদ হোন্তে নুর কৈলা মহাসুর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।
আহাদ আহমদ পাইল দরশন
হইয়া ভাবক রূপ কৈলা নিরীক্ষণ।
আহমদরূপে আপনা দেখা পাই
সাধক হইয়া রূপ রহিল ধেয়াই।
প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার
নুর মোহাম্মদক লাগিলা দর্শিবার।
(তুল : রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণ হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে)

৬. আল্লাহর উক্তি :
আপনা অংশে আহ্মি সৃজিছি তোহ্মারে
তুহ্মি আহ্মি একত্রে আছিল অনুদিন
আহ্মা হোন্তে কথদিন হইয়াছে তিন।

৭. মুহম্মদের উক্তি :
কিবা এথা কিবা তথা তুমি সর্বময়
সভানের স্থানে তুহ্মি নাই তোহ্মার স্থান।
সভান ব্যাপিত হই আপনে রহিছ
মহিমার লাগি আর্শ কুর্সী সৃজিয়াছ।

৮. প্রভুর পরমতত্ত্ব শুনি খদিজায়
সংসার অসার জানি মানে সর্বথায়।
ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

হিন্দুপুরাণের ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল গভীর। তিনি এ পরিচয় কাজে লাগিয়েছেন। ইসলাম-যে আল্লাহর মনোনীত শেষধর্ম এবং মুহম্মদ-যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, আর তাঁর আবির্ভাবের ফলে পূর্বেকার নবীগণ প্রচারিত শিক্ষা ও আচার-আচরণ-যে বাতেল হয়ে গেল— ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা-ই প্রমাণ করবার জন্যে তিনি হিন্দুর প্রধান দেবতা, অবতার ও ধর্মগ্রন্থে শয়তানের কারসাজিতে কী দোষ স্পর্শ করেছে তার বানানো কাহিনী বিবৃত করেছেন। সৈয়দ সুলতানের অনুসরণে পৃথিবীর বাসেন্দা-পরম্পরার বিবরণ দেয়া হল :

প্রথমে দেও-দৈত্য তথা অসুরেরা সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর অধিকার পেল। কিন্তু তাদের অনাচারে পৃথিবী পাপের ভার সইতে না-পেরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাল, তখন:

ক্ষিতির যে নিবেদন   শুনি প্রভু নিরঞ্জন
আদেশ করিলা সুরগণ
তেজ সুর এ আকাশ   চলি যাও ক্ষিতিপাশ
অসুরকে করিতে নিধন।

তারপর সুরাসুরে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। কালনেমি, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ প্রভৃতির পর দৈত্যেরা দেবতাদের হাতে পরাজিত হয়ে পালাল। সুরেরাও ক্রমে অনাচারী হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে তাদেরও আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। অবশ্য তাদের মধ্যে :

পুণ্যের প্রভাবে রহিলেক কথজন
ক্ষিতিত আলোপ হই সদায় ভ্রমণ।

এর পরে ফিরিস্তারা নররূপ ধরে পৃথিবীতে বাস করতে লাগল। তারা—
চারি মহাজন স্থানে পাইল চারিবেদ।

সামবেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার
তবে যদি বিষ্ণুর হৈল উৎপন
যজুর্বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।
তৃতীয় মহেশ যদি সৃজন হইল
ঋক্‌বেদ তান স্থানে পাঠাইয়া দিল।
চতুর্থে যদি সে হরি হইলা সৃজন
অথর্ব বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন
এ চারি বেদেত সাক্ষ্য দিছে করতার
অবশ্য অবশ্য মোহাম্মদ ব্যক্ত হইবার।

[স্পষ্টত ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর কবি এই নামক্রম মেনেছেন এবং বিষ্ণু ও হরির (কৃষ্ণ) পৃথক ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেছেন।]

শিব পরমযোগী। তিনি—

কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান মুণ্ডে জটা ধরে
সর্পসনে মুণ্ডমালা কণ্ঠের উপরে।
বৃষ 'পরে আরোহণ ভস্ম দিলা অঙ্গে
প্রতিগৃহে ভিক্ষা নিত্য করিলেন্ত রঙ্গে।
দুইপাশে আছিলেক তান দুই ভার্যা
কায়মনে সদায় করিলা পরিচর্যা।

এহেন যোগীশিব সুরাপান করে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে—

দুহিতারে পত্নীরে দেখিয়া একাকার
বিচলিত হৈল মনে করিতে শৃঙ্গার।

কাজেই তিনি ব্রতভ্রষ্ট হলেন। তাঁকে দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হল না।

তারপর এলেন সোম। তিনিও গুরুপত্নীর সঙ্গে শৃঙ্গার করে দেহে সহস্র ভগচিহ্ন লাভ করেলেন। এসব অনাচার ও পাপের ফলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হল। (তুল : নবী নুহর সময়কার প্লাবন)। নুহর মতো ধার্মিক মুনি নৌকা তৈরি করিয়ে তাতে আশ্রয় নিলেন। এভাবে সৃষ্টির পবিত্রাংশ রক্ষা পেল। তারপর কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। এ সঙ্গে হিরণ্যকশিপু ও বলিরাজকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

অবশেষে হরি আবির্ভূত হলেন।

সে হরির সনে রহি ইব্লিস দুর্বার
ধরিয়া আছিল পাপী মুনির আকার।
ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।

ফলে হরি কামাসক্ত হয়ে পড়েন এবং ব্রত ভুলে নারীসম্ভোগে কাল কাটাতে লাগলেন।

আল্লাহ রুষ্ট হয়ে আদেশ দিলেন ফিরিস্তাকে
রাখ নিয়া বেদশাস্ত্র জলের মাঝার।

কিন্তু ইব্লিস দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে কপিকে দিয়ে জল থেকে 'বেদ' উদ্ধার করাল এবং 'আপনা আচার যথ তাহাতে লেখিল।'

এভাবে,
পাপিষ্ঠ ইব্লিসে যদি বেদ পরশিল
নিরঞ্জনে বেদ হোন্তে তেজ হরি নিল।

ইতিপূর্বে,
বেদমন্ত্রের এমনি মাহাত্ম্য ছিল যে
একালে কাটিয়া বৃষ খাইত ব্রাহ্মণে
বেদমন্ত্র পড়ি পুনি জিয়াইত তখনে।

এমনি করে ঐশ-শাস্ত্র 'চর্তুবেদ' বাতেল হয়ে গেল। কাজেই এখন ভারতীয়দেরও সত্যধর্ম হবে ইসলাম। বিশেষ করে—

এ চারি বেদেত সাক্ষি দিছে করতার
অবশ্য অবশ্য মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।

এদেশে কবি এমনিভাবে শেষনবীর আবির্ভাব ও ইসলামের অপরিহার্যতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কবি দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের উপযোগ এবং এদেশের জনগণের ইসলাম-বরণের যৌক্তিকতা উপরোক্ত কাহিনী ও যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। লক্ষণীয়, আরবের ইসলাম-যে ভারতের সত্যভ্রষ্ট জনগণের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে এমনি একটা ধারণা দেবার চেষ্টাও আছে। পক্ষান্তরে বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, পিপিলাই, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম প্রভৃতি হিন্দু-কবিগণ দেশের অধিবাসী মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেই উভয়জাতির সহঅবস্থান কামনায় পারস্পরিক মত-সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে মিলনসেতু রচনার প্রয়াসী ছিলেন। তাই কালকেতুর গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমাংশে মুসলিমপ্রজা উপনিবিষ্ট হয়েছে। তারা সাধারণভাবে সৎস্বভাব, শান্তিপ্রিয় ও স্বধর্মনিষ্ঠ। হোসেন হাটির কাজী যদিও হিন্দুবিদ্বেষী, সাধারণ-মুসলমান কিন্তু হিন্দুপীড়নে উৎসুক নয়। কাজী অবশ্য এ বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বিষময় পরিণাম শেষে উপলব্ধি করেছে।

মুঘলবিজয়ের পরে দেশে অর্ধশতাব্দী অবধি (১৫৭৫-১৫২৬) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, স্থানীয় ভুঁইয়াদের আনুগত্য লাভ করবার জন্যে মুঘলদের অনবরত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারপরে সতেরো শতকে মঘ-পর্তুগিজ দস্যুর উপদ্রবে বাংলার

সমুদ্রোপকূলাঞ্চল এবং নদীতীরস্থ গ্রাম উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।[1] আঠারো শতকে শুরু হয়েছিল বর্গীর উপদ্রব, অভ্যন্তরীণ শাসন-শৈথিল্য এবং পীড়ন।[2] সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উপর যখন এমনি হামলা চলছিল, তখনো চৈতন্যের ও আকবরের উদার মানবিকবোধ হিন্দু-মুসলমানকে দুর্দিনের দুর্যোগে একই মিলন-ময়দানে জড়ো করেছে। সেদিনের অসহায়-অজ্ঞ মানুষ জীবনের মমতায় জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে নতুন দেবতার আশ্রয় খুঁজেছে। এভাবে মুখ্যত সত্যপীর তথা সত্যনারায়ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন স্থানিক উপদেবতাগোষ্ঠী যাদের প্রতি আনুগত্যে নিরাপত্তার সন্ধান করেছে গণমানব। সুখের দিনে মানুষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদালোভী হয় দ্বন্দ্বে-বিবাদে উৎসাহ বোধ করে আর দুঃখের অভিঘাতে দুঃখীমানুষ বেঁচে থাকার অবচেতন প্রেরণায় অগণিত সামাজিক ও আচারিক বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে মিলিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের চিত্র পাই সত্যনারায়ণ পুঁথিতে, রায়মঙ্গলে, কালুগাজী চম্পাবতীর কেচ্ছায় ও জয়দ্দিনের গাজীনামায়। অতএব, যো॰া শতকে দুঃখী গণমনে যে-শুভবুদ্ধির সূচনা তাই প্রশাসনিক অব্যবস্থায় ও আর্থনীতিক অনিশ্চয়তায় গভীর, ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হতে থাকে। আচারিকবিভেদের প্রাচীর ভেঙে স্বাতন্ত্র্যের বাঁধ লোপ করে নতুন লৌকিক দেবতার মন্দিরচত্বরে একে অপরের প্রতি প্রীতি রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন পুরোহিত আর মোল্লায় বিরোধ ছিল না, কাফেরে যবনে ভেদ ঘুচে গিয়েছিল। সত্যপীরের সিন্নি চণ্ডালে ব্রাহ্মণে যবনে পাশাপাশি বসে খেল আর হাত মুছল মাথায়। ছোঁয়াছুঁয়ির অনাচারের কথা আর কারো মনে জাগল না।

সৈয়দ সুলতানের দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ

যোগীরা পদ্মাসনে বসে যোগসাধনা করত। তারা বায়ু ভক্ষণ করেই দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করতে পারত।

> কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
> বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।

যোগীরা কানে কড়ি পরত, অঙ্গে ভস্ম মাখত, একহাতে ভিক্ষাপাত্র তথা করোটি ও অপর হাতে লাঠি ধরত এবং দেশ পর্যটন করে বেড়াত। আর সিদ্ধারা থাকত অনাহারে।

> ধরিমু যোগিনীবেশ কর্ণে নিমু কড়ি
> একহাতে পাত্র আর করে দণ্ডবাড়ি।
> অঙ্গে লিপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ।
> সিদ্ধা সম অনাহারে থাকি প্রতিদিন।

1 Hist. of Bengal.

2 মহারাষ্ট্রপুরাণ, Times of Ali Vardi

দৈবজ্ঞরা পাঁজি দেখে অঙ্ক কষে ভাগ্য গণনা করত :

পাঁজিমেলি দৈবজ্ঞে চাহ-এ একে এক
শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

দেবতার পূজা ও বলিদান :

লক্ষ লক্ষ অজ আনি সমুখে রাখএ
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু মুর্তিরে বোলএ

এয়োরা শিষে সিন্দূর পরে :

শিষের সিন্দূর মুছি কৈলা দূর।

বৌদ্ধ অহিংসবাদ তখনো যোগীদের মধ্যে প্রবল। তাই আমিষ খাদ্যের কুফলের সংস্কারও অবিলুপ্ত :

আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন
না করিব এসব অধর্ম
খাইতে পশুর মাংস দেহ হএ জান ধ্বংস
অবোধে আত্তমা পায় জএ
দেহমধ্যে পঞ্চভুল আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তাহার বাড়এ।

সূর্যপূজারী সৌর-সম্প্রদায় তখনো লোপ পায় নি :

অনুদিন দিবাকর পূজে নরগণ।
উদয় হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু
দিবাকর সবে প্রণামএ।

নিম্নবর্ণের লোকের হীনমন্যতা :

নারী বোলে আহ্মি হই ধীবরের জাতি
আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।

ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ অনুষ্ঠান :

প্রথমে ললাটে তোর মূরতি লেখিমু
দ্বিতীএ তোমার কান্ধে পৈতা চড়াইমু।
তৃতীএ যথেক আছে আচার আমার
একে একে করাইমু সেসব আচার।
চতুর্থে করাইমু তোরে স্থান তপন
পঞ্চমে করিমু তোরে অনল দাহন।
পরলোকে তবে যে তোহোর ভালগতি।

এদেশের মুসলমানেরা কাফের বলতে আরবের ও এদেশের কাফেরকে অভিন্ন জেনেছে। তাই কবিগণ নবীদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাফেরদেরকে এদেশী হিন্দুর আদলে এঁকেছেন। কাফেরের যে-চিত্র পাই তাঁদের বর্ণনায় তা আমাদের হিন্দুসমাজেরই ছবি। এর কিছুটা চৌদ্দশ বছর আগেকার পৌত্তলিক আরব সম্বন্ধে ধারণার অভাবপ্রসূত, আর কিছুটা নতুন পরিবেশে হিন্দু-পৌত্তলিকতার মোকাবেলায় ইসলামের মাহাত্ম্যপ্রচারের সচেতন অভিপ্রায়জাত। 'মূরতি পূজিতে নিষেধিবারে কারণ পৃথিম্বিত নবী সকলের হৈল সৃজন।' ফলে সৃষ্টিপত্তন আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে শেষনবী মুহম্মদের ওফাত অবধি বর্ণিত ঘটনায় দেশী কাফেরের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কার সর্বত্র বিম্বিত হয়েছে। ফলে ভারতিক ঐতিহ্য দুইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—একটি মুসলিম সংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে, অপরটি পরিহার্য কুফরী বলে নিন্দিত হয়েছে। এভাবে আমরা আরবীয় আবহের বিনামে একটি অকৃত্রিম ভারতীয় পরিবেশ পাই।

এতে শাসকজাতিসুলভ প্রাণময়তা, জিজ্ঞাসা ও অসূয়াহীনতাও কিছুটা মুসলিম-মনে ছিল বলে মনে করি। পক্ষান্তরে শাসিত হিন্দুমনের বিরূপতা মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ রেখেছিল বলেই মনে হয়। নইলে মুসলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্যে ও হিন্দুপুরাণে যতখানি জ্ঞানলাভ করেছিল, ফারসিভাষার মাধ্যমে হিন্দুর মুসলমানি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ আরো বেশি হয়েছিল; কিন্তু বাঙলাদেশে হিন্দুরা মুসলমানের আচার-আচরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে বুঝতে যে চেয়েছেন, তার প্রমাণ বিরল। অপরদিকে মুসলমানেরা ভাষার ও রূপ প্রতীকে হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুঐতিহ্যের বহুল ব্যবহার করেছে।

এর অন্যতম কারণ হয়তো এই যে, অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান লেখক ভারতে Classic ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে হিন্দুদের মতোই আদর্শ ও উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণের অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের আশ্রয় নেননি। যাদের জন্যে লেখা, তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও প্রতীক প্রয়োগে রচনা ব্যর্থ হত। খ্রিস্টান য়ুরোপ যে গরজে ও যে মনোভাব নিয়ে সাহিত্যে Pagan Greek ও Latin উপাদান গ্রহণ করেছে, মুসলমান লেখকেরা অনুরূপ কারণে অতিপরিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান নিয়ে বাঙলায় সাহিত্যসৌধ গড়ে তুলেছেন। অতএব, একে হিন্দুয়ানি প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাব নয়— দেশী উপাদান গ্রহণ।

সৈয়দ সুলতান বিষয় ও উদ্দেশ্যানুগ প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দুপুরাণের কাহিনী ও রূপকল্পের বহুল ব্যবহার করেছেন।

আদম-সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বর্ণনায় কবি হিন্দুপুরাণকে অবলম্বন করেছেন। অবশ্য তাঁর অজ্ঞতা ও আনাড়িপনার ছাপও সর্বত্র দৃশ্যমান। আগেকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-হরি-সোম প্রমুখ নবীরা কীভাবে ইব্লিসের খপ্পরে পড়ে আল্লাহ-নির্দেশিত ব্রতভ্রষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের নবুয়ত ব্যর্থ হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে শেষনবী মুহম্মদের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা এবং আপামরের ইসলাম-বরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন।

রূপপ্রতীকে হিন্দুপুরাণের রামায়ণ-মহাভারতের এবং ভারতিক উপমাদি ব্যবহার

১. রাহুর কোলেত যেন চন্দ্রের বসতি।

২. কস্তুরীচন্দন অঙ্গে করহ লেপন।
চন্দ্রিমার জোত মো-ত লাগে হুতাশন।
৩. যেন হনুমান ছিল শ্রীরামের বলে।
৪. পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।
৫. ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।
৬. গাভীর গোবরে যথা করএ লেপন।
৭. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।
৮. পশুপক্ষী সুরাসুরে যক্ষ দানবে নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে।
৯. গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান।
১০. ঈষৎ হাসিয়া কহে চাণক্য বচন।
১১. পাতালেত গিয়া দিমু লুক।
১২. দ্বিতীয় আকাশ প্রভু সৃজিলা হীরার
বৃহস্পতি সুরগুরু তাহার মাঝার।
১৩. কালনেমি আদি যথ অসুর দুর্বার
শুম্ভ নিশুম্ভ আর মুণ্ড দুরাচার।
১৪. পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুরগণ।

নবীবংশে সমাজ ও সংস্কার

চট্টগ্রামে সৈয়দ সুলতানের মানস যে-পরিবেশে লালিত হয়, তা এই :

ক. রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরাকান, গৌড় ও ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল পর্তুগিজ শাসন ও পীড়নের অভিজ্ঞতা।

খ. ধর্মের ক্ষেত্রে শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, থেরবাদী-তান্ত্রিক বৌদ্ধমত, যোগ প্রভাবিত মারফত-প্রবণ ইসলাম, প্রচারশীল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মই ছিল উল্লেখ্য। তখন হিন্দু ও মুসলিমের সংখ্যাই ছিল বেশি, বৌদ্ধের সংখ্যা স্বল্প এবং খ্রিস্টান ও বৈষ্ণব তখনো নগণ্য। কিন্তু তাদের মতবাদ ছিল প্রভাবশীল ও প্রসারমুখী।

গ. চট্টগ্রাম বন্দর আজকের মতোই ছিল নানাদেশী বহুমানবের মিলন-ময়দান। পর্তুগিজদের উৎসাহে তখন চট্টগ্রাম নতুনতর ভাব, চিন্তা ও পণ্যের প্রবেশদ্বার ; ভূয়োদর্শনজাত উদারতা, বিচিত্র মানুষ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারণাপ্রসূত পরমতসহিষ্ণুতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ দূরদৃষ্টি, নাগরিক সৌজন্য প্রভৃতি তাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে লাবণ্যমণ্ডিত করেছিল, প্রসারিত করেছিল তাদের মনের দিগন্ত। বিশেষ করে তখন মুসলিমসমাজে শুরু হয়েছে শান্ত প্রবর্তনার যুগ। শরিয়তি ইসলামকে জানবার বুঝবার আগ্রহ জেগেছে মুসলিমসমাজে এবং চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমবাদের প্রভাবে হিন্দুসমাজে জেগেছে 'নরে-নারায়ণ' এবং 'জীবে ব্রহ্ম' প্রত্যক্ষ করার ঔৎসুক্য। চৈতন্য মতের প্রভাব নানা কারণে সর্বাত্মক হয়েছিল। এতে মানুষ ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা অকস্মাৎ বহুগুণে বেড়ে গেল। মানুষ হৃদয়বান হবার উৎসাহ পেল; দীক্ষা পেল মানুষের ত্রুটি ও

পতনকে এক সহিষ্ণু ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার।

আগেই বলেছি, বাঙলার প্রতিবেশে লালিত কবি সৈয়দ সুলতান সুদূর আরবের আবহ নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্যে হিন্দুপুরাণ, দেশজ আচার-সংস্কার এবং এদেশের সামাজিক, নৈতিক ও পার্বণিক জীবনের আলেখ্যই আরবিজীবনের বিনামে চিত্রিত হয়েছে।

ক. তাই আদম-হাওয়া বাঙালি গৃহস্থ ও গৃহিণীর মতোই সংসার করেন। আদমের চাষাবাদের জন্যে ফিরিস্তা—

বৃষ সঙ্গে লাঙ্গল যুয়াল আনি দিল।
ঈষ কুঁটি লাঙ্গল যে তাতে শোভে ফাল।
সাপটা আনি জিব্রাইলে দিলেন্ত ততকাল
এক গাভী আনি দিল দুগ্ধ খাইবার।
কেহ নে বৃষ গাভী, কেহ নে তণ্ডুল

এই চরণগুলো শিবায়ণের শিবের কৃষিকর্মের উদ্যোগের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। হাওয়া বিবিও 'সন্দেশ সিদ্ধ করিতে লাগিল' এবং 'সিদ্ধ হৈল সন্দেশ দেখিয়া অনুপাম' স্বামী-স্ত্রী দুজন পরমতৃপ্তির সাথে আহার করলেন। এ যেন হর-পার্বতীর সংসার। আদম-হাওয়ার প্রেমও গভীর। এ যেন নাটকের নায়িকা। আদম হাওয়াকে বলছেন :

তোমার দরশনে মোর নয়ন চকোর
রহিছে অমিয়া আশে হই মতি ভোর।

হাওয়াও তখন :

বঙ্ক নয়ানে হেরি ঈষৎ হাসিল
ভুরু যুগ কটাক্ষে শর সান্ধি মারিল।
হাওয়ায় আদম মন-পক্ষী কৈলা বন্দী।

খ. সৈয়দ সুলতানের সমকালে ইসলাম ছিল মারফত-ঘেঁষা। জ্ঞান-প্রদীপ প্রসঙ্গে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এই মারফততত্ত্ব একান্তভাবে ইসলামি ছিল না। এর ভিত্তি ছিল যোগ ও দেহতত্ত্ব। তাই 'রসুলে আরব সব করি মুসলমান/ যোগপন্থা জানাইলা জানাইয়া জ্ঞান।' কিংবা

ওমর বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।

হিন্দুর মধ্যে দেখি সূর্যপূজা, বলিপ্রথা এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভৃতি। এটি নিশ্চিতই গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবের সাক্ষ্য।

সৈয়দ সুলতান এই নবমতের প্রচার ও প্রসার স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন হোলিউৎসব, শুনেছেন কীর্তন। তাই গোপী-কৃষ্ণ প্রণয়লীলার এমন জীবন্ত ও মনোরম বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

গ. সমাজে মৃতের কল্যাণে দান-খায়রাত ও শ্রাদ্ধ জেয়াফত প্রভৃতির রেওয়াজ ছিল :

বাপের কারণে দান ধর্ম বহু পুণ্য কৈলা
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিলা।

ঘ. ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর প্রভাব রাজদরবার থেকে কুটির অবধি সর্বত্রই সমান ছিল :

পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা।
শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

ঙ. মুসলিমসমাজেও পণ ও যৌতুকদানের প্রথা ছিল। ফাতেমার বিয়েতেও রসুল যৌতুক দিলেন। মুসানবীও বিয়ে করে যৌতুক পেলেন। মুসাকে :

শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান।

চ. শুভকর্মে তিথি-নক্ষত্র ক্ষণ লগ্ন মানা হত :

সভানের বিদ্যমান দুহিতা করিলা দান
লগন পাইয়া শুভক্ষণ।

ছ. পর্দাপ্রথায় শৈথিল্য ছিল না। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলাও ছিল নিষিদ্ধ।

মুসাএ বুলিলা তুহ্মি হাঁট মোর পাছে
ভিন্ন নারী দেখিবারে উচিত না আছে।

জ. মুসলিমসমাজে কদমবুসিও চালু ছিল :

বাপের সোদর জ্যেষ্ঠ কাজিবে দেখিয়া
বসিতে আসন দিলা চরণ বন্দিয়া।

ঝ. পিতৃভক্তির মহিমাও ছিল পরশুরামের কালের মতো :

জনকের বোলে পুত্র মরণ জুয়াএ।

ঞ. আতিথেয়তাকে ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হত :

কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জাএ
এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পাএ।

ট. মূর্তিপূজা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, গুরুনিন্দা এবং কোনো লোককে ছলে দাসে পরিণত করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে বিবেচিত হত :

প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ
বাপের মায়ের মন যদি না তোষএ।
ভিন্নজন প্রকারে যদি যে করে দাস
আপনা গুরুকে যদি করে উপহাস।
—এই চারি পাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব।
গুরুনিন্দা করে যেই সকল
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিষ্ফল।

ঠ. মানুষ সাধারণভাবে দৈবনির্ভর কুসংস্কারপ্রবণ দারু-টোনা আর তুক-তাক ও ঝাড়-ফুঁকে এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাসী ছিল। সে-বিশ্বাস আজও অম্লান :

১. দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন।
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।

—এসব অশুভ লক্ষণ।

২. বুলিল তোমার আঁখি বান্ধিল টোনায়
টোনা করি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।

৩. ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা।

ড. সেকালে গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া করতে হত, বারোয়ারি টোল-মাদ্রাসা ছিল বিরল। তাই সাধারণত একক গুরু-উস্তাদের কাছে লেখা-পড়া করতে হত। নবী ইদ্রিসকে তাই তাঁর মা 'পড়িবারে উপাধ্যায় হাতে সমর্পিলা।'

নারীশিক্ষাও ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের কোরআন পাঠ করার মতো শিক্ষাদানে মুসলমানসমাজে উৎসাহের অভাব ছিল না কোনোদিন। উদার পিতামাতর কন্যা উচ্চশিক্ষাও পেত। রসুলচরিতে এক নারীর সম্বন্ধে শুনি : 'সে নারী পণ্ডিত ছিল যথ মর্ম বুঝি পাইল।'

ঢ. মুসলমানসমাজেও কৌলীন্য-চেতনা ছিল। তবে তা কেবল জন্মসূত্রে লব্ধ নয়, কর্মগৌরবে লভ্য। শিক্ষায় ধন, ধনে কৌলীন্য। অতএব, আজকের মতোই মুসলমানসমাজে (এবং হিন্দুসমাজেও) কাঞ্চনকৌলীন্যের মর্যাদা সর্বোচ্চ :

ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হএ যত কুলীন মলিন।
ধন হোন্তে যথ কার্য পারে করিবার।

তুলনীয় : অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
অকুলীনে ঘোড়ায় চড়িব কুলীনে ধরিব জীন।

কবি মুহম্মদ খানের 'সত্য-কলিবিবাদ সম্বাদ' গ্রন্থে পাই :

ধনহীন দাতার বিপদে মনে দুখ
ধনবন্ত কৃপনে ভুঞ্জএ নানা সুখ।
নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনহীন স্বামীপ্রতি প্রেম ছাড়ে নারী।
মধুহীন ফুল যেন না লএ শুক-শারী।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক
ধন হোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর।
(সত্য ও কলির তর্ক)

হিন্দুসমাজের প্রভাবে মুসলমানসমাজেও কোনো কোনো বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। যেমন,

নারী বোলে আমি হই ধীবরের জাতি
আমাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।

আবার এহেন ধীবরসমাজেও আতরাফ-আশরাফ ভেদ আছে। তাই নবী সোলায়মানের সঙ্গে ধীবর-কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে ধীবর কন্যাকে ভর্ৎসনা করে বলছে :

জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে ভর্চ্চিবেক মোরে।

কথায় কথায় লোকে বংশগৌরবের গর্বও প্রকাশ করত :
ক্ষেত্রি বংশে জন্ম হই আমি দুইভাই।

ণ. বিবাহোৎসবে মারুয়া বাঁধত, জলুয়া দিত আর গন্ত ফেরাত এবং সহেলা গাইত। তেলোয়াই দিত এবং 'যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিত লেপন।' মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা, আঙুর, খোর্মা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আহার বলে গণ্য হত। সাবান ছিল না বটে, কিন্তু স্নানকালে—

অগুরু, চন্দন, আতর, কাফুর, কেশর,

লোবান সিঞ্চন্ত আর আবীর আম্বর।
যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবারে।

আর স্নানান্তে 'আবার যথেক সুগন্ধ আছে অঙ্গেত লিপিত' এবং 'সুর্মা-কাজল দোহ নয়ানেত দিত।' এছাড়া বাজি পোড়াত, নাচগান চলত, নানা বাজনা বাজত। এসব ছাড়াও নারীর আভরণ, যুদ্ধাস্ত্র, ফুল, বাজি, প্রসাধনসামগ্রী, শাড়ি, কাঞ্চুলি প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে রয়েছে।

আর যেসব উল্লেখ্য বিষয় রয়েছে তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হল।

নারীর আব্রু : মুছাএ বুলিলা তুমি হাঁট মোর পাছে
ভিন্ননারী দেখিবারে উচিত না আছে।

কন্যা সম্প্রদান : ক. শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান
বস্ত্র-অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান।
খ. সভানের আগে যে পড়এ কোরান
বিভা দিবা ফাতেমারে সেই বীর স্থান।
তবে সভানের মধ্যে কোলাহল ভাঙ্গিব
যে আগে কোরান পড়ে সে জনে পাইব

শুভলগ্ন : গ. সভানের বিদ্যমান দুহিতা করিলা দান
লগন পাইয়া শুভক্ষণ।

বিবাহোৎসবে : ঘ. সখীসবে কুমার কুমারী পাটে তুলি
জলুয়া দিলেন্ত দিয়া করি হুড়

দৈবজ্ঞ, অদৃষ্ট : পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা।
... শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

লোকাচার : ক. কুকুরের লোম যথা পড়িয়া থাকএ
সেই স্থানে ফিরিস্তা সকল না মিলএ
গাভীর গোবর যথা করএ লেপন
সেইস্থানে ফিরিস্তার নাহিক গমন।
বসন না থাকে যদি মুণ্ডের উপর
না হএ ফিরিস্তা সেই সভান গোচর।
খ. করপদ হোন্তে নখ কাটিতে উচিত
দেখিতে দীর্ঘল নখ লাগএ কুৎসিত।

ফাতেহাখানি, শ্রাদ্ধ : বাপের কারণে দান ধর্ম বহু কৈলা
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিলা।

স্বোপার্জিত ধন : ক. আপনার দুঃখের অর্জন দ্রব্য যেবা খাএ
এহলোকে পরলোকে সুখপদ পাএ।
শুদ্ধদ্রব্য খাইলে তার হএ বাক্য সিদ্ধি
প্রভূত যে-কিছু মাগে পায় নিরবধি।
খ. যাহার আছএ জ্ঞান না মাগএ প্রভু স্থান
যে দিবেক দেউক আপনে।

লৌকিক বিশ্বাস : ক. সর্পের উদরে আজাজিল প্রবেশ করেছিল
একারণে সর্পে গরল উপজিল।
খ. নিশি দিশি প্রহরে দূতবরে
কুক্কুটের মুণ্ডে সেই দণ্ডবাড়ি মারে।
দণ্ডাঘাতে সেই কুক্কুটে রোল কৈল যবে
পৃথিবীক কুক্কুট সবে রোল করে তবে।
গ. দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।

কদমবুসি : বাপের সোদর জ্যেষ্ঠ কাজিবে দেখিয়া
বসিতে আসন দিলা চরণ বন্দিয়া।

নৈতিক—
ক. আতিথেয়তা : কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জায়
এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পায়।

খ. মুমিনের কর্তব্য : অন্নবস্ত্র দান কর দেখিয়া দুখিত
মিছা বাক্য বহুল না বোল কদাচিত।
মিছাসাক্ষি না কহিবা না বুলিবা মন্দ
খেমহ মনের ক্রোধ খেমিবারে দণ্ড।
পরধন পরনারী না করিবা চুরি
মান্যজন সন্তোষিবা মনে মান্য করি।

গ. একাগ্রচিত্ততা : নয়ন চঞ্চল চিত্ত দশদিকে ফিরে
প্রভুর ভাবেত মন রহিতে না পারে।

ঘ. পিতৃভক্তি : জনকের বোলে পুত্র মরণ জুয়াএ।

ঙ. স্মৃতিপূজা : স্মৃতি পূজা ভাল নহে হেন।

চ. মহিমাপ্রচার : আপনেহ আপনা মহিমা না কহিও
আন হোন্তে আপনাকে অধিক না জানিও।
প্রচারিলা যদি সে মহিমা আপনার
সর্বথাএ টুটিব মহিমা আপনার।

জাদু ও টোনা : বুলিল তোমার আঁখি বান্ধিল টোনায়
টোনা করি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।

এতিমের প্রতি : রসুলে শিশুর বাপ নাহি হেন জানি
সজল নয়ানে বোলাইলা পুনি পুনি।

বংশগৌরব ও বর্ণ-বিদ্বেষ :

ক. নারী বোলে আমি হই ধীবরের জাতি
আমাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।
দেখিলা ধীবর সব পাতিয়াছে জাল
বাঝিয়াছে জালে মৎস্য অধিক বিশাল।

খ. ধীবরে শুনিলা যদি দুহিতার বোল
গালি দিয়া গঞ্জিবারে লাগিলা বহুল।
তাহাকে না চিনি তোকে দিমু কি কারণ
পুনি না কহিও মো'তে এমত বচন।
জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে ভর্ষিবেক মোরে।

গ. ক্ষেত্রি বংশে জন্ম হই আহ্মি দুই ভাই
সুচরিতা ভগ্নিক রাখিমু কার ঠাঁই।

হিন্দুয়ানি সংস্কারের প্রভাব :

ক. ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।

অথবা. রসুলে আরব সব করি মুসলমান
যোগপন্থ জানাইল জানাইলা জ্ঞান।

খ. দ্বিতীয় আকাশ হীরার এবং বৃহস্পতি সুরগুরু তাহার মাজার।
ষষ্ঠ আকাশ রজতের এবং দৈত্যগুরু শুক্র তাহার মাঝার।

গ. মৃত্যুর লক্ষণ : অধঃরেত শিবশক্তি লিঙ্গেত রহিল।
ইচ্ছাসুখে শিবশক্তি জীবাত্মা দিলা।

ঘ. যোগিনী : ১. ধরিনু যোগিনী বেশ কর্ণে নিমু কড়ি
এক হাতে পাত্র আর করে দণ্ডবাড়ি।
অঙ্গেত লেপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ
কোথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ।
২. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

উপমা-উৎপ্রেক্ষায় :
ঙ. রাহুর কোলেত যেন চন্দ্রের বসতি।
চ. পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।
ছ. যেন হনুমান ছিল শ্রীরামের বলে
জ. ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।

ঝ. সৃষ্টিপত্তন : আহাদ ও আহমদের পারস্পরিক দৃষ্টিরসে—
ঘর্ম থেকে মন্ত্র, তা থেকে সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড তারপর জীবাত্মা-পরমাত্মা
ও অনল বর্ণের জল সৃষ্টি।

ঞ. গন্ধর্ব : নবীর মহিমা শুনি গন্ধর্বের পতি
গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান।

ট. পশুপক্ষী সুরাসুরে যক্ষ দানব নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে।

ঠ. সিন্দূর : শিষের সিন্দূর মুছি কৈলা দূর।
ললাটে তিলক করি (সিন্দূর পরত)

ড. সূর্যপূজা : উদয় হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু
দিবাকর সবে প্রণামএ।
অনুদিন দিবাকর পূজি নরগণ।

ইসলামি সংস্কার—
সূফিতত্ত্ব :
ক. আদমের বাক্যশুনি নিরঞ্জনে কহে পুনি
সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার
তার মোর নহে ভিন এক অংশ পরাচিন

পিরীতি বড়হি মোর তার।

খ. তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন সংসারের সার
শত্রুমিত্র ভেদ নাহি নিকটে তোমার।
... সে যে প্রভু নৈরাকার ত্রিভুবন নাথ
ভালমন্দ সমসর তাহান সাক্ষাত।
[ত্রিগুণাতীত শিবের ধারণা স্মর্তব্য।]

গ. খদিজা ·
ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

ঘ. আল্লাহর উক্তি :
আপনার অংশে আমি সৃজিছি তোমারে
তুমি আমি একত্রে আছিল অনুদিন।
সভানের স্থানে তুমি নাই তোমার স্থান
সভানে ব্যাপিত হই আপনে রহিছ।

ঙ. মুহম্মদ আল্লাতে লীন ছিলেন :
পুষ্পেত আছিল গন্ধ ছাপাইয়া

জীবন :
জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।

শবদাহ :
যদিবা পূর্বের শাস্ত্রে আছিল লিখন
মৃত্যুকালে আনলেত করিতে দাহন।
আনলের সৃজন আছিল সেইকালে
তেকারণে আজ্ঞা দিলা দহিতে আনলে
একালের নর সব মাটির সৃজন
মৃত্যু হইলে মাটিতে গাড়িব সর্বজন।

ধার্মিকজীবন :
নুহ-নবীর বাণী
সর্বথায় না রহুক মূরতি সেবিয়া
পরধন পরনারী না করুক চুরি
সুরা পান না করৌক না করৌক দারি
মিছাবাক্য না কহৌক ধর্মে দেউক মন
পরহিংসা পরমন্দ তেজ সর্বক্ষণ।
পবিত্র রহৌক অতি সিনান আচার।

রসুলের বাণী :
পত্রেত আছিল লেখা নমাজ করিতে
মূর্তিসব না সেবিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে।

আর লেখে পৈতা ছিঁড়ি ফেলিতে ব্রাহ্মণ
আল্লার সেবাতে মন দেউক যত্তন।
কলিমা কহুক লই রসুলের নাম
পরনিন্দা পরহিংসা তেজিয়া অকাম।
মালের যাকাত দিব রোজা একমাস
মুসলমানি দীনসবে করিতে প্রকাশ।

শহীদ : যে সকল নরগণ রণে কাটা গেছে
সে সকল মরা নহে জীববন্ত আছে।

ক্ষমার অযোগ্য পাপ: মাত্র প্রভু চারিপাপ ক্ষেমিতে না হএ
প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ
বাপের মায়ের মন যদি না তোষএ।
ভিন্নজন প্রকারে যদি সে করে দাস
আপনা গুরুকে যদি করে উপহাস।
—এই চারি পাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব।

যমের ভূমিকা : মুঞি সে জানিও সব করিব সংহার
যুবতীর কোল হোন্তে লই যাইমু ভাতার।
বাপ হোন্তে পুত্র নিমু, পুত্র হোন্তে বাপ
যুবতীক হরি পুরুষক দিমু তাপ।
সহোদর হোন্তে নিমু সহোদরগণ
মিত্র হোন্তে মিত্র নিয়া করি অদর্শন।

জীবনবৃক্ষ : বৃক্ষ এক সৃজিয়াছে আকাশ উপর
সংসারেত জন্ম হয় যত জীবগণ
সেই বৃক্ষেতে জন্ম হয় এথেক পল্লব
সে পত্রেত লেখা আছে যথ জীবগণ
কথক্ষণে কথদিনে হইব নিধন।

আরবি রীতি : ক. দোষ খণ্ডাইতে যদি নারী ডালি পাইলা
রসুলে নারীর নাম হাজারা রাখিলা।
যে সকলে দোষ খণ্ডাইতে ডালি হএ
আরব সকলে তারে হাজারা বোলএ।

খ. সাগরে ভাসিয়া যাইতে যেবা পাএ যারে
আরবের লোকে মুসা করি ডাকে তারে।

রণনীতি : ভাল দ্রব্য দেখি রণে না করিবা মন
যেরূপে ভেদিবা ব্যূহ করিবা যত্তন।

বীরব্রত : কাফির সবেরে দেখি মনে পাই ভএ
রণেতে প্রবেশ তুহ্মি যদি না করএ।
এলাহির কৃপা তবে না হএ বিশেষ
সে সকল নরকেত করিব প্রবেশ।

রাজব্রত : অকর্ম করিলে শাস্তি দিবারে কারণ
ভালরূপে নরগণ করিতে পালন।
মহাজন সকলেরে করিতে গৌরব
দুর্জন অশিষ্ট হৈলে করিতে লাঘব।
নৃপতিএ যদি ভাল মন্দ না বিচারে
সেদেশেত উচিত না হএ রহিবারে।

হযরত মুহম্মদ মহিমা :

ক. মুহম্মদ নামে তান প্রধান রসুল
পৃথিবীতে কেহ নাহি তান সমতুল।
তান প্রীতিরসে ভুলি প্রভু নিরঞ্জন
সৃজন করিলা প্রভু এতিন ভুবন।

খ. আহাদ আহমদ মহানুর ভিন
এই মহানুর মধ্যে ত্রিভুবন্ চিন।
আহমদ হোন্তে নুর কৈলা মহানুর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।

গ. যে দেখিল নুর মোহাম্মদের বদন
জগতেত আউলিয়া হৈল সেইজন।
যে দেখিল মুনি মোহাম্মদের লোচন
জগতেত পণ্ডিত হৈল সেই জন।
পিষ্ঠভাগে নুরের দেখিল যেই সবে
কাফির হইয়া সেই জন্মিলেক তবে।

নারকীর তালিকা :

ক. আল্লার সমান হেন আছে জানে।
খ. রসুল সবেরে যদি কেহ মিছা কহে।
গ. প্রলয় না হৈব বুলি যে-সকলে বোলে।
ঘ. হিসাব (হাসর) না হৈব বুলি যে সকলে বোলে
ঙ. যেখানের মাটি হোন্তে হইছে সৃজন
সেখানেত যদি বোলে না হৈব নিধন।

চ. নমাজ না পড়ে যেবা রোজা না রাখএ
ছ. কলিমা পড়ে যেবা না করে জাকাত
যাইতে পারিলে যদি না যায় মক্কাত।
জ. যে সকলে সুরা পান করিতে আছএ
ঝ. রজঃস্বলা নারী যদি করএ বেভার
ঞ. মাতাপিতা গুরু না মানে যেই জন
ট. পরনিন্দা পরচর্চা পর অকাম কহএ যদি
ঠ. মনুষ্যের অকর্ম প্রচারে যেইজন
ড. ফকির দরবেশ আগে করিলে বড়াই
ঢ. আলেমে নয়ানে দেখি মান্য না করিলে
ণ. রতিভুঞ্জি যে সকলে না করে গোসল
ত. পরনারী দেখিয়া লোভে দৃষ্টি করে
থ. ইষ্টমিত্র ভাই বন্ধু না করিলে দয়া
দ. সাচা সাক্ষি না দি' যদি মিছা সাক্ষি দিল
ধ. নৃপতির আগে কিবা পাত্রগণ স্থান
যাই যদি 'না ডরাই' কহে কোন জন।
ন. পরের সম্পদ দেখি যে করে পিষুণ
প. ভিক্ষা করিবারে যদি আইল দুয়ারে
গালি দিয়া কহে যদি বোলে মারিবারে।
ফ. কেহ যদি কার ধন বল করি লয়
ব. দুই জন মধ্যে যদি ভেজায় কোন্দল
ভ. পিতাহীন শিশুর কাড়িয়া খাইছে ধন
ম. যে সকলে বাড়াধন তঙ্কা লাগাই খাইছে
য. অনুদিন পতিসনে করিয়াছে দ্বন্দ্ব
র. আন কার্যে যদি দিয়া থাকে গুপ্ত কড়ি (ঘুষ)।   ইত্যাদি।

ফুলের নাম :   মাধবী মালতী লতা চম্পা নাগেশ্বর
জাতী যুথি লবঙ্গ কেতকী বহুতর।
বকভূমি কেশজ যে টগর ভূরাজ।

নারী সম্বন্ধে :   ১. পতি যে নারীর গতি পতি যে ভূষণ
পতি যে কণ্ঠের হার পতি যে জীবন।
পতি বিনে অলঙ্কারে কিবা আছে কাজ
না শোবে বিধবা নারী রমণী সমাজ।
২. বেলন পাটের খোপা শোভএ উপাম।
৩. ত্রিয়াজাতি বড় শক্তি   নানা উপদেশ ভক্তি
দম্পতির মধ্যে যে উত্তম।

অনুশোচনা মাহাত্ম্য :

আঁখির পড়িত জল অনুশোচ করি
আপনা মানিয়া মন্দ ধর্ম অনুসারি
নয়নের জলে পাখালিয়া যাইত পাপ
মন দুঃখে দূর হইত মনের সন্তাপ।

গুরুনিন্দা :

তেকারণে গুরুনিন্দা করে যেই সকল
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিষ্ফল।

জ্ঞান :

১. পৃথিবীতে জ্ঞান হোন্তে ভাল নাহি আর
নিরঞ্জন সহিতে দর্শন হয় তার।
জ্ঞান যদি পাইল না লঙ্ঘে তারে পাপে
যথেক অকর্ম দূরে যাএ জ্ঞান তাপে।

২. জ্ঞানের কারণে নহে পাপেত প্রবেশ।

মানবিক বৃত্তির সুকোমল প্রকাশ :

ক. মাতৃস্নেহ :

জননী পুত্রেরে ধরি শিরে দুই করে
রাখিছিলা কতক্ষণ শিরের উপরে।

খ. করুণা ও মুক্তিপণ :

এ সবে (যুদ্ধবন্দি) আপনা প্রাণ ধনে লউক কিনি
প্রাণ রক্ষা করহ না কাট আর পুনি।

গ. খদিজার গুণ :

পূর্বে বিবি খদিজাএ করের কঙ্কন
দুহিতাক দিয়া ছিল জড়িত রত্তন।
স্বামী উদ্ধারিতে সেই কঙ্কন পাঠাইলা
সে কঙ্কন রসুলে খদিজার হেন চিনিলা।
রুদিতে লাগিলা নবী খদিজাগুণ স্মরি
দুহিতার পতির নাম বহুল বিসারি।
মনে সেই স্নেহ ভাবি করিলা কান্দন
দুহিতার ফিরাইয়া দিলা সেই কঙ্কন।

ঘ. খদিজার মৃত্যুতে রসুল :

কঠিন পাষাণ দেহ না যায় বিদার
তাহান বিচ্ছেদ আহ্মি নারি সহিবার।
দোহান যদি একত্রে মরিয়া যাইত
তবে কার শোক কার মনে না লাগিত।

ঙ. রসুলের বাৎসল্য (ফাতেমার প্রতি) :

মোহোর যে প্রাণের প্রাণ তুমি বিনে নাহি আন
তুমি মোর আঁখির পুতলি
মোর চিত্ত বৃক্ষফল তুমি গন্ধ সুশীতল
হৃদয় লতার তুমি কলি।

চ. ইটের গোহারী : (রসুল) মোরে দহি খণ্ডাইল বেদনা আপনার
না চিন্তিলা নিজমনে বেদনা আমার।
আপনার শরীর কিবা আনের শরীর
একদেহ হেন জানিতে উচিত নবীর।

ছ. জ্ঞাতিপ্রীতি : এক মোর জ্ঞাতিগণ, আর ইষ্ট জন
কার্য নাই এ সকল করিতে নিধন।
নারী সব বিধবা হইয়া গালি দিব
মোর প্রতি জ্ঞাতি সব অযশ ঘোষিব।

জন্মভূমি : জন্মভূমি পুণ্যদেশ দেখিবারে শ্রধা ৰেশ
স্মরণে হৃদয় ফাটি যায়।

প্রাণের মর্যাদা : আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন।

দেশে ঝড়বৃষ্টির রূপ: ঝড়বৃষ্টি হৈল অতি অন্ধকার হৈল রাতি
বিজুলি চমকে ঘন খন
কাকে কেহ না দেখএ আত্মপর পরিচয়
না পাওন্ত আববের গণ
অশ্বউট সারি সারি রহিল ভূমিত পড়ি
কোন দিকে যাইতে নারিলা
যত তাম্বু সামিয়ানা ধ্বজছত্র যথ বানা
বাতাসে উড়াই যথ নিলা
আপনার হাত পাও না দেখে আপনা গাও
না দেখে আপনে আপনারে
বরিষএ অনিবার নিশি হৈল অন্ধকার
কেহ কারে চিনিবারে নারে।

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ : রথ, হস্তী, অশ্ব, বাণ, শেল, গদা, ভিন্দিপাল, গুর্জ, নারাচ, নালিকা, সিফর, মুদ্গর, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, চন্দ্রবাণ, বজ্রবাণ, বিষবাণ, খঞ্জর ইত্যাদি।

অলঙ্কার : সোনার অঙ্গুষ্ঠ আনি শ্রবণে পরাইলা
ফুলিফুটি পিন্‌তুর পরিল শ্রবণে।
কঙ্কন, অম্বর (কটির চন্দ্রহার), নূপুর, কিঙ্কিণী, মুক্তাহার, কুণ্ডল।

পোশাক : কাবাই, বেলন পাটের শাড়ি, ঘাঘরা, কাঞ্চুলি।
প্রসাধন সামগ্রী : অগুরু, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, সিন্দূর।

হিন্দুর পার্বণিক পূজাচিত্র : (রাজা দানিয়ালের প্রাসাদে) :

১. সভান সহিতে রাজা মূরতি পূজএ
আনন্দ উৎসব সবে বহুল করএ।
পুষ্ট অজা আনিয়া দেয়ন্ত বলিদান
কার্স করতাল বাহে করি সুরা পান।
কেহ সভা মধ্যে নারী করএ শৃঙ্গার
লাজ ভয় এক নাহি পশুব্যবহার।
পশু মেলে পশু যেন শৃঙ্গার করএ
তেহেন শৃঙ্গার করে মনুষ্য মেলএ।
শঙ্খবাদ্য নানা যন্ত্র বাহে লাসবেশে
কাক মনে ভয় নাহি মনের উল্লাসে।

২. সিনান করিয়া তবে যত পাপিগণ
যন্ত্রসব আনিয়া যে করন্ত নাচন।
পুষ্ট অজা আনিয়া যে দেয়ন্ত বলিদান
নাচন্ত গাহন্ত সবে সভা ৰিদ্যমান
লক্ষ লক্ষ অজা আনি সমুখে রাখএ
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু মূর্তিরে বোলএ।

মিশর ও শামের মধ্যবর্তী হামসা রাজ্যের নৃপতির দুর্নীতি :

১. বস্তুজাত লই তথা (হামসা) গেলে সাধুগণ
অবিচারে 'দান' লয় লুটে সর্বধন।
বলে ছলে ঘাটিয়াল পাপী দুরাচার
বহু 'দান' সাধে আজ্ঞা পাই নৃপতির।
লয় যথ ধন দেখে সাধুরে না দিয়া
ভাল দ্রব্য যথ পাএ লই যাএ লুটিয়া।

২. আর এক কর্ম করএ দুরাচারে
নারী যদি সঙ্গে আনে সাধু সদাগরে।
সুচরিতা নারী পাইলে লই যাএ কাড়িয়া।...
নিষ্ঠা আছে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী
নৃপতি শৃঙ্গার করে সে নারীক ধরি।

সায়রার (সারা) স্বয়ম্বর-সভা :

রাজাসব পরি আইল উত্তম বসন
নানা অলঙ্কার যথ করিয়া ভূষণ।
অশ্ব আরোহণ করি, গজ কান্ধে চড়ি
আইল গন্ধর্ব যথ তেজি সুরপুরী।
রাজাসব বসিতে আসন আনি দিলা
একে একে সিংহাসনে সকল বসিলা।
চতুসম মৃগমদ ভৃঙ্গারের জল
কস্তুরী কাফুর যথ সুগন্ধি সকল।
নৃপতি আপনা করে সহরিষ মন
রাজা সকলের গাএ করিয়া লেপন।
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল আগে দিয়া
সভনের সমুখে রহিল দাণ্ডাইয়া।
মোহোর নন্দিনী ইচ্ছাবর মাগে নিত
বিবাহ বসিতে চাহে সুবর সহিত।

কন্যাবিদায় ও যৌতুক :
(সায়েরা-ইব্রাহিম দম্পতি)

জনকজননী দুই কান্দিলা অপার
একই দুহিতা ছিল না ছিল আর।
আজ্ঞা দিলা পতির সহিত যাইবার
বহুল যৌতুক আনি লাগিলা দিবার।
দাসদাসী অশ্বউট বহু অলঙ্কার
দিলেক বহুল আনি কুমারী নিবার।

(ইব্রাহিম)

রসুলক সম্বোধিয়া বুলিলা নৃপতি
মোহোর দুহিতা যাএ তোমার সংহতি।
ভালরূপে গৌরব করিবা তুমি তানে
বিরস না জন্মে হেন কুমারীর মনে।
[তুল : কুলীনের পো তুমি কি বলিব আমি
হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও, পেট পূরে ভাত—
শিবায়ণ, মধুমালতী, সিকান্দরনামা]

আবদুল্লাহ্র রূপ

মুণ্ড অতি সুগঠন চিকুর নিন্দিয়া ঘন
কস্তুরী জিনিয়া আমোদিত।
ললাটের পাট অতি ঝলকে নির্মল জুতি
ঘর্ম বিন্দু মুকুতা গুথিত।
জিনি ধনুর্গুণ বাণ লোচন সুকামান
মৃগাক্ষ খঞ্জন গঞ্জন

নাসা তিল ফুল জিনি   যেন গরুড় ফণী
সুগন্ধি নিশ্বাস বহে ঘন।
সুন্দর শরীর অতি   গঠন সুবেশ ভাতি
মুখপদ্ম জিনিয়া প্রকাশ
অধর সুরঙ্গ অতি   দশন মুকুতা পাঁতি
হাস অতি সুধা রস ধার
সে মুখের 'পর জ্যোতি   ঝলএ সঘন অতি
দিবাকর কিরণ প্রকার।
অঙ্গের সুগন্ধি পাই   ষটপদগণে ধাই
উড়ি পড়ে জানিয়া উদ্যান
পুষ্প হেন অনুমানি   মকরন্দ হেন জানি
শ্রম জলে করে গিয়া পান।

মুসলিম বিবাহোৎসব :

ফাতেমার বিবাহ : নারী সব আপনার ডাকিয়া রসুলে
সভানেরে আদেশ করিলা কুতূহলে।
তুহ্মি সবে বিবি ফাতেমাক বিভা দিতে
উপহার দ্রব্য আনি রাখ সমাহিতে।
রসুলের মুখে শুনি উৎসবের কথা
যথেক মহিষীগণ হইলা উল্লসিতা।
মাবিয়া কিব্রিক ডাকি রসুলে কহিলা
সুগন্ধি সকল সজ্জা করিতে বুলিলা।

স্নানের উপকরণ : আগর চন্দন আতর কাফুর কেশর
লোবান সিঞ্চন্ত আর আবীর আম্বর
যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবারে।
যথ বিবিগণে মিলি গোসল করাইলা
শুকুল বসন সব অঙ্গেতে পরাইলা
যথ আভরণ আছে পৈরাই সকল
আকাশেত শশী যেন উদিত নির্মল।
যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেত লিপিলা
সুর্মা কাজল দোহ নয়ানেতে দিলা।
শিশি 'পরে রাখিলেন্ত আবীরের রেণু....

ভোজ : ভালরূপে করিলা বিভার মেজোয়ানি
উপহার দ্রব্য যথ খাইতে দিলা আনি।

নারী মজলিশ : বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ
নারীমেলে বসিলেন্ত যথ নারীগণ।

আপ্যায়ন : অন্ন এই সবেরে করাই ভোজন
যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিলা লেপন।
মধু ঘৃত দধি শর্করা যথেক আনিয়া
যুবতী সকলে খাইবারে দিলেক আনিয়া।
উপহার ফল যথ দিল খাইবার
আঙ্গুর খোরমা আদি বিবিধ প্রকার।

সহেলা : ফাতেমাকে বিভা দিতে আসিয়া সকল
'সহেলা' গাহন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।
আইসরে আইসরে গাই
ফাতেমার বিবাহ মঙ্গল। ধু.

বিবাহমঙ্গল : সে সকলে বিভা করে ফাতেমা বিবির বরে
জন্ম জন্ম রহুক কুশল।
যথ কুলবতী নারী বস্ত্র অলঙ্কার পরি
দেখ আসি ফাতেমার বিহা
ফাতেমার বিভা দেখি বর মাগ হৈয়া সুখী
পতি সনে হইতে স্নেহা।

বিবাহের আসর-সজ্জা : যথেক আরবগণ হই হরষিত মন
বান্ধিল আমাল (আলাম?)
চারিদিকে মারোয়ার অন্তস্পট শোভাকার
চতুর্দিক শোভে ঝলমল
কিমিজের তাম্বু অতি চমকে বিজুলি জুতি
স্থান স্থানে টানাই রাখিলা
মুকুতা প্রবাল জ্বলে চৌদিকে চামর দোলে
যথ আর চান্দোয়া টানাইলা।

বাদ্য : চর্তুসমে ভরি অঙ্গ করন্ত বিবিধ রঙ্গ
কবিলাস রবাব বাজাএ
ঢাক ঢোল দারি কাঁসি মৃদঙ্গ দোতারা (দোছড়ি) বাঁশি
বাজায়ন্ত ভেউল কন্নাল
দুন্দুভির শব্দ অতি মোহরি (ডম্বুর) ঝাঁঝরি তথি
দফ-ভঙ্গ শুনি লাগে ভাল
উন্মত্ত যৌবন নারী নানা বর্ণ বস্ত্র পরি

আনন্দে সহেলা সবে গাএ।

মারোয়া

সেই মারোয়ার তলে   সুগন্ধি দেউটি জ্বলে
বহুল ফানুস জ্বলে নিত [লোবান সিঞ্চন্তি সবে নিত]
মোজামির সারি সারি   জ্বলেও চৌদিক ভরি
নিমাসন (?) সুগন্ধি পূরিত

ফাগুয়া

আবীর আম্বর আনি   মিলি যথ নারীগুণী
কৌতুকে লইয়া মুঠি ভরি
কেহ কার অঙ্গে গিয়া   মনেতে হরিষ হৈয়া
অঙ্গেত লেপন্ত মায়া ধরি।
হাস লাস সবে করি   কস্তুরী চন্দন পুরি
উল্লসিত সব নারীগণ।

বিবি ফাতেমার অঙ্গে   আনন্দ কৌতুক রঙ্গে
মহাসুখে তেলোয়াই চড়ায়ন্ত।

কনে স্নান

এয়ো সই মিলি   করি অতি হুলাহুলি
ফাতেমার অঙ্গে সুগন্ধি লিপিল
সাতদিন সাতরাতে   তেলোয়াই করন্ত নিতি
জুমাবারে করাইলা গোসল,
সুগন্ধি পূরিত তনু   শিরে আবীরের রেণু
পৈরাইল বসন উঝল (অমূল)।

বরের গস্ত ফিরানো

যথেক আরবে মিলি   শাহ্ মর্দ আলি
গস্ত ফিরাই আনাইলা।
পরাই শুকুল বাস   মোজামির জ্বলে চারিপাশ
চারিদিকে দিউ জ্বালিয়া

বাজি :

হাউই ছোড়ন্ত নিত   মহাতাপ প্রজ্বলিত
নিশি হৈল দিবস আকার।
আগর চন্দন পরি   বসাইল আমোদ করি
চলিলেন্ত অতি শোভাকার

নাটগীতি

নাটুয়ায় করে নাট   রহি রহি বাট বাট
যন্ত্রসব বাজে চারি ভিত
নানা শব্দে বাদ্য বাজে   ভেউল কন্নাল সাজে
শুনি সর্বজন উল্লসিত।

তকবীর : সর্বলোকে অবিশ্রাম লয়ন্ত আল্লার নাম ·
তকবীর বোলন্ত অবিশ্রাম।

বিয়ের খোৎবা : দুই পক্ষ একত্তর ঠেলাঠেলি বহুতর
লাগিলেন্ত খোতবা পড়াইবার
রসুলে আপনা মুখে নিকাহ পড়াইলা সুখে
চারি শর্ত করাইলা কবুল

জলুয়া [বর-কনের সাক্ষাৎ] :
তক্তেত দোহান তুলি সভান জলুয়া বুলি
আশীর্বাদ করিলা বহুল
দামাদ কনিয়া দেখি অন্যে অন্যে হৈলা সুখী
দেখে অতি জন্মিল পিরীত।

রণবাদ্য ও ধ্বজছত্র : ধ্বজ ছত্র পতাকা নানান বাদ্য বাজে
ভেউল কন্নাল শিঙ্গা নানা শব্দে সাজে।
দুমদুমির শব্দে মেদিনী টলমল
প্রলয় হৈল হেন জানিল সকল।

শিক্ষা (ইদ্রিসকে) : পড়িবারে উপাধ্যায় হাতে সমর্পিলা
নিরঞ্জনে ফিরিস্তা পাঠাই প্রতিনিত
শিশুকে পড়াই কৈলা জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
পণ্ডিত হৈল যদি বড়ই অপার
ইদ্রিস করিলা নাম থুইলা তাহার।

বিবি হাওয়ার বারোমাসীতেও বাংলাদেশ ও বাঙালি নারীকে পাই :
জ্যৈষ্ঠ অশিষ্ট ভেল তাপিত তপন
কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন।
দক্ষিণ সমীর মোর শমন সমান
অনল হইয়া নিতি দগধে পরাণ।
আষাঢ়ে সংসার ভরি জলে ব্যাপিত
পিউ পিউ পক্ষী নাদ অতি সুললিত।
আহ্মার চাতক পিয়া রৈল দেশান্তর
জলদ হইয়া আহ্মি আছি একসর।
শ্রাবণ সঘন বরিখএ জল ধারে
গিরি 'পরে শিখী সবে সুখে নাদ করে।
মুঞি পাপী শিখিনীর জল নিল হরি
সন্তাপে সাগর মধ্যে রহি একসরী।

ভাদর মাসেত অতি বরিখে গম্ভীর
ঘোর অন্ধকার নিশি শূন্য এ মন্দির।
কীট সব কোলাহল শুনি মনে ভীত
একসর শয়নে কম্পিত চিত নিত।...
(আশ্বিনে) কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করহুঁ লেপন
চন্দ্রিমার জোত মো'ত লাগে হুতাশন।
ইত্যাদি

গ. মনোহর মধুমালতী [মৎ-সম্পাদিত]
মুহম্মদ কবীর বিরচিত (পনেরো-ষোলো শতক)

আমাদের সাহিত্যে মনোহর-মধুমালতীই সম্ভবত রূপকথাভিত্তিক প্রথম প্রণয়োপাখ্যান। এটিও ফারসি বা হিন্দি থেকে অনূদিত কাব্য। কবি মুহম্মদ কবীর তাঁর কাব্যে রচনার সাল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুটো পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত দুটো পাঠে মিল নেই। একটাতে আছে :

অন্ত অন্তে অন্ত রয় সিন্ধু তার পাছ
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ।

অপরটাতে রয়েছে : অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গরস বিন্দু তাঁর কাছ
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ।

বিদ্বানেরা আনুমানিক বিশুদ্ধ পাঠ নির্মাণ করেছেন নিম্নরূপে :

১. অন্ত সঙ্গে অঙ্গ রয় সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ
২. অঙ্গ অন্তে অন্ত রয় সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ।
৩. অঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ রয় সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ।
৪. অন্ত সঙ্গে রয় রস সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ।

এর থেকে যথাক্রমে ১৫৭৯ বা ১৫৭২, ১৪৯২ বা ১৪৮৫, ১৪৮৩ বা ১৪৭৬, এবং ১৫৮৯ বা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ মেলে। অতএব কাব্যটি-যে ষোলো শতকের পরের রচনা নয়, তা নানা প্রমাণেও অনুমানে বিশ্বাস করতে হয়।

মুসলমান কবি যেমন 'বাণী' স্মরণ করে লেখনী ধারণ করেছেন, তেমনি হিন্দুরাজাও মুসলমান ওলি দিয়ে নবজাতকের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাচ্ছেন এবং ভাগ্য

গণনা করাচ্ছেন :

ওলিগণে গুণিতে মাগিতে লাগিল।
ভাল মন্দ কুমারের সকল গুণিল।

শুধু তা-ই নয়, এখন থেকে ভূত-পেতনি নয়, পরিও হিন্দু নায়ক-নায়িকার প্রণয়-সহায়। হিন্দুরাজা অভিষেকউৎসবে মুসলিম পোশাকে ভূষিত হয়েছেন :

মণিকলা পাগ শিরে থোপা থোপা মুক্তা ঝরে—
সুবর্ণ কাবাই দেহ 'পরে।

দরবারের পরিবেশটাও মুসলিমপ্রভাবিত। তাই অভিষেক-অন্তে :

রাজা উজিরেহ করিলা সালাম।

সেকালে রাজবাড়িতেও 'মঙ্গল'গান হত। তাতে—

রাজ্যে যথ লোক ছিল 'মঙ্গলা' শুনিয়া আইল
নাট গীত বাদ্যের কল্লোলে।

এতে থাকত :

মন্দিরা মৃদঙ্গ কাড়া শিঙগা ঢাক দোতারা
শঙ্খ সানাঞি কর্ণাল ফুকরে।
মধু বেলি চঙ্ক বাঁশি নানা বাদ্য রাশি-রাশি
যথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে ॥

এমন 'মঙ্গল'গানেও নর্তকীর নাচ ছিল :

নর্তকীর দেখি সাজ মোহ যায় দেবরাজ
নাচে যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী।

শুধু তাই নয়, অন্য লোকরাও—

কেহো নাচে কেহো গাএ কেহো হাসি যন্ত্র বাএ
রস রঙ্গ কৌতুক অপার।

সে-যুগে চিত্রল ছাঁদের কুণ্ডল, সপ্তছড়ি মুক্তার হার, বিচিত্র কাঞ্চুলি, হেমরি শাড়ি, নূপুর, কঙ্কণ, বাজু প্রভৃতি রাজ-অন্তঃপুতিকাদের অঙ্গাভরণ ছিল। রাজকন্যারও সতীত্ববোধ ও সমাজচেতনা শিথিল ছিল না :

শুনি লোকে দিব লজ্জা হৈলুঁ কলঙ্কিণী ॥
কি মুখে বসিমু মুঞি নারীর সভাত।

ডাকিনী-যোগিনী প্রভাবজ তুক-তাক-টোনায় বিশ্বাস তখনো প্রবল ছিল। মালতীকে তার মা রূপমঞ্জরী নিজেই পড়ে 'পাখি' করে দিলেন।

নদীমাতৃক এ দেশের নৌকার বর্ণনা যথার্থই হয়েছে :

নব ইন্দু ছন্দ জিনি নৌকার গঠন।
আগে পাছে গাছল দোলএ ঘন ঘন ॥
রজতের বৈঠা সব হেম কেরুয়াল।
চলিতে চঞ্চল অতি না ছোঁএ কিলাল
তবু, নদী পার হৈতে সবে জপে প্রভুনাম ॥

মনোহর-মধুমালতী বিয়ের আগে মিলিত হচ্ছে। মিলনটা গান্ধর্বরীতিসম্মত

তোহ্মা সনে আদ্যে আহ্মি দঢ়াই করিছি।
সেই ধর্ম বাক্য আমি মনেত রাখিছি ॥
অন্যে অন্যে দোহানের ধর্মাধর্ম ভেল।
তবে সে লজ্জার বাস দোহান দূরে গেল ॥

ঘ. লায়লী মজনু [মৎ-সম্পাদিত]
দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত

দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সম্পাদিত লায়লী-মজনুর ভূমিকায় আমরা নানা তথ্যের প্রমাণে ও অনুমানে তাঁকে ষোলো শতকের কবি বলে স্বীকার করেছি। তাঁর এ কাব্যের আনুমানিক রচনাকাল ১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ। কবির আরেকটি রচনার নাম 'ইমামবিজয়'— এটি কারবালা যুদ্ধবিষয়ক। অধ্যাপক আলী আহমদের সম্পাদনায় প্রাক্তন 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রকাশিত। লায়লী মজনু কাব্যেরও আদি আবিষ্কারক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

ইমামবিজয় [আলী আহমদ সম্পাদিত]

যুদ্ধবিদ্যা : মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ অনেক শিখাইল
গুরুজ বহুমণি ফিরাইতে লাগিল।
পঞ্চশর দশশর আর সপ্তশর
একে একে শিখিলেন্ত কৌতুক অন্তর।
অগ্নিবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইল বহুত
চন্দ্রবাণ সূর্যবাণ দেখিতে অদ্ভুত।
সর্পবাণ ক্ষুরবাণ শিখিলা নিশ্চিত
নেজাবাজি বাণ শিখিলেন্ত প্রতিনিত।
খড়গ বর্ম বিদ্যা পুনি শিখিলেন্ত অতি

অশ্ব আরোহণ শিখিলেন্ত মহামতি।

যুদ্ধ : অসুরের রণ কিবা সুরের সংগ্রাম
রাক্ষসের যুদ্ধ কিবা নাহিক উপাম।....
পুত্রক ছাড়িয়া বাপ ধাএ প্রাণ লৈয়া
বাপ তেজি পুত্র ধাএ না চাহে ফিরিয়া।...
রথরথী যত ইতি অনেক বিস্তর
অদ্ভুত সৈন্যসব অপরূপ বেশ।
সায়ী সারি মত্ত গজ অধিক বিশেষ।

মুসলিম নারীর অলঙ্কার ও বিলাপ :

আউল মাথার কেশ বাউর মলিন বেশ
সঘনে হানএ নিজ হিয়া
তেজিল কণ্ঠের হার খসাইল অলঙ্কার
মুছিলেক শিরের সিন্দূর
ভাঙ্গিল হস্তের চুড়ি অঙ্গুরী ফেলিল গুড়ি
বেশর করিল পুনি দূর।
কান্দএ দীঘল রাএ প্রাণ বিদারিয়া যাএ
হা হা মোর প্রাণের সাঙ্গাত।

পুন : আউল চিকুর অতি বাউল চরিত

গোলাপজল : গোসল করাইল শির গোলাপের জলে।

চন্দনের ব্যবহার : চন্দনে লেপন করি রাখিলেন্ত থালে।

কূটনীতি : দুষ্ট সনে বিবাদের নাহি কোন ফল
কাল অনুরূপ কর্ম করিবা সকল।

লায়লী মজনু (সমাজ ও সংস্কৃতি)

কবি লায়লী-মজনুকে ইসলাম-পূর্বযুগের আরব বলে কল্পনা করেছেন। তাই পুত্র কামনায় কএসের পিতা 'নিরঞ্জন নামজপে জানিয়া সাফল' আর 'ধর্মপদ ভাবএ সারতত্ত্ব জ্ঞানে।' 'অধিক ধেয়াইয়া ধর্ম আরাধিয়া পাইলুঁ গুণের ধাম।' তিনি জানেন পুত্র দিয়ে 'সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম' হয়।

অদৃষ্ট, কর্মফল · মুঞি অতি শুভকর্মা সাফল্য জনম।
জনমে জনমে দেবধর্ম আরাধিলুঁ
যে সব পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ।

প্রসন্ন হৈল মোর দেব পরমার্থে।
অশেষ করিয়া দেবধর্ম আরাধন।
তুহ্মি পুত্র পাইয়াছি অমূল্য রতন।
বিশেষ কর্মের দোষে পুনি হারাইলুঁ।
নির্বন্ধ খণ্ডাইতে পারে শকতি কাহার।
কর্মের লিখন দুঃখ খণ্ডান না যাএ।
কর্মে যে ব্যাধি তা নহে ঔষধে দমন
বিঘট কর্মের দোষ না যাএ খণ্ডন।
তুহ্মি দেব ধর্মশীল গুণ নিধি গুরু।

প্রভৃতিতে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ তো রয়েইছে; তাছাড়া বৌদ্ধ-প্রভাবজ 'আল্লাহ' অর্থে ধর্ম, পুন্নাম নারকতত্ত্বের ছায়া এবং 'দেব-ধর্ম', আরাধনার কথা পাই।

কবি মরুভূ আরবের কাহিনী বর্ণন করেছেন। কিন্তু আরবের মরুপ্রান্তর বা মরূদ্যানের সন্ধান মেলে না এ-কাব্যে। কেবল একবার শিবিরের কথা (লায়লী 'শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে') একবার প্রদক্ষিণ করে গুরু ও মান্যজনকে সম্মান করার কথা (সপ্তবার প্রদক্ষিণ কৈলা উজপিত), এবং যৌতুকস্বরূপ উট দান ও উটের পিঠে চৌদোলে বসে লায়লীর শামদেশে গমন— এটুকুই এ কাব্যে আরবি আবহ। আর সব দেশী। তাই নজদ বনেও এদেশী বুনো পশুপাখিকেই দেখি। হিন্দুপুরাণের প্রতুল ব্যবহারে, ঘরোয়া জীবনচিত্রে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় কিংবা রীতি-নীতি ও আচার-সংস্কারের আলেখ্যে কবি তাঁর চোখে-দেখা প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই স্বীকার করেছেন। ফলে এ কাব্যে আমরা আরবি বিনামে বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনেরই ছবি পাই।

বিদ্যা ও বিদ্যালয় : পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা 'গুরুর চরণ ভজি, কুতুহলে চিত্ত মজি, শাস্ত্রপাঠ পড়ন্ত সদাএ।'

সে-কালেও বিদ্যা ও বিদ্বানের কদর ছিল :

ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার
বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার।
পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম
গুণ না থকিলে তার রূপে কিবা কাম।
পুরুষ বাখানি যদি হএ গুণধাম

কিন্তু নারীশিক্ষায় তেমন গুরুত্ব বা উৎসাহ ছিল না। পতিব্রতা হতে পারলেই ওদের জীবন সার্থক :

যুবতী রাখানি যদি পতিব্রতা নাম।

নাচ-গান-বাজনা ও চিত্র :
রণবাদ্য ছাড়াও ঘরোয়া উৎসবে পার্বণে নাচ, গান-বাজনা ও কথকতার ব্যবস্থা থাকত।

উজির হামিদ খানের দান-ধ্যানের কথা নর্তক ও গায়েনের মুখেই দেশময় প্রচার হয়েছিল।

নাটক গাইন গণে সত্য যথ কৃতি ভণে
প্রকাশ হইল সর্বদেশ।

লায়লীর বিয়ের সময় 'বিবিধ প্রকার বাদ্য অনেক বাজন'-এর ব্যবস্থা হয়েছিল :

উচ্চ রব দামা সব গর্জিত আকাশ
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কনাল
অনেক মধুর বাদ্য বাজাএ বিশাল।

কএসের শৈশবে তার জন্যে আমীরের বাড়িতে নর্তকী-গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রাদির সুব্যবস্থা হয়েছিল :

নৃত্যগীতি নানা রঙ্গ কুতূহল
নৃত্য দেখিবারে দিলা নটক সুন্দর
নৃত্য গীত নটরঙ্গ যন্ত্র যথ ইতি।

আর নানাচিত্রও ছিল : পটেত বিচিত্ররূপ দিলেন্ত লিখিয়া।
মেয়েদের মধ্যেও নাচগান চালু ছিল : লায়লীর বিয়ের সময় লায়লীর সখীদের কেহ করে নৃত্য, কেহ গাএ গীত, কেহ বসি রঙ্গ চাএ।

নারী সম্বন্ধে ধারণা ও সমাজে নারীর স্থান :

মেয়েরাও প্রাথমিক শিক্ষা হয়তো পেত, কিন্তু তাদের উচ্চশিক্ষা দেবার উৎসাহ বোধহয় অভিভাবকের ছিল না। সতীসাধ্বী ও পতিব্রতা হওয়া ছিল নারীজীবনের আদর্শ। কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তা হওয়া ছিল তাদের অপরাধ। তাই লায়লীর মায়ের মুখে শুনি :

শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত
ভাবিনী হইতে তোর না হএ উচিত।
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।

মেয়ের মতিগতি দেখে সন্দেহ জাগলে এ-যুগের মা'রা যেমন করেন, লায়লীর মাও কএসের সঙ্গে মেয়ের 'ভাব'-এর কথা শুনে সে-ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন :

আজি হোন্তে তেজহ চৌআড়ি পাঠশাল
কুলের মহিমা নিজ রাখহ আপনা।
লুকাইলা লেখনী ভাঙ্গিনী মস্যাধারে
প্রভু পাশে পত্র যেন লিখিতে না পারে।

ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ
প্রখর নূপুর দিলা কন্যার চরণ।

তা ছাড়া, কন্যার সখীদেরও বললেন সতর্ক নজর রাখবার জন্যে। নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও পুরুষের চেয়ে নারীর হীনতা সম্বন্ধেও তারা ছিল সুনিশ্চিত :

সুরপতি না বুঝএ বামা জাতি মর্ম
বামকর হস্তে কেবা করে দান ধর্ম।
(তুল : স্ত্রীয়াশ্চরিতম্ দেবা ন জানন্তি কুতে মনুষ্যা)

নারীর মধ্যে আঙ্গিক লক্ষণে পদ্মিনী জাতীয়া নারীই শ্রেষ্ঠ বিবেচিতা হত। সতী নারী সতীত্ব রক্ষার জন্যে পুরুষকে লাঞ্ছিত করলে কিন্তু বাহবা পেত। মজনুগত-প্রাণ লায়লী বাসরে 'ক্রুদ্ধ হৈয়া আনল সমসর' স্বামীকে 'চরণ প্রহার দিয়া করিলা অন্তর'।

তাম্বুল মেয়েমহলে বেশি প্রিয় ছিল :

কপুর তাম্বুল/পরিমল ফুল/বিলাসএ যথনারী।

মাতাপিতার মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম ধারণার মিশ্রণ ঘটেছে :

জনক জননী দোঁহা মহিমা সাগর
স্বর্গ হন্তে দুর্লভ ভূমিত গুরুতর।
অতি পূজ্যতম যেন পরমার্থ দেবা
সর্বকার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা।
তোহ্মা আজ্ঞা লঙ্ঘিলে হুন্ম এ মহাপাপ
ইহলোকে পরলোকে বিষয় সন্তাপ।
দেববাণী সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার।

হিন্দুদের 'পিতাস্বর্গ' তত্ত্বের প্রতিধ্বনি মেলে নিচের চরণগুলোতে :
মজনু পিতাকে বলছে—

তুহ্মি সে মোহর গতি মনের আরতি
এহলোকে পরলোকে পরম সারথি
লোম প্রতি শতমুখ যদি হএ মোর
কহিতে তোহ্মার গুণ নাহি অন্ত ওর।

লায়লীও মাকে বলছে : লক্ষ অব্দ যদ্যপি তোহ্মার সেবা করি
তোহ্মাগুণ পরিশোধ করিতে না পারি।

বিবাহানুষ্ঠান :

বিবাহে বর ও কনে পণ ছিল। বর বা কনে—যে পক্ষ কুলেশীলে শ্রেষ্ঠ, সে পক্ষই পণ গ্রহণ করত। তাই কএসের পিতা আমীর লায়লীর পিতা মালিককে কনে-পণ সাধছেন। বিত্তবানদের যৌতুকে জমাজমি, দাসদাসী, ঘোড়া-হাতি উটাদিও থাকত। মধ্যবিত্ত ও গরিবেরা সাধ্যমতো নগদমুদ্রা, অলঙ্কার ও দ্রব্যাদি দিত। এখানে বিত্তশালীর যৌতুকের নমুনা রয়েছে। কএসের পিতা লায়লীর পিতাকে কনে-পণ দেবার প্রস্তাব করলেন :

বহুমূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ।

শুভকাজে ও বিয়ের সময় তিথিলগ্ন মানা হত। 'শুভক্ষণে লগন করিয়া কুতূহলে' লায়লীর বিয়ের ব্যবস্থা হল।

বিবাহানুষ্ঠানে সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মিত হত, তার নাম মারোয়া। বর-কনের প্রথম মিলনে দুপক্ষের সখী, বন্ধু ও আত্মীয়ের উপস্থিতিতে নানা রঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকত, তার নাম জলুয়া। এ সময়ে বর-কনের মধ্যে পাশাদি ক্রীড়ারও ব্যবস্থা হত এর নাম গেরুয়া খেলা এবং বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনাও হত, তার নাম গস্তফিরানো।

এখানে কেবল মারোয়ার কথা আছে :

মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুঘট
স্থাপিলা রসাল পত্র সুবর্ণের ঘট।

এ সঙ্গে থাকে 'অনেক মধুর বাদ্য' এবং—

অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম।

বিয়ের মজলিশে সমাজপতিরা ও শাস্ত্রজ্ঞরা :

বিচার করএ শাস্ত্র পণ্ডিত সকলে।

বিয়ের পয়গাম পাঠাবার সময় কিংবা কথাপাকা করবার সময় এবং বরানুগমনের সময় নানারকম নাস্তা নেয়া হত। মজনুর পিতা পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলেন ইষ্টমিত্রগণ সঙ্গে। এবং ইবন সালাম বরানুগমন করেছিলেন—

ষোল রস সঙ্গে করি রঙ্গ কুতূহলে।

কন্যাসজ্জার সময়ও রঙ্গরস হয়। লায়লীকে জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছিল বলে তা জমে ওঠে নি। তবু সবাই—

কুমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি
কেহ কেহ সহেলা গায়ন্ত মনোরঙ্গে
উপটন দিয়া কেহ কুমারীর সঙ্গে
কেহ কেহ দুষ্টরঙ্গে দিলেক ভুলাই
কেহ কেহ বলে ছলে দেয়ন্ত গোছল
যতনে পৈরাএ কেহ সুরঙ্গ অম্বর
রত্ন আভরণ কেহ কন্যাকে পৈরাএ।

আগেই বলেছি কুলনারীরাও নাচ-গান করত। চট্টগ্রামে মেয়েলী গানের নাম সহেলা। বাসরে—

রচিল কুসুম শয্যা দেখিতে আনন্দ
সখীগণে তথা নিয়া কন্যাক রাখিলা।

অলঙ্কার ও পোশাক :
নারীর শীষে সিন্দূর ও কপালে চন্দন তিলক পরত। নখে মাখত মেহেদি রঙ। মণিখচিত বেশর, মুক্তামানিকখচিত সপ্তছড়ি হার, কনক কিঙ্কিণী রত্নখচিত বাজুবন্দ, কঙ্কন, রত্ন অঙ্গুরী, চরণে নূপুর এবং আরো বিবিধ ধাতব ও রত্নের আভরণ থাকত। বিচিত্র অম্বর (শাড়ি) প্রভৃতি দিয়ে মোহন 'দোলরী সাজ'ও করত তারা। বেণি হত রত্নখচিত বা পুষ্পমণ্ডিত। প্রসাধনসামগ্রী ছিল অঞ্জন, কাজল ও সুর্মা, তাম্বুল রাগ, সিন্দূর, চন্দন, মেহেদি ও কুমকুম কস্তুরী প্রভৃতি।

পুরুষের পোশাকের বর্ণনা নেই। তবে প্রসঙ্গত জানা যায় :

অঙ্গেত বসন নাহি শিরেঁ নাহি পাগ
পদ হস্তে পাদুকা করিলা পরিত্যাগ।

মেলা মজলিশে, উৎসবে পার্বণে, হাটে, আদালতে কিংবা আত্মীয়বাড়ি যাবার সময় সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাও ছাতা লাঠি ও পাগড়ি-পোশাকও সজ্জার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করত। পাদুকা অবশ্য সবার থাকত না। সম্ভ্রান্ত লোকের পোশাকের মধ্যে জরির কাজ-করা আলখাল্লা ও জুতো থাকত।

ভিখিরির ভেক : ভিখিরিরা 'গলে কন্থা খর্পর লই হাতে' ভিক্ষায় বের হত।

পুত্র ও পুত্রস্নেহ :
পিতৃপ্রধান সমাজের নিয়মানুসারে সমাজে মেয়ের চেয়ে ছেলের মূল্য-মর্যাদা বেশি ছিল। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান প্রভৃতি পুত্রের দ্বারাই সম্ভব। হিন্দুর এ ধারণারও মুসলিম-মনে প্রভাব ছিল। তাই পুত্র দিয়ে 'সংসারের সুখ আর পরলোকে কর্ম'— এ ধারণা দৃঢ়মূল ছিল সমাজে। এজন্যে কন্যার চেয়ে পুত্রের প্রতিই মা-বাপের স্নেহ বেশি। তাই—

রেণু এক পুত্র অঙ্গে যদি সে লাগএ
গিরি ভাঙ্গি পড়ে যেন জনক মাথাএ।
তনয় চরণে যদি কণ্টক পশিল
জননী মরমে যেন শেল প্রবেশিল।
চন্দ্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর
পুত্র বিনে জগত লাগএ ঘোরতর।

এবং—
কুলের নন্দন হৈলে গুণের আগল
পদ্মবনে বিকশিল যে হেন কমল।
শরীরে অঞ্জনী যেন পুত্র কুপণ্ডিত
তেজিতে লাগএ দুঃখ রাখিতে কুৎসিত।

তাই—
সদাএ অনেক শ্রধা জনক মনএ
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈতে তনএ।

যোগ ও সাংখ্য আসলে অভিন্ন। যোগ হচ্ছে সাধনপদ্ধতি আর সাংখ্য হচ্ছে সাধন মত বা দর্শন। এটি এদেশের আদিম ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্মদর্শন। ইহুদি-মানী-বৌদ্ধ এবং ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিল জরথুস্ত্র শিষ্য ইরানি ও মধ্যএশিয়ার জনমনে। ইসলাম যখন ইরানে ও মধ্যএশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, পূর্ব-সংস্কার-বশে সেখানকার জনগণ অদ্বৈতদর্শনে আস্থা রেখে ভক্তি বা প্রেমবাদে আকৃষ্ট হয়। পথ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এর সাধারণ নাম 'সুফিবাদ'। এ সাধনা দেহতত্ত্বে গুরুত্ব দেয়। যে দেহাধারে চৈতন্যের স্থিতি, তাকে অস্বীকার করা সহজে সম্ভব নয়। যোগের মাধ্যমেই দেহ আয়ত্ত করার সাধনা চলে। গুরুবাদও বৌদ্ধ-প্রভাবজ। পাক-ভারতে তথা বাঙলাদেশে মুখ্যত সুফি-সাধকরাই ইসলাম প্রচার করেন। যোগে তাদেরও স্বাভাবিক প্রশ্রয় ছিল। নিজেদের পূর্ব-সংস্কারের সঙ্গে মিল দেখে তারা হয়তো ইসলামের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। 'মারেফত' নামে এই যৌগিক দেহসাধনভিত্তিক পিরবাদী ইসলামের প্রাবল্য ছিল এদেশে যোলো শতক অবধি। আদি সৃষ্টি মুহম্মদ আল্লারই অংশ এবং আল্লাহর প্রেমজ সৃষ্টি আর তাঁর খাতিরেই নিখিল জগতের যাবতীয় সব সৃষ্ট— এ মত সুফিবাদের সহজাত। ষোলো শতকের কবি যুগপ্রভাবে যোগ ও যোগীর (তথা সুফিবাদের) কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছেন।

'হামদ' অংশে নিরাকার আল্লাহর ইসলামি ধারণা সুব্যক্ত। কিন্তু 'নাত' অংশে সফিমতের প্রেমজ সৃষ্টিতত্ত্বই অবলম্বিত। তাই কবি বলেন :

আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন
যার প্রেম রস হন্তে হইছে সৃজন।

কিংবা—
ভাবেত (প্রেমে) জনম হৈছে এ তিন ভুবন

ভাব বিনে প্রেম নাহি প্রেম বিনে রস।
ভাব অনুরূপ সিদ্ধি পূরএ মানস।

গুরুবাদও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ তত্ত্ব ভিত্তি করেই :

সদগুরু প্রসাদে পরম গুণ শিক্ষা
মহামন্ত্র পাইয়া হইলা প্রেমে দীক্ষা।

যোগে বিশ্বাসী কবি দেহতত্ত্ব বর্ণনায়ও মুখর :

মৃত্তিকা সকল হোন্তে অতি মনুভব
যা হোন্তে সৃজন হৈল মানব দুর্লভ।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে ত্রিপিনীর ঘাট
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে সরোবর রাজ
শতদল কমল ভাসএ তার মাঝ।
মৃত্তিকার কুণ্ডত বৈসএ হংসবর
নীর শুকাইলে উড়ে শূন্যের উপর।
মৃত্তিকার পাঞ্জরে সার্দুল পক্ষী থাকে
মহাযাত্রা পাইলে উড়এ তিনডাকে।

সুফি দরবেশের সান্নিধ্যের ফলেই ইসলামে দীক্ষিত বলে এবং পূর্ব-সংস্কারবশে যোগী-সন্ন্যাসী ও সুফি-দরবেশের ঐশ্বর্য বা কেরামতিতে অটল আস্থা ছিল। তাই এ কাব্যে অমুসলমানের কাহিনী বলে মুনি যোগীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি এবং মজনুকেও যোগসাধনায় রত দেখি।

বনবাসী যোগীরা সিদ্ধ পুরুষ :

জ্ঞানবন্ত কলেরব ভুবন বিখ্যাত
ভূত ভবিষ্যৎ আদি তাহান সাক্ষাত।
ক্ষেণেক গৌরব-দৃষ্টি যাহাকে হেরএ
জনম অবধি দুঃখ তাহান হরএ।
অশেষ মহিমা তান কহন না যাএ
কল্পতরু সমতুল মানস পুরাএ।
তাহান কারণ গতি অভয়া প্রসাদ
অখণ্ড প্রতাপে তান খণ্ডএ প্রমাদ।

মজনুও যোগীকে বলে—

তুহ্মি দেব ধর্মশীল গুণনিধি গুরু
সর্বদুঃখ নিবারণ যেন কল্পতরু।
তুহ্মি সিদ্ধ কলেবর জ্ঞানের গরিমা।

মজনু —

তপোবনে তাপসী জপএ প্রভু নাম।
মায়াজাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।
মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী
পরমজ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।
নয়ান চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ
যাবতে বদন ইন্দু উদিত না হএ।
অহর্নিশি অবিরত দুই ভুরু মাঝ
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ।
অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব
ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।
পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন
পূর্বের দহন ভএ লইলা শরণ।
ধুইলা নয়ান পাপ নয়ানের জলে
দহিল মনের তাপ মনের আনলে।
দশদিশ মুদিলেন্ত না রাখিলা বাট
পঞ্চশব্দ বাজএ নটকে করে নাট।
মনস্তাপ তপনে তাপিত কলেবর
অনুশোচ জলধরে করএ রোদন
হাহাকার ধূম্র হন্তে হৈল খোয়াকার
পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ।
শয়ন ভোজন সুখ সকল হারাই
লায়লীর রূপ মনে রহিল ধেয়াই।
নয়ান শ্রবণ সুখ মুদিয়া সদাএ
নিঃশ্বাস ধরিয়া রূপ মনেত ধেয়াএ।
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি
লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহর্নিশি।
দোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন
উরু বেদি তরু হৈল নাহিক চেতন।
শরীর নগরে তান লাগিল ফাটক
কামক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক।
পরম ঈশ্বরভাবে পাগল হইল
অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল।
সংসারের মায়ামোহ অকারণ জানি
প্রেমরস ডোর দিয়া বান্ধিলা পরানি।

কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খানকে কবি এই যোগী সুফি সিদ্ধপুরুষরূপে কল্পনা করেছেন। তাই সূফির মতোই তাঁর সেবাধর্ম :

অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী
যোগাইলা সভান আহার
বাতুল আতুর যথ পালিলন্ত অবিরত
দানধর্ম করিলা বিশেষ।

আবার যোগীর মতোই তার সিদ্ধি। সুলতান হোসেন শাহ তাঁকে বাঘের মুখে, সাগরে, হাতির পায়ে, জতুগৃহে আগুনে, খড়্গ ও শর হেনে, গরল খাইয়ে— সাতবার এই সাত রকমে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। এমনি পরীক্ষায় পির গাজীও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন (গাজী কালু চম্পাবতী কাব্য)

কবি বাহরাম খানও সুফিভক্ত ছিলেন। তাই প্রেম সম্বন্ধে উচ্চ ও পবিত্র ধারণা পোষণ করতেন তিনি। লায়লী-মজনুর প্রসাদ কামনা করেছেন তিনি এই বলে :

ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যবতী
দোহান প্রসাদে মোর হোক শুভগতি।

লায়লীর মৃত্যুর পর লায়লীর মাতা মজনুকে বলছেন :

তোর লাগি জন্মিছিল জগত মাঝার
তোর লাগি নিধন হৈল পুনর্বার।

গৃহ :
সাধারণের কুটিরের বর্ণনা এ কাব্যে নেই। তবে পাঠশালার চৌআড়ি মালিক সুমতির পুরীর কিছু পরিচয় মেলে।

লায়লী মজনুর পাঠশালা ছিল—

চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন
ফটিকের স্তম্ভ সব হিঙ্গুলি চন্দন।
চারিদিক উদ্যানসমূহ কুসুমিত
জাতী যুথী মালতী লবঙ্গ আমোদিত।
বিকশিত নাগেশ্বর চম্পক বকুল
মধু পিয়া মাতাল ভ্রমএ অলিকুল।
শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত
ফলভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।

আবার, মালিকের পুরী কনক চৌআড়ি
রাজধানী সমসর

বিবিধ মন্দির বিচিত্র প্রাচীর
অপরূপ মনোহর।
চৌদিকে পুষ্পিত অতি সুললিত
জাতী যুথী বিকশিত
মঞ্জরী মুঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
পিকবর সুললিত।

মালিকের বাড়িতে দ্বারী ছিল এবং অট্টালিকায় ছিল গবাক্ষ।
এছাড়া সে-যুগের নানা ছোটখাটো রীতিনীতির সংবাদও মেলে।

ক. ক্ষৌরকর্ম :

করপদ নখ তার শিরের কুণ্ডল
খেউর করিয়া অঙ্গ করিলা নির্মল।
খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা
স্নান করাই ভাল বস্ত্র পরাইলা।

খ. দান-সদকার গুরুত্ব আজকের মতোই ছিল। আপদ-বালাই 'নিছনি'র প্রথাও ছিল।

১. রত্ন দান করএ মাগএ পুত্রদান
২. করিলা সহস্র ধনে শির বলি হার
যথেক ভাণ্ডার ছিল করিলেক দান।

গ. শপথে : চাঁদ সূর্যের দোহাই :

রবি শশী সাক্ষী আছে আর করতার
যাবত জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।

ঘ. দেশে বাউল-বৈরাগীর আধিক্য ছিল। তাই বাউল ছিল সহজ উপমার বিষয় :

১. আউল করএ কেশ বাউলের বেশ
২. বিকশিত তনু মাতা মুকলিত কেশ
পরিধান পিতাম্বর যোগিনীর বেশ।

ঙ. মৃতের সৎকার (লায়লীর শব) :

অবশেষে মাতাবরে গোলাবের জলে
কন্যাকে গোসল দিল বিরল সুস্থালে।
নির্মল অম্বর দিয়া করিল কাফন
চর্চিত করিলা অঙ্গ কুঙ্কুম চন্দন।
শাস্ত্রের বিধান মতে দাফন করিয়া
পাষাণে বান্ধিয়া গোর করিলা নির্মাণ।

এখানে অমুসলমান লায়লীর দাফন কবির অনবধানতায় ইসলামি নিয়মে সম্পন্ন হয়েছে।

চ. প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা :

১. কবি হয়তো পড়শী থেকে প্রীতি পাননি অথবা ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান থেকেই মজনুর মুখে বিবৃত করিয়েছেন প্রতিবেশীর নিন্দা :

দেশ হোন্তে অরণ্য সহস্যগুণে ভাল
গৃহবাস সুখরঙ্গ সহজে জঞ্জাল।
কঠিন কপট মন মনুষ্য নিশ্চএ
নদিয়া দারুণ মতি নিঠুর হৃদএ।
ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন
পরমন্দ চিন্তএ হরএ পরধন।
মাতাপিতা গুরুজনে নাহিক ভকতি
ভাইর সহিতে বন্ধুর নাহিক আদর
সুখেত মধুর বাণী কপট অন্তর।
বিদ্যমানে ভাল কহে অবিদিতে মন্দ
ইষ্ট সনে পরিবাদ মিত্র সনে দ্বন্দ্ব।
কার সঙ্গে কাহার নাহিক উপরোধ
অন্যে অন্যে সভানের বিবাদ বিরোধ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার মএ
সাফল্য জনম লভি বিফলে বঞ্চএ।

২. ধার্মিক কবির সরল বিশ্বাস :

না চিন্তিও পরমন্দ তুহ্মি কদাচিত
তবে সে তোহ্মার মন্দ না হৈব নিশ্চিত।

ছ. আর পাই হিন্দুপুরাণের অবাধ ও অজস্র ব্যবহার। মদন, রতি, হরি, হর, রাবণ, অহল্যা, দ্রৌপদী, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, রোহিণী, কুবের, বৈকুণ্ঠ, কল্পতরু, চিন্তামণি, অমৃত প্রভৃতি উপমা-উৎপ্রেক্ষার অবলম্বন হয়েছে।

জ. সমাজে কদমবুসির রেওয়াজ ছিল। ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিরল ছিল না, মজনু— 'দণ্ডবৎ হৈলা তবে মুনির সাক্ষাত।'

কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য

দৌলত উজির বাহরাম খান কবি-পণ্ডিত। এ ধারণার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রয়েছে সারা কাব্যে। স্বল্প কথায় চিত্রাঙ্কন তাঁর অন্যতম দক্ষতা :

১. বিকলিত তনু মাতা সুকলিত কেশ
পরিধান পীতাম্বর যোগিনীর বেশ।

২. আগে ধাএ কএস বালকগণ পাছে
মারিয়া ফিরাব তারে যার যেই ইচ্ছে।

ঙ. গোরক্ষ বিজয়

শেখ ফয়জুল্লহ্ বিরচিত (ষোলো শতক)

শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনে। বহুকাল পরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সত্যপীর পাঁচালীর এক পুঁথিতে নিম্নলিখিত অংশটুকু পান :

> **গোর্খবিজ**এ আদ্যে মুনিসিদ্ধ কত
> কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
> খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী
> **গাজীর বিজ**এ সেহ মোক হইল রাজি।
> এবে কহি **সত্যপীর** অপূর্ব কথন
> ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
> **মুনি রস বেদ শশী** শাকে কহি সন
> শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন।

অতএব মুনি-৭, রস-৬/৯, বেদ-৪, শশী-১ ধরলে রচনাকাল ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ শকাব্দ তথা ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ মেলে। এটি সত্যপীর পাঁচালীর রচনার সন। তাহলে 'গোরক্ষবিজয়' ও গাজীবিজয় রচনার আনুমানিক কাল আরো দশবছর আগে। সুতরাং শেখ ফয়জুল্লাহ নিশ্চিতই ষোলো শতকের কবি। শেখ ফয়জুল্লাহ তাত্ত্বিক কবি। গোরক্ষবিজয়ে যোগ ও দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে, অপ্রাপ্ত গাজীবিজয়ে পিরগাজীর মারফততত্ত্ব এবং 'সত্যপীরে' পিরমাহাত্ম্য ও কেরামতি পরিব্যক্ত বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। গোরক্ষবিজয় বৌদ্ধ, গাজীবিজয় ইসলামি এবং সত্যপীর লৌকিক বিশ্বাসভিত্তিক।

যোগীবেশ :

> শিবের উত্তম জটা শ্রবণেতে কড়ি।...
> ভাঙ্গ ধুতরা খায় শিব।
> সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধের কাঁথা তাঁহার গলাত।
> পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া
> মুণ্ডে আর হাতে তুমি কেহ্নে পৈর মালা
> ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।
> কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিল এড়াই।
> ছাই, কাঁথা, ঝুলিকেণ্ডড়ি হাতে নড়ি, হাতে
> লাঠি লৈল আর পানাই ছিল পায়ে।

ষোলোশত নারীর ঐতিহ্য— কৃষ্ণের গোপী, কদলরাজ্যে মীননাথ, পদ্মাবতী ১৬০০ রাজপুত।

> হাড়ি (Sweeper)-হাতে ঝাড়ু লহ তুমি কান্ধেত কোদাল।
> ব্যাভিচার সৎমাএ ভজিব তুহ্মি দেখিয়া যোয়ান।

কেশ শোভা :

শিরেত লম্বিত কেশ
কবরী বান্ধিল ঠমকে।
পরিধান পুষ্পমালা কবরী শোভিছে ভালা
যেন দেখি বিজুলি চমকে।

অলঙ্কার :

(বুকে) দোলে রত্নহার, কটি ত কিঙ্কিণী, চরণে...

রাজাকে :

নবদণ্ড ধরৌক মাথাএ, চামরে করৌক রায়।
আসন নামাইয়া বসে বকুলের তল

বকুলবৃক্ষ :

গোর্খনাথ বসি আছে বকুলের তলে।
বিজয়ানগর ছাড়ি বকুলেত আইল
বকুলের তলে নাথ আসন করিল।

রাঢ় অঞ্চলে নরখাদক মানুষ ছিল :

তবে যতিনাথ (গোর্খ) রাঢা দেশে চলি গেলা
সাক্ষাতে দেখিয়া দেবী (গৌরীকে) বহুল গঞ্জিলা
কোন্ কার্য কর তুমি রাক্ষস আচার
দেবতা হৈয়া কর মনুষ্য আহার।

দেবীর পূজা :

তবে সতী যতিনাথে নিভৃতে কহিল

প্রচার :

বৎসরেত একবার পূজিতে বলিল।
সেই সে গোর্খে তবে নিবন্ধ করিল
কালী বলি এক মূর্তি রাঢাতে রাখিল।

ব্রাহ্মণের বেশ :

গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোঁটা
মাথাতে আলগা ছাতি লগে লইল লোটা।

কদলীরাজ্যের ঐশ্বর্য :

অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব স্থানে পাএ
চারি কড়া কড়ি বিকায়ে চন্দনের তোলা
কদলীর প্রজাএ পৈরে পাটের পাছড়া
প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কুমড়া।
কার পুষ্করণীর জল কেহ নাহি খাএ
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেত শুকাএ।
প্রতি ঘরে শয্যা দেখে নেতের পালঙ্গ
সোনার কলসে সর্বলোকে খায় পানি।

কদলী নগরের নারীর : বক্ষেতে নাহিক বস্ত্র রত্নহার দোলে

পুকুরে ও পুকুরপারে : হংস চক্রবাকে তাতে পঙ্কজ উৎপল
তারি পাড়ে নানা তরু পরম সুন্দর
আম কাঠাল আর গুয়া নারিকেল।
তাল খাজুর আর নানা বর্ণ ফুল।

শাস্তিপদ্ধতি : শূলে, শালে বিদ্ধকরা, কেটে ফেলা, পেষণ, পুড়িয়ে মারা।

বাস ও খাদ্য : মণ্ডপেত দিমু বাস,
খাবারী (খোরা) ভরিয়া দিমু ভাত
নিতি নিরমিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই।

গৃহী যোগী-যোগিনী :
২১, কাপড় বোনা ও বিক্রি :
সূতি তুমি যে বুনিবা ধুতি
হাটে নিলে বেচিলে হবে কড়ি ॥

সমাজে মদ : যখনে সমাজে যাইবা মদ্য ঘটি মান্য পাইবা
কথা কইবা দুই হাত নাড়ি।

উপহার : সুবর্ণ কাছাটি (নর্তকীর জন্য) দিতে সোনার মন্দিরা
মৃদঙ্গ কর্তাল দিতে সুবর্ণ চতোরা।

নর্তকীর সাজ ও অলঙ্কার :
গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকার।
কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল
কর্ণেতে দিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি
গায়েতে কাঞ্চলি দিল, কোমরে কাছটি।

যোগীর সাধ্য : আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র উনমত গরল চন্দ্র
এই চারি শরীর ব্যাসন।
আদিচন্দ্র করি স্থিত নিজচন্দ্র সহিত
উনমত করিয়া সন্ধান
তিনচন্দ্র সম্বরিয়া আপনাকে ভার দিয়া
গরল চন্দ্র সব করে পান।

চারি চন্দ্র সম্বরিয়া ভবসিন্ধু তর গিয়া
তবে সে সকল রক্ষা পায়।

যোগী শবের গোর দেয়া হয় :

আমি মৈলে তুমি মোরে দিও আসি মাটি।

বিভিন্ন দিনে দেহতত্ত্ব :

শুক্রবারে বহে বারি সুষুম্মা জান
গঙ্গা যমুনা দুই ধরত উজান।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর চূড়া
মধ্য কমল মধ্যে বন্দী হয়ে চোরা।
শনিবারে বহে বায়ু শূন্যে মহাস্থিতি
পূর্বেতে উদএ ভানু পশ্চিমে জ্বলে বাতি।
নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘন ঘন
আজুকা ছাপাইয়া রাখ অমূল্য রতন।
রবিবারে বহে বায়ু লইয়া আদ্যমূল
অগ্নিএ পানিএ গুরু রাখ সমতুল।
অগ্নিএ পানিএ যদি না রাখ গাভুরালি (যৌবন)
নিবি যাইব অগ্নিসব রহিয়া যাইব ছালি।
সোমবারে বহে বায়ু সহজ সঙ্গীত
শ্রীগোলা নগরে বাদ্য বাজে সুললিত।
ঝমকে ঝমকে বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি
ইন্দ্রের ভুবনে যেন নাচএ নাচনী।
মঙ্গলবারে বহে বায়ু জুড়িয়া মঙ্গলা
খেমাইরে অঙ্কুশ দেয় মনারে পাগলা।
গগনেতে মত্তহস্তী ছুটে নিরন্তর
ছান্ধিয়া বান্ধিয়া রাখ মন্দির ভিতর।
বুধবারে বহে বায়ু বুঝ আপে আপ
ফিরিয়া খেলাও গুরু দুই মুখ সাপ।
চাপিয়া গর্জিয়া উঠে বিষম নাগিনী।
গুরু মুখে চিনি লহ সরুয়া শঙ্খিনী।
বৃহস্পতিবারে বহে বায়ু বিরলে দিয়া চিত
গগন মণ্ডলে শুয়া ডাকে বিপরীত।
শুয়া গুটি নহে গুরু জীবন প্রাণধন
সাতবার ভ্রমিয়াছে এই তিন ভুবন।
বুঝ বুঝ ওহে গুরু বাউর বিজয়া
আপ্তমা পরিচয় করি রাখ নিজ কায়া।
অধঃরেত উর্ধ্বে তালি দেও গুরু মোছন্দর
আপ্তমা ত্রিচল কর শরীর ভিতর।

বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া বায়ু কর বন্দী
মূল কমল মধ্যে বায়ুর বুঝ সন্ধি।
মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটির কলা
বেঙ্কা নালে সাধ গুরু না করিহ হেলা।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা
মেরু মূলে রহিয়া চন্দ্র নাচিব গোপালা।
বুঝ বুঝ গুরু জ্ঞানতত্ত্ব বুঝ সন্ধি
রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী।
মন হএ পবন পবন হএ সাঞি
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।
মন পবন সহিত এক করি জোড়
ক্রমে ক্রমে টানি আনে মনের ভাণ্ডার।
চাপ তিন তিহরী উড়িয়া থাউক ধুয়া
আনল জ্বালহ গুরু স্থির রাখ কায়া।
ত্রিবেণী করহ স্থির কর্ণে দেও তালি
উপরেত চন্দ্র রাখি কর ঠাকুরালি।
ডাইনেতে রাখিঅ অগ্নি আগে তারে জ্বালি
কোন কালে না টুটিব তোমার গাভুরালি।
স্থাপন করহ মন আমানেত বসি
আদিত্যবারেত পালিঅ তিথি একাদশী।
অধঃ উর্ধ্বে গুরুদেব তুলি ধর কাম
শরীর সুন্দর হৈব চিকন হইব চাম।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ সকল বৈরী
তাহারে রাখিঅ গুরু স্বতন্তর করি।
পবন আমল করি তারে কর সন্ধি
রবি শশী আইসে চলি তারে কর বন্দী।
পবন আমল তুমি যদি সে করিলা
ব্যক্ত অব্যক্তের পন্থ সব উদ্ধারিলা।
মহা জ্ঞান পাইয়া মীর দূর কৈল মায়া।

যোগীর অন্ন : সুধা অন্ন তাহাতে আনুনি কচুর শাগ।

গুরুবাদ : অসার সংসার মধ্যে গুরুমাত্র সার।

যোগীর গান

জন্মরহস্য : একদিনের হইলে বিন্দু নিহারে সে চলে
দুই দিনের হলে বিন্দু রক্ত সঙ্গে মিলে।
তিন দিনের হলে বিন্দু ফেনার আকার
চারদিনের হলে হয় দেহের সঞ্চার।

পঞ্চদিনের হলে হয় কাজলের প্রায়
ছয় দিনে রঙ ধরে শুনহে তাহায়।
সপ্ত দিনের হলে বিন্দু শরীরের মোহারা
অষ্ট দিনের হলে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া।
প্রথম মাসের সময় জানে বা না জানে
দুই মাসের সময় লোকাচারে শুনে।
তিনমাসের সময়েত রক্ত দলা দলা.
চারমাসের কালে হয় হাড়ে মাসে জোড়া।
পঞ্চমাসের সময়েত পঞ্চফুল ফোটে
ছয়মাসের সময়েত এযুগ পালটে।
সাতমাসের সময়েতে সাতেশ্বরী খায়
অষ্টমাসেতে মন পবনে চিয়ায়।
নয়মাসের সময়েতে নবঘন স্থিতি।
দশমাসে দশ দিনে পিণ্ডারুণ গতি।
সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বুধে গঠন বুক
বৃহস্পতিবারে গঠেন পৃষ্ঠ আর মুখ।
শুক্রবারে গঠিয়াছেন সুখের দুটি আঁখি
ফুল ফল নানা চন্দ্র যাহে নয়নে দেখি।
শনিবারে গঠিয়াছে শুনিতে দুই কান
যা দিয়া গুরুর বচন শুনি অষ্টক্ষণ।
রবিবারে গঠিয়াছে যোগের যোগমাথা
স্থাপিত করিয়া জীবন বসায়েছে তথা।

দেহমনের উপাদান

যোগীর গান :

মায়ের চার চিজের কথা শুন মন দিয়া
গোস্ত-পোস্ত-লোহ-লোম চার চিজে দুনিয়া।
বাপের চার চিজের কথা শুন দিয়া মন
হাড়-রগ-মণি-মগজ চার চিজে পত্তন।
নিরঞ্জনের চিজের কথা শুন বুদ্ধিমান
হাত-পা-নাক-মুখ-চক্ষু আর কান।
বাপের চার মায়ের চার নিরঞ্জনের দশ
এই আঠার মোকামে ধনি খেলছে মহারস।

ঋতু ও রমণ

যোগীর গান :

মাসে মাসে ঋতুবতী শাস্ত্রের বচন
তাহে কুলক্ষণ যদি না করে রমণ।
রবিবার অমাবস্যা সপ্তমী অষ্টমী
প্রতিপদে পূর্ণিমায় না করিবে রমি।
ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার
যুবা কালে দরিদ্রতা ঘিরে আসে তার।

সঙ্গমরীতি : মাসে এক বৎসরে বার (সুজনের গুরু)
ইহার মধ্যে বাছাধন যত কমাইতে পার।

ক্ষেত্র ও বীজ : নারী পুরুষ জন্ম রহস্য :
ঋতু হইল ফুল গাছ বিন্দু হইল বীচি
রমণী হইল জমি তার ঋতু হইল গাছি।
আত্মাই পরমহংস তা শূন্যরূপীও— অজপা— পরমাত্মা
হংসী— অজপা আদ্যাপন্তী।

চ. বিদ্যাসুন্দর/রসুল বিজয়/হানিফার দিগ্বিজয় [মৎ-সম্পাদিত]
শা'বারিদ খান (ষোলো শতক ১৫৩০-৫০ খ্রিস্টাব্দ)

শাহ্ বারিদ খান তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। এখানে উক্ত তিনখানি গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি রয়েছে। এর ভাষা সংস্কৃতবহুল।

নিমন্ত্রণ রীতি : সুগন্ধি তাম্বুল বাটি ঘরে ঘর
বোলাইলা সবরাজ।

মজলিশে : সব মহাজনে বৈসে রঙ্গ মন
নর্তকে নৃত্য করে।
তথি বেয়াল্লিশ বাজ বাজএ ঘনে ঘন
সব হুলস্থুল অতি।
রাজ অন্তঃপুর শব্দ আনন্দ উল্লোড়
পড়এ বিবিধ ভাতি॥
বেশ্যানারীগণ নাচে ঘনে ঘন
মহাশব্দ রাজপুরে।

কন্যাস্নান : দিয়ামে জোয়ানি বান্ধিয়া আলাম
শুভক্ষণ জুমাবারে॥
কস্তুরী চন্দন করে বিলেপন
হরিষে কুমারী অঙ্গে।
সব সুনাগরী সুখ রব করি
তেলোয়াই দেহি রঙ্গে॥
এ দূর্বা হলদি আনি সীমন্তিনী
সবে মিলি দেয়ন্ত আগ॥

তেলোয়াই : উৎপল সঙ্গে অঙ্গ বিমলএ
সুখ মুখে অনুরাগ ॥
সপ্তদিন রাি তেলোয়াই নিতি নিতি
নারী সবে দিলা রঙ্গে।
সুবাসিত জলে করাইল গোসল
ভূষণ ভূষে কর্ণে অঙ্গে ॥

কন্যার রূপ : কুটিল কুন্তল করিএ উচ্চার
কবরী কানড় ছন্দে।
শুক্ল কুসুম প্রসূত কুচ বিরাজিত
কুঞ্জ ভ্রমর মকরন্দে ॥
শিষেত সিন্দূর সুর বিকিরিত
শোভিত সিন্দূর ভালে।
যেহেন মেদুর অরুণ অঙ্কুর
বিচিত্র তারক মেলে ॥
অলকা দুলিত দ্বিরেফ ভুলিত
জানি অরবিন্দ ভুলে।
বদন সুন্দর পূর্ণ শশোধর
কিবা সরসিজ রঙ্গে।
কুমুদ নয়ান মাঝে তিল ফুল
বান্ধুলি অধর সঙ্গে ॥

রসুলকে যুদ্ধের প্রবর্তনা দিয়েছে ইসলামপ্রচার কাঙ্ক্ষা। কাজেই এ একপ্রকার জেহাদ। তাই—

রসুল বিজয় : যে পড়ে যে শুনে পাপ বিনাশ।
পুণ্যফলে হও বিহিস্তে বাস ॥

যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের নামও সুন্দর :
পরশু, তোমর, শেল, শূল, ভয়ঙ্কর।
পট্টিস, খঞ্জর, শক্তি, মুষল, মুদগর ॥
নারাচ, নালিকা, শঙ্খ, গদা, ভিন্দিপাল।

যোগিনী : যোগিনী হইমু সংসারে ফিরিমু
যথা তোমার লাগ পাই।

বিষ্ণুতৈল বিষ্ণু তৈল পানি সবে দিল আনি
করাইলা তখন চৈতন্য।
সব সখী পাত্র হাতে বিষ্ণু তৈল ঢালে মাথে
আগর চন্দন লেপে গাএ।

সঙ-সজ্জা : আমীরক প্রণমিয়া উমর চলিল।
জুব্বা এক তুলি নিজ অঙ্গে চড়াইল ॥
নব মণিকলা বীর মুণ্ডে তুলি দিলা।
শৃগালের লেজ্জা কলা উপরে বান্ধিলা ॥
ভালা এক ঢোল আনি গলে তুলি দিল।
একটি বন্দুক বাম হস্তেত ধরিল ॥
মোহাম্মদী জুর্মিক কোমরে কাছি লৈল।
তাহার ভিতরে পাথরের গুলি থুইল ॥
অর্ধমণি একমণি পাথরের গুলি।
জুর্মিক ভিতরে বীর লইলেক তুলি ॥

ছ. রসুলবিজয় [মৎ-সম্পাদিত]
জায়েনউদ্দিন বিরচিত
(১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে কিংবা সতেরো শতকে রচিত)

'রসুলবিজয়' আরবি 'মাগাজি' জাতীয় যুদ্ধকাব্য। ইসলামের প্রচার ও প্রসারবাঞ্ছার রসুল মুহম্মদের দিগ্বিজয়ই এ কাব্যে বর্ণিত বিষয়। এখানে ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে রসুলের লড়াই বর্ণিত। জায়েনউদ্দিন 'রাজরত্ন রাজেশ্বর' এক ইউসুফ খানের আগ্রহে 'রসুলবিজয়' রচনা করেছিলেন। ইনি যদি শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-৮১) হন তাহলে তাঁর সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্বে (১৪৭৪-৭৬) এ কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কবির পির ছিলেন শাহ মুহম্মদ খান। ইনি যদি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের রচিয়তা মুহম্মদ খান হন তাহলে কবি জায়েনউদ্দীন সতেরো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ইউসুফ খান যদি কররানী বংশীয় হন তাহলে জায়েনউদ্দিন হবেন ষোলো শতকের তৃতীয় পাদের কবি।

জাতিবৈর : এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা
অনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা।
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই
অন্দরেত যাই আলী জব করিব গাই।
অন্দরেত যাই আলী জব করিব গরু
সেই শের থোন দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির
বলিহীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির।

দেশী উপমাদির ব্যবহার:

ক. কুম্ভকর্ণ দৈত্যমূর্তি ভয়ঙ্কর।
খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ
গ. যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর।
কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য।
ঘ. গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার।
ঙ. ব্রহ্মাসম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান।

একটি যুদ্ধের দৃশ্য : পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ
দিনে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ।
গজে গজে যুদ্ধ হইল দন্ত পেশাপেশি
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল মেশামেশি।
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।
অস্ত্র জালে ভরি গেল গগন মণ্ডল
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল।
গদাগদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।
খড়্গ খড়্গ যুদ্ধে করে উঠে খরখরি
ভিন্ সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি।
অন্যে অন্যে মল্ল করে হুই জড়াজড়ি
বাঝিল তুমুল যুদ্ধে ভূমিতলে গড়ি।

মুসলমানেরা কাফেরদের বুঝাচ্ছে :

কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট।
তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ
কোটি জন্মের পাপ সেই ক্ষণে ক্ষএ।
কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান
কলিমা বাখান জান আছে তান স্থান।
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ।

'অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ'— এ কথা বলবার সুযোগ করে নেবার জন্যেই দিগ্বিজয়।

প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৭ শতক)

ক. সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী

কাজী দৌলত বিরচিত (১৬৩৫-৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

কাজী দৌলত আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গের অমাত্য আশ্রিত প্রথম কবি। কবি মিয়াসাধনের আউধী কাব্য 'মৈনাসৎ'-এর স্বাধীন অনুবাদমূলক কাব্য এই সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী। কবি কাজী দৌলতের আকস্মিক মৃত্যুতে এ কাব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। পরে কবি আলাউল একটি উপকাহিনী সংযোজন করে এ-কাব্যে সম্পূর্ণতা দান করেন। কাজী দৌলত রোসাঙ্গের লস্কর উজির (সৈন্য বা সমরমন্ত্রী) আশরাফ খানের আগ্রহে উক্ত কাব্য রচনায় ব্রতী হন। এই সময় চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল, সে-সূত্রেই রাজধানী রোসাঙ্গে বাঙালি নাগরিক ও উজির-চাকুরে-সদাগর প্রভৃতি থাকতেন।

বন্দনা :

বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন
সব তেজি খোদা এক জানিও নিশ্চিত
তার সম বেদমন্ত্র নাহি পৃথিবীত।

মুহম্মদের নুর ভুবন সৃষ্ট :

মহম্মদ আল্লার রসুল সখাবর
যার নুরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর।

মুহম্মদের সিফত : দ্বৈতবাদ :

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক
যে মিমেতে জগত মোহন

দস্যু-তস্কর : ঠগ তামন ঢেঙ্গ ডাকাইত সঙ্গতি।

উপমা : ঠাকুর, বেদমন্ত্র, সপ্তদ্বীপ, বিশ্বকর্মা, রতি, শঙ্কর, মদন, মুরারি, অম্বিকা, হর-গোরী, দ্রৌপদী, পাণ্ডব, কালী, দশানন, কীচক।

রাজার আদর্শ : পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।

রোসাঙ্গের মুসলমান : আশরফ খান :
হানাফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান
ইমাম রতন পালে প্রাণের ভিতর।
লোক উপকার করে নাহি আপ্তপর
পীর গুরু অভ্যাগত পুজন্ত তৎ পুর।
মসজিদ পুষ্কর্ণী দিল বহুল বিধান
সৈয়দ কাজী শেখ মোল্লা আলিম ফকির
পূজেন্ত সে সবে যেন আপনা শরীর।
সৈয়দ শেখ আদি মুঘধ-পাঠান

নৌকা : নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে
নব শশীগণ যেন জলে নামি ভাসে।
দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায়।
রজতের বৈঠা সব শোভন নৌকার
জল সিঞ্চে স্বর্ণ পাখী পক্ষ যে রূপার।
দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলী সঞ্চারে
মরকত স্তম্ভ সব রজতেঁর ছা'নী
নবরঙ্গ খোপা যেন মুকুতা খেচনী।
আগে পাছে চামর দোলায় ঘন ঘন
বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন।
স্বর্ণ শিখি পেখমে বিচিত্র পাছা নৌকা
সুরচিত উঞ্চ অগ্র যেন দেখি শিখা।
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় নৌকার গঠন
পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন।

বাদ্য : গীতনৃত্য : দুন্দুভি ভেউর ঢোল মেঘের গর্জন।
মৃদঙ্গ, তবলা, পিনাক আদি বেণু বীণা।
করতাল মৃদঙ্গ রবাব বংশী নাদ
উপাসাঙ্গ মৃদঙ্গের করকা সংবাদ।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে
মেঘের গর্জন যেন দুমদুমির রোল।

সরোবর :	স্থানে স্থানে সরোবর সুনির্মল জল জলে শোভে বিকশিত সুরঙ্গ কমল। হংস হংসী ক্রীড়া করে পদ্ম পত্র তলে।
হিন্দুসমাজ :	ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
নর মহিমা :	নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান। নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান। নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর। তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল।
বিদ্যা : আশরাফ খান :	নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানারস চয় পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়। আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ। গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র।
পুষ্প :	কুন্দ, মালতী, কিংশুক প্রভৃতি।
যোগী :	কোথা হন্তে এক যুগী মিলিল আসিয়া না নড়ে না চলে যুগী যেহেন স্থাবর। জটাধারী ব্যাঘ্রচর্ম বিভূতি ভূষণ কণ্ঠে রুদ্র মালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন। জ্বলন্ত প্রদীপ দীপ্ত দিব্য কলেবর যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর।
তাম্বুল :	অন্ন ভুঞ্জি রাজা সব আনন্দিত মন কর্পূর তাম্বুল সব করয় ভক্ষণ। কর্পূর বাসিত পান করিয়া সম্ভোগ কোন সখী কুমারক করায়ন্ত ভোগ।
প্রসাধন :	সুবর্ণ বাটাতে করি অগুরু চন্দন কুমারের অঙ্গে কেহ করেন্ত লেপন। ... কাজলে উজ্জ্বল কর কমল নয়ন

নবঘন জুতি কেশ কুসুমে জড়িয়া
কর্ণপুটে রত্নময় পৈর অলঙ্কার
কস্তুরী তিলক মুখে মৃগাঙ্ক সে চান্দে
কাঞ্চন কটোরা কুচ চর্চিয়া চন্দনে
নেপুর কিঙ্কিণী হার কেরুর কঙ্কণ।

প্রসাদ-টঙ্গী : অপূর্ব সুন্দর গৃহ করিল নির্মাণ
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় সুরপতি স্থান।
ফটিকের স্তম্ভ সব শোভে মনোহর
নানা বর্ণ আচ্ছাদিল নেত পাটাম্বর।
মরকত পরিপূর্ণ বিরচিত বেড়া
নৈশ আকাশে যেন নক্ষত্র পরম্পরা
ব্যাল্লিশ দুয়ার কৈল্যা গৃহ চতুঃপার্শ্বে
অঙ্গ শীতলিত যেন মলয়া বাতাসে।

মন্ত্রশক্তি-দারু-টোনা-তুক-তাক :
যদি হয় সিদ্ধা বিদ্যাধর সুরাসুর
মহামন্ত্র আহুতিম আকর্ষণ বলে
সুরাসুর গন্ধর্ব আনিমু ক্ষিতিতলে।
গন্ধর্ব কি নিশাচর কিন্নর যক্ষ ভুত
ঘণ্টা মধ্যে বান্ধি দিমু দেখিবা অদ্ভুত।

ঘুম-মোহিনী : প্রবেশিলা রাজগৃহে মন্ত্রের প্রভাবে
নিদ্রাসূত্রে বন্দী হৈয়া ছিল লোক সবে।

নিমন্ত্রণপদ্ধতি : যথ ইতি রাজ্য বৈসে মোহরা নগরে
বার্তিল তাম্বুল দিয়া প্রতি ঘরে ঘরে।

মূর্ছা বা বায়ু রোগের ঔষধ :
বিষ্ণু নারায়ণ তৈল।

দানসামগ্রী : হস্তী ঘোড়া নবরত্ন দান করে বস্ত্র অন্ন
দুঃখিতের খণ্ডাও দুঃখ ভার।

যোগী-বাউল-অভিন্ন : বাউলে কহিল যদি রহস্য সকল।

চীনাপণ্য : চীন দেশী ধ্বজবস্ত্র সুবর্ণের সুত

চান্দোয়া : তারি খাট পরে চারি চান্দোয়া অদ্ভুত
মকুতা প্রবাল বুনি চান্দোয়ার থোপে
সুবিচিত্র পাটাম্বরে নিশাকর শোভে।

রাজপুরুষের বেশ : হাতে খড়গ শোভে নেত ধড়া পরিধান
বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।
কপালে দোলায় মণি কুণ্ডল শ্রবণে
চন্দনে চর্চিত তনু প্রসন্ন বদনে।

যুদ্ধাস্ত্র : রথ, শর, ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদি।

যোগী : মহাতেজময় কান্তি কলেবর জ্বলে
নক্ষত্র প্রকাশে যেন শ্রবণ কুণ্ডলে।
যোগীর কর্ণেতে শঙ্খ পুরএ সুস্বরে।

মাতাপিতা ও গুরুর সম্মান :
গুরু হিতোপদেশ না করিও হেলা
গুরু বচন কুলিশ হেন জান
মাতৃপিতৃ আজ্ঞা হৈলে সর্বত্রে কল্যাণ।
যে জন না লয় মাতৃ পিতৃ অনুমতি
অবশ্য তাহার ফল লভএ দুর্গতি।

দেবধর্ম : নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেবধর্ম পূজে নিতি
স্বামীবর মাগে সর্বকাল
তথাতে নির্জনে নারী আরাধে শঙ্কর গৌরী
সর্বহিতে স্বামীর কল্যাণ।

মাটি— দেহতত্ত্ব : মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ আত্মমায়া
মহামায়া মাটি 'পরে বিধাতার দৃষ্টি।
পরম হংসের খেলা মাটির পাঞ্জর
মাটি ভঙ্গে হংস রাজ গতি শূন্যান্তর।
মাটি হন্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল
ছোট বড় রঙ্গ যথা মাটিতে সকল।
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহামায়া
মাটি শূন্য, স্থিতি মাটি, মাটিযুক্ত কায়া।

খ. চন্দ্রাবতী [মৎ-সম্পাদিত]
মাগন ঠাকুর বিরচিত (১৬৫২-৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত)

কোরেশী মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গে আরাকানরাজের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি কবি আলাউলের প্রতিপোষকও ছিলেন। তাঁরই আগ্রহে আলাউল 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করেন এবং কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন। মাগন ঠাকুর আরাকানরাজ নরপতিগী, সদউ মঙদার ও চন্দ্র সুধর্মার (১৬৩৮-৮০ খ্রি.) মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ, মাগন ঠাকুরের বংশধরেরা চট্টগ্রামের রাউজান থানার ফতেনগর-নোজিশপুর গাঁয়ে আজও বিদ্যমান। মাগন ঠাকুর দেশী রূপকথাকেই কাব্যের অবলম্বন করেছেন। কাজেই সেদিক দিয়ে এ কাব্য মধ্যযুগে দুর্লভ মৌলিক কাব্য।

সমাজ প্রতিবেশ

বলেছি, 'চন্দ্রাবতী' দেশ-প্রচলিত প্রাচীন রূপকথাভিত্তিক মৌলিক রচনা। তাই এ কাব্যে হিন্দুসমাজের আবহই দৃশ্যমান।

ক. তাই চন্দ্রাবতী পতিকামনায় 'আরাধএ দেব ত্রিলোচন।' এবং 'স্বয়ম্বরা' হাওয়াই রীতি।

খ. তার সখী চিত্রাবতী কেবল যে চিত্রশিল্পে নিপুণা তা নয়, ভোজবিদ্যায়ও পটু, আকাশেও ওড়ে সে। অন্যত্র 'শুন কন্যা তিলিচমাত শঙ্কর বাখান।'

গ. অশ্ব বিরল দেশের রাজপুত্র চলে গজারোহণে।

ঘ. এখানকার গিরি-সিন্ধু-কান্তারে থাকে নাগ, রাক্ষস, দানব ও যক্ষ। পরি ও দৈত্যকন্যার বদলে পাই গন্ধর্ব ও রাক্ষসকন্যা।

ঙ. এখানকার গাছে গাছে মেলে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, গৃধ-গৃধিনী।

চ. বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীর দেশে অসাধ্য সাধন করে মন্ত্রপুত ধনুর্বাণ ও মুনিমন্দ্র। অর্ধচন্দ্রবাণ, গরুড় বাণ, বিষ্ণু-চন্দ্রবাণ, গাণ্ডীব প্রভৃতিই হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র।

ছ. পর্তুগিজ প্রভাবকালে রচিত উপাখ্যানে আমরা দেশী নৌকার নাম পাইনে; পাই জালিয়া, গোরাব প্রভৃতি পর্তুগিজ ডিঙ্গার নাম।

জ. এখানে রাজা সত্যবাদী, আর ধার্মিকের আদর্শ ব্যাস ও যুধিষ্ঠির। 'ধর্মবাদী জিতি নিত্য ব্যাস যুধিষ্ঠির'।

ঝ. নায়ক-নায়িকাও মঙ্গলকাব্যের শাপভ্রষ্ট দেব সন্তান, বীরভান চন্দ্রাবতী 'শিব বরে দুইজন মর্ত্যেত আসিছে' এবং নায়কের যখন সঙ্কট দেখা দেয় তখন ইষ্ট দেবতা মর্ত্যে আবির্ভূত হয়ে করেন ত্রাণের ব্যবস্থা :

'শিব বোলে শুনহ কুমার বীরভান—
ধনুত জুড়িয়া মার বিষ্ণু চক্রবাণ।'

এই বুলিয়া চক্র সঙ্গে মন্ত্র শিখাইল
তারপর, অলক্ষিতে শিবদুর্গা অন্তর্ধান হৈল।

চারবেদ ও চৌদ্দ শাস্ত্রেই সমাজের নিয়ামক

নৃত্য-গীত উৎসব : নটী সবে নাট করে প্রতি ঘরে ঘরে
গাইন সবে গীত গাহে চাতরে চাতরে।
এহিমতে সপ্তদিন নিশি দিশি ভরি
বাদ্যধ্বনি আছিল আনন্দ মণিপুরী।

পৌরুষ-গর্ব : আএ মালিনী, নারী বধ না পারি করিতে।

সংস্কৃতি : প্রণাম করিলা ক্ষেত্রি ধর্ম অনুসারে।

একটি রেখাচিত্র : মুকুতা দেখি অস্তে ব্যস্তে মালিনী উঠিয়া
বসন-অঞ্চলে বান্ধে পুলকিত হৈয়া।
কবির রেখা চিত্রাঙ্কন পটুতার নমুনাও দেশ প্রচলিত।

খাদ্য : ক. মিষ্টি অন্ন ভোজন করাএ দ্বিজবর।
খ. ভাল ভাল মৎস্য কিনি শীঘ্রগতি দেও আনি
আজুকা রান্ধনে কিছু নাই।

হিন্দু বীর : মাথে জটা দিব্য ফোঁটা কটিতে কৃপাণ
হস্তেত গাণ্ডীব দেব ইন্দ্রের সমান।

উচ্চবিত্তের বেশভূষা : গায়েত কবচ গলে মাণিক্যের হার
শিরে ফোঁটকা দিল অতি শোভাকার।
কোমরে পেটিকা গজ মুক্তার ঝরকা
কর্ণেত কুণ্ডল যেন চান্দে দিল দেখা।
হস্তেত বলয়া শোভে অতি মনুহর
সুবর্ণের মোটক মুকুট শিরে চড়াইল
শয্যা বিছাইয়া বৈসে রাজার কুমার
চতুর্দোলে চড়াইল যথ রাজাগণ।

যোগী বেশ : হস্তে কাষ্ঠ মালা গলে গুধুরী বান্ধিয়া
কর্ণেত বৈরাগী মুদ্রা মুখে ভস্ম দিয়া।
হস্তে কমণ্ডুলি চক্র সাথে কৃত্তি কেশ।

ঝড়ঝঞ্ঝাবহুল এদেশেরই একটি সামুদ্রিক ঝড়ের চিত্র :

দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল
লবণ সমুদ্র মধ্যে তরঙ্গ উঠিল।
এক ঘোর নিশি আর হইল তুফান
আর সমুদ্রের জন্তু উঠে তুরমান।
কথ নাও উড়াইয়া নিল যথা তথা
কাঁড়া পাড়া ছিঁড়িয়া না-এর ছিঁড়ে দড়ি
ভাঙ্গিয়া কাঁড়ার নাও করে গড়াগড়ি।
অধিক উঞ্চল হৈল তুফানের বাও
দিগ দিগন্তরে নাহি দেখে আশ পাশ।

তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালি : সেযুগে বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরীক্ষা হত তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালির মাধ্যমেই। এখানে কবির পাণ্ডিত্যপ্রীতিও হয়েছে প্রকটিত। রাক্ষসের প্রশ্ন ও পাত্রপুত্র সুতের উত্তর:

১. কেবা তুহ্মি বসি আছ কার তুহ্মি বশ?
—যোগরস, মৃত্তিকাত বসি আছি পবনের বশ।
২. পৃথিবী সৃজিয়া আছে কথেক আকৃতি?
—সৃজিয়াছে ক্ষিতি আর সুমেরু সাগর।
৩. কোন রঙ্গ পৃথিবীতে আছএ বহুত?
—উচ্চ নীচ যথ দেখ সবুজ বরণ
তৃণলতা বৃক্ষ যথ ভরি আছে ক্ষিতি
নিরক্ষি দেখহ যথ সবুজ আকৃতি।
৪. সঙ্গতি তোহ্মার বোল কেবা আছে মিত?
—সঙ্গে মোর মিত্র আছে বিদ্যাগুণধর।
৫. চন্দ্র সূর্য হোন্তে বড় কার আছে জুতি?
—আঁখি হোন্তে পৃথিবীত জুতি আছে কার।
৬. বচন কহিতে তুহ্মি কোথাত উৎপন?
—জীবেন্দ্র উৎপতি বাক্য সঞ্চারে জিহ্বাত
৭. পৃথিবী পশ্চিম পূর্ব কথ দিন পন্থ?
—সূর্য হোন্তে দিনের প্রমাণ
একদিনে পূর্ব হোন্তে পশ্চিমে পয়াণ।
৮. পবনে-থু কেবা চলে অতি শীঘ্রতর?
—পৃথিবীত মন হোন্তে শীঘ্রগতি কার।
৯. পৃথিবী রহিয়া আছে কিসের উপর?
—ত্রিগুণ আপনার তন
ভর করি রহিয়াছে উপরে পবন।
১০. পৃথিম্বীত কোন্ রঙ্গ সৃজিয়াছে জুতি?
—যথ জোত সৃজিয়াছে ধবল বরণী।

১১. ভূমি কম্পমান হএ কিসের কারণ?
—এ তিন ভুবন আর সুমেরু সাগব
ভার নহে সে বৃষের শিঙের উপর।
তবে কিন্তু ভার হএ পাপের কারণ।
বসিতে চাহএ বৃষে এড়ি ত্রিভুবন।
১২. চারবেদ চৌদ্দশাস্ত্র পড়ে কি কারণ?
—শাস্ত্র পড়ে হিত বিপরীত বুঝিবার।

গ. পদ্মাবতী

আলাউল বিরচিত (১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ)

আলাউল পরিচিতি পূর্বে 'তোহফা' প্রসঙ্গে দেয়া হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ড :

সৃজিলেক সপ্ত মহী ও সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড।

নৌকা (পর্তুগিজ প্রভাব) :

নানা বর্ণ নৌকা সাজে   নাহি সম ক্ষিতি মাঝে
গণিয়া অগণন ডিঙ্গা রঙ্গে
সুলুপ নানান ভাতি   মচুয়া গোরাব পাঁতি
জালিয়া নায়রী নানারঙ্গে
কাষদা আহুতি ভাল   ফেরাঙ্গির বস্ত্র বিশাল
সাতাইশ পাঠলা সংসার

বিভিন্ন বিদেশী :

নানান দেশে নানা লোক   শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল
আরবী মিশরী শামী   তুরকী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজবেক সকল।
লাহোরী মুলতানী সিন্ধি   কাশ্মিরী দক্ষিণী হিন্দি
কামরূপী আর বঙ্গদেশী
অওপিহ খুতঞ্চারী   কান্নাই মলয়াবরী
অচি-কুচি কর্ণাটকবাসী
বহু শেখ সৈয়দ জাদা   মোগল পাঠান যোধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি

আভাই বর্‌মা শ্যাম ত্রিপুরা কুকীর নাম
কতেক কহিব ভাতি ভাতি।
আরমানি ওলন্দাজ দিনেমার ইংরাজ
কাণ্টিলান আর ফ্রানসিস
হিসপানী আলমানী চোলদার নসরানী
নানা জাতি আর পর্ত্তুগীজ।

বিদ্যা ও পাঠ্যশাস্ত্র : আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুয়ানী
নানাগুণে পারগ সংগীত জ্ঞাতাগুণী।
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা।
কাব্যশাস্ত্র ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মহাগণ মূল
তাহাতে মগণ আছে বুঝ কবি কুল
পঢ়ে ব্যাকরণ আদি ত্রিবেদ পুরাণ
জ্ঞানী সব কাব্যরস সতত বাখান
আমার পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম।

হার্মাদ দৌরাত্ম্য : কার্যহেতু যাইতে বিধির ঘটন
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত
রণক্ষতে শুভযোগে আইলুঁ এথাত।

অমাত্যসভায় নাচগান : গুণিগণ থাকেন্ত তাহার সভা ভরি
গীত নাট যন্ত্র তন্ত্র রঙ্গ ঢঙ্গ করি।
কেহ গায় কেহ বায়, কেহ খেলে খেলা
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা।

সৈন্যদল : কটক ছাপ্পান্ন কোটি বহু সেনাপতি
সপ্তদশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি।
সিংহল দ্বীপের সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ
অশ্বগজ সৈন্য সেনাপতি চতুরঙ্গ।

বৃক্ষ ও ফল : ফলভারে নম্র অতি আম কাঁঠাল
বড়হর খিরিনী খাজুর অতি ভাল।
গুয়া নারিকেল তাল ডালিম্ব ছোলঙ্গ
নারঙ্গ কমলা শ্যামতারা কাউরঙ্গ।
জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা মহুয়া বাদাম

বরই শ্রীফল সদাফল কলা জাম।
এতিচিরি উরিআম করঞ্জা তেঁতই
আখরোট ছোহরা লবঙ্গ জলপাই
ছেব বিহি খোরমা সুরস নানা ছন্দ
মধু জিনি মিষ্ট সব, পুষ্প জিনি গন্ধ।

জলাশয় : দীঘি, পুষ্করিণী কূপ হেরি শোভাকার

পাখি : হংস, চক্রবাক, কুরবয়, সারস, শালিক, শারী,
শুক, জলকাক, করণ্ডক, বক, শ্বেতশুক।

ফুল : মরুবক, মালতী, লবঙ্গ, গোলাপ, চম্পা, যুথী, কেতকী, কেশর,
বেলফুল, রঙ্গন, কাঞ্চন, মাধবী, বকুল, কুজা, রূপমঞ্জরী, বাসক,
করুবক, আবন্তক, কালা।

বৈরাগী সাধক শ্রেণী : যোগী যদি সন্ন্যসী করএ তপজপ
কেহ ব্রহ্মচারী কেহ ঋষি অবধূত
নামজপী ঋষীশ্বর পৈত্রুণ বিভূত।
কেহ হরি কেহ নাথ কেহ দিগম্বর
কেহ তো গোর্খের ভেশ কেহ মহেশ্বর।
.... স্থানে স্থানে যোগকথা আগমের ভেদ

মণি— পণ্যদ্রব্য হীরা মণি মাণিক্য মুকতা গজমণি
পুষ্পবাগ বিদ্রুম গোমেদ নানা ভাতি
আমোদ অগুরু মেদ মৃগমদ বেনা
যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা।
ফুলেল গোলাব চুয়া চন্দন আগর
জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর।

নারীবিক্রেতা : সুন্দর পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার।

নারীর পরিচ্ছেদ : প্রতি অঙ্গে শোভিত নানা অলঙ্কার।
শিরেত কুসুম্বী চীর মুখেত তাম্বুল
রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল।
সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলী।

হাটের বর্ণনা : স্থানে স্থানে পণ্ডিত পড়এ শাস্ত্র বেদ
স্থানে স্থানে সুপ্রসঙ্গ কহএ কৌতুকে

কোনস্থানে নৃত্যকলা দেখাএ নাটুকে।
কোন স্থানে ইন্দ্রজালে দেখাএ কুহক
মিথ্যা বাক্য সত্যকরে দেখাইয়া ঠক।
সেই সত্য চটকে তোষএ যেই নরে
গাঁঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে।

রাজপ্রাসাদে : ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারএ
ঘড়ি দণ্ডে দিন ক্ষণ সকলি বুঝাএ।

অট্টালিকা : ঘরে ঘরে সকলের সুবর্ণ চৌয়াড়ি।

খেলা : বসিয়া কুমার সবে খেলে পাশাসারি
দায় বুঝি খেলে যার শুভে পড়ে পাশা।

হিন্দুরাজসভা গড় পরে চারি গড় নৃপতি নিবাস
সুবর্ণ নির্মিত চারু সুন্দর আবাস।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ
তার মাঝে স্থাপিছে রতন সিংহাসন।
কেহ কেহ স্তাবক সহিত পড়ে বেদ
কেহ সুপ্রসঙ্গে কেহ কেহ পুরাণের বেদ
নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত
কেহ কেহ নানা যন্ত্র বায় সুললিত।
চন্দন কুসুম্ব চুয়া কস্তুরী কর্পূর।
আমোদ সৌরভ শোভা দেশ ভরিপূর।
সুরূপ সুরব আর সুগন্ধি পূরিত
দেখিতে শুনিতে সুর মনে আনন্দিত।

প্রাসাদ কর্পূর রতন ঘর সুবর্ণ ইটাল
হীরমণি রতন জড়িত অতি ভাল।
নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে
এক মূর্তি দেখিতে নানা ভাতি ধরে।
দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপগৃহ শোভা
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা।
সপ্ত খণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্র বাট আছয়ে বিস্তর।

রাজদ্বারে হস্তীসব বান্ধিছে অপার,

শ্বেত শ্যাম রক্তবর্ণ ধরে মেঘবর্ণ
মদমত্ত গন্ধধারী বিলোলিত কর্ণ।

হাতেখড়ি স্ত্রীশিক্ষা : পঞ্চম বৎসর যদি হৈলো রাজবালা
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা।
মহান পণ্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।

বিয়ের বয়স (পদ্মাবতীর) :
সম্পূর্ণ হইল যদি দ্বাদশ বৎসর।
হইল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর।

অদৃষ্ট নিয়তি : ললাট লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।

বস্ত্র-শাড়ি : বসন ভূষণ সব বর্ণিতে না পারি
ক্ষেণে পাট নেতশাড়ী, ক্ষেণে জরতারি।
ক্ষেণে শাখা রম্ভাপতি, ক্ষেণে গঙ্গাজল
ক্ষেণে কিরমিজি পৈরে ক্ষেণে মলমল।
ক্ষেণে কৃষ্ণ, ক্ষেণে রক্ত শ্বেত পীত বাস
ক্ষেণে মুজাম্বর, ক্ষেণে নেলদম তাস।
নানা দেশী নানা বাস নানা রঙ্গ পৈরে
তিলে তিলে নানা ভাতি নানা বর্ণ ধরে।

প্রেমে বিরহীর দশদশা : দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থা
কাম হইতে ভাবকের যে দশ অবস্থা।
অভিলাষ প্রথমে, দ্বিতীয় চিন্তা হয়
তৃতীয় স্মরণ, গুণ কীর্তি চুতুর্থয়।
পঞ্চমে উদ্বিগ্ন হয়, ষষ্টমে বিলাপ
সপ্তমেতে উন্মাদ, অষ্টমেতে ব্যাধি তাপ।
নবমেত দুর্দশা, দশমে মৃতবৎ
বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত।

চিকিৎসক : ওঝা বৈদ্য গারুড়ী আইল বহু গুণী
কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকা পবন
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ।
পরীক্ষিত নাড়ীকা চাহিলা গুণিগণে
নির্মল চন্দ্র-সূর্য আপনা ভবনে।
সঞ্চার নাহিক কিছু কফ বাত পিত
কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার।

যোগসাধনা :

শুরু শুকে আসাতে কহিত যোগ কর্ম
এক যোগে ভাব ভক্তি আর যোগে ধর্ম।
কর্মযোগ হৈলে পুনি কায়া সিদ্ধি হয়
ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি বাঞ্ছিত পূরয়।
কর্মযোগে অনাহারে বসি চিরকাল
সাধিলে সে সিদ্ধি হয় ছাড়এ জঞ্জাল।

গুরু :

গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদে অগ্নিকণা
প্রজ্বলিত করে সেই শিষ্য মহাজনা।
পন্থ উদ্দেশিয়া গুরু ধরএ কান্তার
নিজ বলে বাহিলে সাগর হয় পার।

যোগী ও যোগসাধনা :

রাজ্যপাট তেজিয়া নৃপতি হৈল যোগী
করেত কিন্নরী লই বাজাএ বিয়োগী।
শিরে জটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবর
কক্ষে শিঙ্গা ডম্বরু ত্রিশূল লৈয়া কর।
মেখলী ধান্ধারী রুদ্রাক্ষের জপমালা
কান্থা চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা।
চকমক পাষাণ আর পদেত পাওরি
হস্তেতে দ্বাদশ নৈল মটুরা ধান্ধারী।
উড়িয়ান বন্ধ কটি, পৈরণ কৌপীন
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন।
শূন্য পন্থে ধ্যান ধরিয়া সমচক্ষে
শূন্য পুষ্পহার লক্ষ্যে করিল অলক্ষ্যে।
মন পরিচয় মন অমনেত দিয়া
পঞ্চভূত সিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরিয়া।
চতুর্দশ ধারে করি ভক্তি সম্ভাষণ
ষড়দল স্বাধিস্থানে চালাইল মন।
অধারে বসন্ত বণ্য সাধিষ্ঠা বলান্ত
দশদল মণিপুরে আদ্য ডঙ্কা ফুকান্ত।
সেই মণিপুরীত সেবিয়া প্রজাপতি
অনাহত চক্রে কৈল বিষ্ণুর ভকতি।
দশদল মনিপুর ডঙ্কা ফুকেন্ত
দেখিলেন্ত সূর শশী বিশুদ্ধ চক্রেত।
তথাতে কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাগত।
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ
অধোমুখে চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে
ঊর্ধ্বমুখী হইয়া কুণ্ডলী সব চোষে।
দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিব

এই সে কারণে মরে সংসারের জীব।
অকুঞ্চ কুবিতরা অগ্নি শম্ভু রসে বায়ু
জাগাইলে কুণ্ডলী সে চির পরমায়ু।
আজ্ঞাচক্র দুই দলে করি নিরীক্ষণ
তথাতে উজ্জ্বল দুই নির্মল দর্পণ।
শতদল হেরিয়া সহস্র দলান্তর
সেবিল পরম শিব অতি মনোহর।
পূরক কুম্ভক রেচকতে করি মন
তিন সমরসে সাধিলেক প্রাণপণ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ত্রিদেবের শক্তি
আকারে উকারে মকারেত কৈল ভক্তি।
শঙ্খ শিঙ্গা ডম্বরু বাজায় ঘন সান।
শবাসনে বসিল পাতিয়া মৃগ ছালা।

যাত্রার শুভাশুভ :

চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদিত
ধেনু বৎস সংযোগ দক্ষিণে উপস্থিত।
দধি লে দধি লে করি ডাকে গোয়ালিনী
পূর্ণ কুম্ভ দেখিলেন্ত সুভগা রমণী।
নাগশিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন
বামেত শৃগাল ফিরি করে নিরীক্ষণ।
পুষ্পের পসার লই সমুখে মালিনী
শির 'পরে মঙ্গলএ সাচন শঙ্খিনী।

হিন্দুয়ানি উপমা :

তথা রত্নসেন রাজা নৃপসবে করে পজা
সুরপতি জিনি রূপসীমা
রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদুর সদৃশ জ্ঞান
ধার্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির
দানে মানে কর্ণগুরু বুদ্ধি জিনি সুরগুরু
জম্বুদ্বীপে সেই এক বীর।
অল্প বয়সে রাজ্যপাল বিপক্ষ জনের কাল
ক্ষমাএ পৃথিবী সমসর
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত
মর্যাদায় সিন্ধু রত্নাকর।

জ্যোতিষ গণনা :

পূর্বেত জানিল আমি জ্যোতিষ গণনে
তোমার সংযোগ সেই বিধির ঘটনে।

উৎসবে :

মনোরা ঝুনুর সবে গায়ন্ত সুন্দর।
পাঞ্চম সুস্বরে গায় সুন্দর রমণী

কেহ বীণাবাঁশী বাএ সুমধুর ধ্বনি।
মন্দিরা মৃদঙ্গ কেহ বাএ করতাল
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনি অতি ভাল।
নাচি নাচি মাত্র এক তিল যথা ধাএ।
তথাতে আবীর ধূলি অন্ধ সম হয়।
সুগন্ধি ফাগুর রেণু উঠিল আকাশ।

পূজা : সমুখে করিয়া মূর্তি পূজিতে বসিল
ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দন পুষ্পমালা
নানাবিধ ফল যত সব অতি ভালা।

রত্নসেন ও শুক ছিল গোর্খশিষ্য :
উন্মত্ত চরিত্র প্রায় দেখি লাগে ধন্ধ
সমতুল্য নহে মছন্দর গোপীচন্দ্র।
নিপতিত গোর্খশিষ্য প্রেমমদ দিয়া।

শিবের সজ্জা : সত্বর গমনে আইল দেব উমাপতি
শিরে গঙ্গাধারী জটা গলে অস্থিমালা
অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পবিত্র ব্যাঘ্রছালা।
কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রিমা সুচারু
কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেতে ডম্বরু
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে হস্তেত ত্রিশূল
ওড়ের কলিকা জিনি নঁয়ন রাতুল।

শহীদ ও যুদ্ধ : দুই মতে যুদ্ধ ভাল শুন নরপতি
জয় পাইলে কার্যসিদ্ধি মৈলে স্বর্গগতি।

টোটকা চিকিৎসা : কোন সখী পাক তৈল শিরেত ঢালেন্ত
কেহ কেহ হস্তপদে তৈল ঘষি দেন্ত।
কেহ আনি অঙ্গে ছিটে শীতল চন্দন
বিচনী লইয়া কেহ দেনায় পবন।
কোন সখী শীঘ্র জল আনি দেন্ত মুখে
নাসা অগ্রে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস দেখে।
সিংহ তৈল জগধারা চাম্পা ভৃঙ্গ তৈল
বালা তৈল কচিস্পষ্টা বেলাখেলা তৈল।
পদরি গুধরা মাজা মার্জনা যে তৈল
নানা জাতি তৈল দিল শান্ত না হইল।

অশ্বচালন বিদ্যা [চৌগান] :

নৃপতির আরতি বুঝিয়া রত্নসেনে
চড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে।
প্রথমে দোগাম চালি শাহা আগে গাম
এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অনুপাম।
বোহা আর সপ্ত চালি চালাই সকল
না লড়ে অঙ্গের মক্ষি উদরের জল।
পুনি চালাইয়া তবে দোলক কুণ্ডলী
ধূলি মাঝে অশ্ব গেল মেঘেতে বিজলী।
দক্ষিণে ফেরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক
অলক্ষিতে গতি যেন কুম্ভকার চাক।
যখনে দক্ষিণ বামে পাক উল্টাএ
আগে পাছে তখনে কিঞ্চিত চিন পাএ।
তবে বাগ খেঁচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ
অযোগ্য না মারে লম্ফ সিংহগতি রীত।
ক্ষেণে শত হস্ত 'পরে ক্ষেণেক পঞ্চাশ
ক্ষেণে ক্ষিতি ছোঁয়া ক্ষেণে শূন্য পরকাশ।
ভূমিপদ রূপি দুই হস্ত উর্ধ্ব কৈল
চতুর্মুখে পাক লৈল লাটিম আকার
চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আসোয়ার।

ইত্যাদি

দক্ষিণদেশী নর্তকীর নৈপুণ্য :

দক্ষিণা নর্তকী যেন ত্রিপদ দেখায়
আগে পিছে চতুর্দিকে চিনন না যায়।

চৌগান খেলা :

চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহণ
দুই দিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল
মধ্য ভাগে আরোপিয়া গেরুয়া ফেলিল।
মিশামিশি হই সবে লাগিল খেলিতে
সকল চাহেন্ত নিতে আপনার ভিতে।
সিংহলের অশ্ববার গুলি নিতে চায়
চৌগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পলটায়।
গেরুয়া বেড়িয়া শব্দ উঠে ঠনাঠনি
দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি
ঈষৎ হাসিয়া রাজা আসিয়া তুরিত
গেরুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত।

বিদ্যার বিচার :

শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান
একে একে রত্নসেন করিল বাখান।
সঙ্গীত পুরাাণ বেদ-তর্ক অলঙ্কার
নানাবিধ কাব্যরস আগম বিচার।
নিজকাব্য যতেক করিল নানাছন্দ।
শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্ধ।
সবে বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস।
কবি বেদজ্ঞ মহাগুণী প্রাণে অকাতর
সুড়ঙ্গের পন্থে কিবা আইল সুন্দর।
অবশেষে করিলেক সঙ্গীত বিচার
পুস্তকের আদ্যভাব রসের প্রকার।
পিঙ্গল চৌষট্টি ছন্দ অষ্ট মহাগণ
অষ্টনায়িকার ভেদ শব্দের লক্ষণ।
মগণ যগণ আর রগণ সগণ
টগণ জগণ অন্তে তগণ নগণ
এই অষ্ট মহাগণ দেখহ বিদিত
বিরচিয়া কহি তবে গণের চরিত।

'গণ'-পরিচয় :

লঘু গুরু জানিলে গণের ভেদ পায়
তেকারণে লঘু গুরু জানিতে জুয়ায়।
হ্রস্বকার ঋ৯কার অক্ষর মুকল
এই তিন লঘু আর গুরু যে সকল।
কবিত্বের পদের প্রথম তিনাক্ষর
বিচারিবা কেবা লঘু কেবা গুরু নর।
তিন গুরু হৈলে তারে বলিয়ে মগন
নিধি স্থির বন্ধুপ্রাপ্তি হয় ততিক্ষণ।
আদ্যলঘু দুই গুরু হয় অন্তে যার
তাহারে যগন বলি বুঝিয়া বিচার।
মধ্যে লঘু দুই দিকে দুইগুরু হয়।
সেই সে রগণ হয় জানিঅ নিশ্চয়।
দুই গণ গুণ কহি মনে করি কল্প
যগণে সাহস বহু রমণ আয়ু অল্প।
অন্তে গুরু আদ্যে মধ্যে লঘুর প্রচার
সুনিশ্চিতে জানিঅ সগণ নাম তার।
দুই দিকে গুরু একাক্ষর লুঘু হেটে
তাহারে তগণ বলি জানিঅ প্রকটে।

সগণে পড়িলে মাত্র করঅ উদাস
তগণেতে শূন্য ফল জানিঅ নির্যাস।
মধ্যে গুরু দুই দিকে দুই লঘু পায়
তাহারে জগণ বলি উৎপাত করয়।
অন্তে মধ্যে লঘু যার গুরু আদ্যক্ষর
ভগণ মঙ্গল ফল দেস্ত বহুতর।
তিন লঘু নগণ সম্পদ বৃদ্ধি বুদ্ধি
রণ সিদ্ধি আপদ-তরণ কার্য-সিদ্ধি।

অষ্টনায়িকা :

অষ্ট নায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া
যেমত লক্ষণ তার শুন মন দিয়া।
আদ্যে নারী খণ্ডিতা দ্বিতীয়া অভিসারী
তৃতীয়া বাসক সজ্জা বিপ্রলব্ধা চারি।
পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কলহান্তরী ষষ্ঠামে
স্বয়ং দূতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে।
স্বাধীন ভর্তৃকার অষ্টমে লৈল নাম।

পঞ্চশব্দ : বাদ্য-রহস্য:

অবধান কর পঞ্চশব্দের চরিত
আদ্য 'তত' 'বিতত' দুইয়ে পরিমাণ
তৃতীয় 'সুষির' চারি 'ঘন' হেন জান।
পঞ্চম অনাহত লৈয়া পঞ্চশব্দ নাম
কারে কোন শব্দ বলে শুন অনুপাম।
কপি নাম আদি যত তালের বাজন
তাহারে বলিএ তত শুন মহাজন।
মন্দিরা করিয়া বাদ্য যত তাল ধরে
সেই সে 'বিতত' জান শব্দ মনোহরে।
উপাঙ্গ মুরচঙ্গ আদি শব্দ যত বায়
তাহাকে সুষির হেন বলে সর্বথায়।
নাকাড়া দুন্দুভি আদি বাদ্য যত চর্ম
'ঘন' হেন নাম ধরে বুঝ তার মর্ম।
মুখ হন্তে উচ্চারিত হয় যত শব্দ
নিশ্চয় তাহার নাম জানিও 'অনাহত'।
এই মতে কহএ **সঙ্গীত দামোদরে**
সঙ্গীত দর্পণ মত শুন কহি তারে
তত বিতত ঘন সুষির মিশ্রিত
চারি শব্দে একশব্দ অতি সুললিত।
এই পঞ্চশব্দ কহে সঙ্গীত দর্পণে।

বিবাহোৎসব ও নিমন্ত্রণরীতি :

শুভক্ষণ শুভলগ্ন করিয়া বিচার
রচিল বিভার কার্য মঙ্গল আচার।
কর্পূর সংযোগে পান দিয়া ঘরে ঘর
পঞ্চশব্দে বাজনা বাজায় মনোহর।
ছাইলেক হাট ঘাট স্বর্ণ পাটাম্বরে
পূর্ণঘট কদলী স্থাপিল দ্বারে দ্বারে।
নৃত্য গীত আনন্দ বাজায় পুণ্যদেশ
নাচে বেশ্যা শত করি মনোহর ভেশ।
আগর চন্দন ধূমে আকাশ ছাইল
আর গন্ধ চতুসমে ধরণী লিপিল।

অশুভ বলে বিবাহ উৎসবে বিধবা বর্জন :

পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী শূদ্রানী
সুকুলীন সধবা সুবেশ সুরমণী।
নৃপগৃহে আসি মহাদেবী অনুমতি।
আয়ো স্ত্রী সকলে সজ্জা কৈল রঙ্গমতি।
বেদী অবশেষে মিলি যুবতী সকলে
বর কন্যা স্নান করাইল কুতূহলে।
রাজনীতি বস্ত্র অলঙ্কার পরাইল।
সুন্দর সধবা নারী মঙ্গল বিধান করি
সতত করএ উতরোল।

হিন্দু বিবাহ :

সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে
স্বর্ণঘট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে।
গণেশ আদি পঞ্চদেব পূজিয়া হরিকে
যণ্ড আর মার্কণ্ড পুজিল তার শেষে।
তবে গন্ধ অধিবাস কৈল শুভক্ষণে
ললাটে বিংশতি বর্ণ ছোঁয়াইল ব্রাহ্মণ।
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্বা পুষ্প ফল
দধি ঘৃত শঙ্খ আর সিন্দূর কাজল।
স্বস্তিক গোচনা সঙ্গে সিদ্ধান্ন কাঞ্চন
রৌপ্য তাম্র কাঁসা আর নির্মল দর্পণ।
এ সকল প্রত্যেক কপালে প্রসারিয়া
প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া।
অখণ্ডন কদলী পত্র কাটারী দর্পণ
বরের কন্যার হস্তে কৈল সমর্পণ।
পাত্রমিত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ সজ্জনে

কর্পূর তাম্বুল মান্য দিল জনে জনে।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি
অতি মহোৎসব করি বঞ্চিলা রজনী।

হিন্দু বরসজ্জা :

রত্নসেন মহারাজ পরিয়া বিচিত্র সাজ
বস্ত্র অলঙ্কার ভার তনু
মস্তকে কিরীট শোভে দেখি সুরপতি লোভে
জলদ উপরে যেন ভানু।
রতন সেহেরা ভালে মুক্তা লো'র তাহে দোলে
তারকা বেষ্টিত শশধরে
রতন-কুণ্ডল কাণে তরুণ অরুণ জিনে
বালার্ক অরুণ নাম ধরে।
চন্দনে ললাট-ফোঁটা জিনিয়া চন্দ্রিমা ছটা,
কুণ্ডল অধর সুনয়ন
উচ্চ গ্রীবা গলায় রত্ন কণ্ঠমালা তায়
সঙ্গে রবি নক্ষত্র মণ্ডল
জড়াউ কমরে পাটা সুবর্ণ রত্নের ছটা
দেখিতে নিঃসরে আঁখিজল
রত্ন বাজুবন্দ বায় কুলবতী মোহ পায়
নব রত্নাঙ্গুরী করশাখে
জরকাশী পাদুকা পায় রত্নের কাবাই গায়।

বাদ্যযন্ত্র :

পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল সাজে
শানাই বিগুল শিঙ্গা বাঁশী
উরুমর্দ মধুবাণী মৃদঙ্গ উপাঙ্গ ধ্বনি
আর গুয়া সুশি রাশি রাশি
মুদ্রাকসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল
বিতত বাজএ বহুতর
মুরলী দুন্দুভি জোড়া বাজাএ পেগম কাঁড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহর।
রবাব দোতারা বীণ কাপিলাস রুদ্রবীণ
সমগু বাজএ সুললিত
তাম্বুরা কিন্নরী বেলা বিপঞ্চি সুস্বরতালা
বাজে তত তাল রাগে গীত।
.... তালে তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ।

বাজি :

নানা বর্ণ বাজি পোড়ে অলেখা হাবই উড়ে
গাছ বাজি আর উঠে ঘন

নারীর অলঙ্কার : বেসর, রসনা, মুক্তাবেষ্টিত রতন, কুণ্ডল, সপ্তছড়িহার, অঙ্গদ, কঙ্কণ, রতনবলয় রত্নঅঙ্গরী, কটিভূষণ, নূপুর।

হিন্দু কনে সজ্জা : কিঙ্কণী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁজর, নেপুর মধুর বাজে
গুথিলেক কেশ, কুসুম সুবেশ, সিন্দূর চন্দন তিলে।
সঘন রতি, তারকাপাঁতি বান্ধুলী রত্ন বিরাজিত।
সিন্দূর ভালে মাগন বলে, সমান অধর জ্যোতি।
রসনা সুলাল বচন রসাল, বিরহবেদনা মোহিত।

বর-কনের শুভদর্শন : পুষ্পবৃষ্টি সম্বরিয়া গীম হস্তে মালা লৈয়া
কন্যা গলে দিলেক রাজন
গীম হস্তে পুষ্পমালা দুই করে লৈয়া বালা
পতিগলে করিল স্থাপন।
ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি মুখ-পট দূর করি
বলে 'সম দৃষ্টি হের বালা।'

হিন্দুকন্যা সমর্পণ : তখনে কন্যার বাপে পূর্ণ ঘট আনি
বর হস্ত 'পরে তুলি কন্যা হস্তখানি
পঞ্চ হরিতকী লই এ পঞ্চ মাণিক
কুশ লই হস্তযুগ বান্ধিল খানিক।
কুশ তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে
কন্যা উৎসর্গিয়া দানু দিল জামাতারে।
সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল
বলে ক্ষমাশীল জ্ঞানী তুমি আপনে পণ্ডিত
কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে
স্বামী কৃপা হন্তে নারী দুই জগে তরে।

কন্যা-বিদায় : পঞ্চম প্রকারে হোম করিল ব্রাহ্মণ
জয়হোম লাজহোম করি তার পরে
সপ্তপদী গমন করিল কন্যা বরে।
দম্পতি দাণ্ডাই পুণ্য হোম দিল যবে
ব্রাহ্মণের যজ্ঞের দক্ষিণা দিল তবে।
ঘরে নিয়া সুবেশা সধবা নারীগণ
স্ত্রীআচার করিলেক করিয়া বরণ।

ঘরজামাইর লজ্জা : রহিছ শ্বশুর গৃহে কতবড় লাজ।

যাত্রার শুভাশভ :	শুক্র-রবি পশ্চিমেতে গমন কঠিন গুরুবারে সিদ্ধি নহে গমন দক্ষিণ। সোম শনি পূর্বেতে না যাএ কদাচন উত্তর মঙ্গলে বুধে অশুভ লক্ষণ।
তবে,	অবশ্য যাইব যদি নাহিক এড়ান তাহার ঔষধ কহি শুন বুদ্ধিমান। শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই বৃহস্পতি দক্ষিণেতে চলিব গুয়া খাই। উত্তরেতে মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিব দর্পণ দেখিয়া সোমে পূর্বেত চলিব। রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিয়া মুখে। বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্বে চলো সুখে। বুধবারে উত্তরে যাইয়া খাবে দধি বিচারি কহিল সপ্তবারের ঔষধি।
ভৌতিক সংস্কার :	এবে চক্র যোগিনীর কথা শুন সার ত্রিশ অষ্ট দিকে যোগী ফিরে বারে বার। এক নব ষড়দশ চতুর্বিংশ দিন পূরব দক্ষিণ দিকে যোগিনীর চিন। অষ্টাদশ, সাত বিংশতিন একাদশে সুনিশ্চিতে যোগিনী দক্ষিণ দিকে বসে। দশ পঞ্চ বিংশ দুই সপ্তদশ দিনে যোগিনী পশ্চিমে থাকে দক্ষিণের কোণে। বায়ু বিংশ আর সাতাইশ চারি যোগিনী পশ্চিমে থাকে বুঝিবা বিচারি। বিংশতি দিবস আর ত্রয়োদশ বাণ উত্তর-পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান। পঞ্চদশ ত্রয়োবিংশ অষ্ট আর ত্রিশে নিশ্চয় যোগিনী থাকে উত্তর দিকে সে। চতুর্দশ বিংশ সপ্ত উনতিরিশেতে যোগিনী পূর্বেতে থাকে জানিও নিশ্চিতে। ষষ্ঠ, অষ্ট, বিশ এক, বাইশ চলিতে যোগিনীর সম্মুখে না যাও কদাচিতে।
যুদ্ধবাদ্য :	বাজাএ দুমদুমি পুনি তবল নিশান বেউল কর্ণাল শব্দে ভূমি কম্পমান। ঢালি সবে ঢাল গায় বাড়ি মারে চারু

শতে শতে সানাই সুস্বরে বাজে মারু।

স্বামী : অতিথি স্বরূপ কন্যা থাকে পিতা ঘরে।
ত্রিভুবন মধ্যে জান স্বামী সে দুর্লভ
স্বামী সে সংসার সুখ ধন্ধ আর সব।
স্বামী সে পরম গুরু সব এক চিতে
ভক্তি শক্তি স্বামী সঙ্গে বঞ্চিও পিরীতে।
...স্বামী বিনে নারীরে সেবকে না ডরায়।

কন্যা-বিদায়—মা-বাপের অসহায়তা :
অবলা দোষের ঘর সদা করে রোষ
ক্ষেমিবা আমারে চাহি কৈল্যে কোন দোষ।
কেহ নাহি নিকটে দোসর বাপ ভাই
মনে দুঃখ পাইলে কহিব কার ঠাঁই।
ক্ষুধাতুর হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিব
মা বাপ বলিয়া আর কাহাকে ডাকিব।
সকল প্রকারে তারে পালন করিবা।
আমা সব প্রতি নৃপ দয়া না ছাড়িবা।

দান-মাহাত্ম্য : দান হন্তে বিঘ্ননাশ কীর্তি মহী 'পরে
অন্তকালে পাপ হরে স্বর্গ অনুসারে।
এক দিলে দশ পায় সেই পুণ্য ফলে
দাতাজন নির্ধনী না হয় কোন কালে।
দুঃখ খণ্ডি সুখ পায় দানের সম্ভবে
মূল নিষ্কণ্টকে রহে পুণ্য পায় লাভে।

ধন-মাহাত্ম্য : ধন হন্তে যেই ইচ্ছা পারে করিবার
ধনহীন জনের জীবন অকারণ
কি কর্ম করিতে পারে না থাকিলে ধন।
ধন হন্তে অকুলীন হয় কুলছত্র
সংসারে মহত্ত্ব রহে বিজয় সর্বত্র।
সঙ্কটতরণ ধন সেই সুখরস
মনিষ্যকে কি বলিব দেব হয় বশ।

নিয়তি : করতায় যেই করে সেইমাত্র হয়
কর্ম অনুরূপে ভোগ সংসার বিষয়।
প্রবল যাহার কর্ম বিনি যত্নে পায়
ভাগ্যহীন যত জন পাইয়া হারায়।

সেনানী : দোহাজারী তেহাজারী হাজারে হাজার
পঞ্চগত সপ্তশত গণিতে অপার।

যক্ষ-উপাসক : রাঘব ভকতি ভাবে নিত্য নিত্য যক্ষ সেবে
যক্ষ সিদ্ধি আছিল তাহার।

তুল : মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে (চৈতন্য ভাগবত)

বিদ্যার্জনে দেশভ্রমণ : সপ্তদ্বীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার কারণ
তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন।
নানারূপ দেখিয়াছি ভ্রমি নানা দেশ
শাস্ত্রেই জানিনু কত ভালমন্দ লেশ।

পর্দা : দান দিতে চিক ধারে আইল কলাবতী।

মুঘল পূর্ব যুগে : তুর্কি নামেই অভিহিত হত বিশেষ করে বিদেশাগত এবং সাধারণভাবে মুসলমান।

—বল গিয়া তুরুকরে না করে বিলম্ব।
—বিনি দোষে তুরুকে করিতে আইসে বল।
—যারে যেই ইচ্ছা হয় তুরুকে করিবে।

হিন্দু-বিদ্বেষ : মুসলমান জাতি তোর মনেতে নাহি আশা
কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা।
দীন মুহাম্মদী আছে মোর শিরে ছত্র
তাহার প্রসাদে হবে বিজয় সর্বত্র।

স্বাজাত্য : নৃপসব কল্পতরু আর হয় তাত
আমি সব অল্পপ্রাণ শীঘ্র যায় জাত।
আমি সব চাহি ক্ষেমিলে অপরাধ
হাস্যমুখে দেও শাহা তাম্বুল প্রসাদ।
শাহার লবণে মুখ নারি ফিরাইতে
কুল ক্রমে জাতি ধর্ম না পারি তেজিতে।
আজ্ঞা কর আমি চিতান্তর অনুসারি
রত্নসেন সঙ্গতি হইয়া সব মরি।
হাসিয়া দিল্লীর নৃপ সবে দিল পান
হয় বস্ত্রে দান কৈল বহুল সম্মান।

ধন্য ধন্য বলি বাখানিল পুনিপুনি
কুলের নিমিত্তে ইচ্ছে তেজিতে পরাণি।

সুলতানেরা মুসলমান সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করত গাজী বা শহীদের সম্মানের লোভ দেখিয়ে :

হেনমত যুদ্ধ আসি মিলে পুণ্য ফলে
জিনিলে শাহার আগে প্রসাদ পাইবা
মরিলে কাফের যুদ্ধে শহীদ হইবা।
এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণ পণ
ক্ষুদ্র হিন্দু সমুখে রহিব কতক্ষণ।

হিন্দুদেরও সেই আহ্বান:

রণে ভঙ্গ মৃত্যুধিক রহএ অখ্যাতি
যুদ্ধ করি মরিলে হয় স্বর্গগতি।

যুদ্ধাস্ত্র :

গোলাগুলী শর যুদ্ধ করিয়া অপার।
অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতি পদাতি
নানা অস্ত্র প্রহারএ ্রোধ করি অতি।
খর্গ চর্ম ছেল টাঙ্গি মুদগর বিশাল
তবল তাম্বুরাদি নারাচ ভিণ্ডিপাল।
গুরুজ প্রসার আর ঘাদুয়া ঝামর
দস্তাদস্তি কশাকশি যুদ্ধ বহুতর।
কার শিরে ভিণ্ডিপাল হানে কোন বীর।

বিদেশী যোদ্ধা :

হাবসী ফিরিঙ্গী রুমি গোলন্দাজী যত
যাকে পায় তাকে মারে না চাহে মহত্ত্ব।

ধর্মশালা :

পতিমুক্তি পাইতে মনেত ভাবি বালা
পদ্মাবতী রচিলেক এক ধর্মশালা।
পরদেশী পন্থিক যথেক যুগী জাতি
অন্ন জলে দান করে বিশেষ ভকতি।

টোনা :

দেবত্তা মোহিতে পারি ইন্দ্রের যুবতী।
যেই কামরূপী ছিল চাম্পারি ললনা
জ্ঞাত মোহিনী তথোধিক মোর টোনা।
মন্ত্র হোতে বৃক্ষে চলে উলটয় নদী
পর্বত টলয় তিলে মন্ত্রের অবধি।
মন্ত্রবলে সর্প ধরি পেটারিতে রাখে।

সাক্ষাতে লুকায় যদি দিবসে না দেখে।
মন্ত্রে ভুলাইতে পারি মহাজ্ঞানী প্রাণ।

সতীত্ব ও স্বামী : কণ্টক ফুটএ পদে গেলে আন বাটে
দুই নৃপ কদাপি না বৈসে এক পাটে।
স্বামীর পিরীতে ভাবে নিজ প্রাণ দিব
এ জন্মে না পাই যদি জন্মান্তরে পাব।
এক ছাড়ি দোসর ভাবিলে নহে সতী
সংসারে কলঙ্ক পরকালে অধগতি।

হিন্দুপুরাণে সতীত্ব পঞ্চ স্বামী সেবী সতী হইল দ্রৌপদী
বালি বিনু সুগ্রীবে বরিল তারাবতী।

নাবালিকার বিবাহ ও গমনা :
এবে গমনার কথা শুনহ বিদিত
রাজপুত কুলেত আছএ হেন রীত।
শিশুমতি কন্যারে যদি বিবাহ করে
যাবত দেখএ পুষ্প থাকে পিতৃঘরে।
নানা রঙে খেলি থাকে শৈশবের চিত
দৈব যোগে পদ্ম যদি হয় বিকশিত।
কতদিন ব্যাজে কন্যা স্নান করাইয়া
সকৌতুকে স্বামী গৃহে দেয় পাঠাইয়া।
তবে তার স্বামী সঙ্গে রতি রঙ্গ হএ
রাজপুত কুলে তারে গমনা বলএ।

ঘ. সিকান্দার নামা

আলাউল রচিত [মৎ-সম্পদিত]

[১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত]

কবির জীবনবোধ ও ধর্মানুরাগ :
ছল বল হোন্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলে বলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত।

এবং— সাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়

কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি পায় লোপ
না ভাবিয়া অনুচিত স্থানে করে কোপ।
উত্তমে হরিষে থাকে ভুঞ্জি ভুঞ্জ রীত
পরবিত্তি লোভ হোন্তে নিবারিয়া চিত।

বৃক্ষের রূপকে কবি আদর্শজীবনের চিত্রও অঙ্কিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন :

অসার সংসার সুখ হোন্তে দুঃখ লভে
সেই ধন্য যাহার কীরিতি রহে ভবে।
ফলবন্ত হৌক মহাবৃক্ষ অনুপাম
যার ছায়াতলে পারি করিতে বিশ্রাম।
ক্ষেণে ফল হন্তে দেয় বৃক্ষপত্রে শোভা
ক্ষেণে ছায়া হোন্তে রক্ষা করে সূর্যপ্রভা।
ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল
হেন তরু সুচারু রহুক চিরকাল।
ফলছায়াযুক্ত বৃক্ষ হেলে সুশোভিত
পরশু লাগাইছে হেন অসাধু-চরিত।

সমাজেরও নানা রীতিনীতির আভাস আছে এখানে ওখানে। সম্মানে বা স্বাস্থ্য কামনায় পান—

সুরা পিয়ো কয়মুচ নৃপরে স্মরিয়া।

রৌসনকর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরস্তু যখন দারার মহলে গেলেন তখন—

চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী।

এ হয়তো অগ্নিউপাসক দারা মহলের চিত্র নয়, পর্দানসীন মুসলিম সম্রাজ্ঞীর আলেখ্য।

তারপর শুভ দিন-ক্ষণ-লগ্ন দেখে বিয়ের তারিখ স্থির করা হল, তখন থেকে উদ্যোগ আয়োজন সাজসজ্জা হল শুরু—

নানাবর্ণ বানাকুল নাচিছে চামর
লক্ষ লক্ষ ঊর্ধ্ব কৈল নগরে নগর
স্বর্ণবর্ণ নানাবস্ত্র কৈল নবগিরি
সহস্রে সহস্রে টানাইলা শূন্য ভরি।
বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল
নানা ভাতি সুবর্ণ কানাত টানাইল।
কৃত্রিম কুসুম্ব পূর্ণ কৈল হাটবাট
যথা তথা যন্ত্রবাদ্য রাগগীত নাট।
ভক্ষ্য শেষে সুগন্ধি ছিটাএ বহুতর
আগর চন্দন মিলি কস্তুরী আম্বর।
কুঙ্কুম জরদ চুয়া গোলাব ফুলেল
নানান সৌরভ নানা ভাতি মেল।
নানাবিধ পাকতৈল করিয়া মিশ্রিত

সুরঙ্গ কুসুম লগ্নে করে অঙ্গ হিত।
সিরাজের পঙ্কে হৈল মেদনী পিছল
আবীর সুগন্ধি ধূলে শুকায় সকল।
নিশা কালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া
বৃক্ষ ডালে হাটে বাটে রাখএ টানিয়া—
পঞ্চশাখা ত্রিশাখা দেউটি লক্ষে লক্ষে
মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে।
জলে স্থলে লক্ষে লক্ষে পোড়ে নানা বাজি
ভাতি ভাতি বহুরূপে আইল সাজি সাজি।

মারোয়া : শুভক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিলা
রত্নময় চন্দ্রাতপ ঊর্ধ্বে আচ্ছাদিলা।
কন্যাকে মার্জনা করে যথ বরাঙ্গনা
শুভক্ষণে শাহা হস্তে বান্ধিল কঙ্কণা।
এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল
শুভবিবাহের দিন উপস্থিত ভেল।

বরের সাজ : শিরে রত্নময় তাজ জ্যোতিমন্ত গ্রহরাজ
কেশ-রাহু করিছে গরাস
সুবর্ণ সোহরা মাথে মুকুতা হাতে ভাতে
অপূর্ব তারক সূরপাশ।
বাদলা কাবাই গা'তে নয়ানে ধরএ জোতে
জড়াই কোমরে পাটা সোহে
নানাপুষ্প গুঞ্জমাল ঝলমল করে ডাল
হেরি কুলবধূ মন মোহে।
সুবর্ণ পাছড়া গায় মুক্তাদাম ঝালকএ
হেটে শোভে জর্কাসি তুমান।

জুলুয়া : জুলুয়ার ক্ষণ যদি হইল নিকটে
কন্যাকে সাজাই আনি বসাইল পাটে।
মধ্যভাগে দিব্য অন্তস্পটে আচ্ছাদিল।...
শাহারে আনিয়া বসাইলা আনভিতে
আনন্দে জুলুয়া দিলা শাস্ত্রবিধি রীতে।
পাঠ তুলি হাদিয়া অঙ্গুরী করে দিলা।
পরশে দোহার অঙ্গ পুলকিত হৈলা।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর
শাহার কোলেত আনি দিলা কন্যাবর।

মা কন্যাকে শেষ উপদেশ দিলেন :

পতি বিনে সতীর নাহিক গুরুজন
দোহ জগে সুখ মুক্তি যেই সেবে স্বামী।
কদাপিহ রিষ গর্ব মনে না রাখিবা
প্রেম ভক্তি সেবামাত্র আচরি রহিবা।

বরের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে গিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছেন :

কায়ানী বংশেতে মাত্র আছে এহি কন্যা
তোহ্মাতে সপিলুঁ বাপু আজি হৈল ধন্যা।
পিতৃহীন এতিমেরে দয়ায় পালিবা
দোষ কৈলে দারা মুখ চাহিয়া ক্ষেমিবা।
স্ত্রীজাতি হীনমতি রোষ রিষ ঘর
আপে মহা বিজ্ঞ তুহ্মি শাহা সিকান্দর।
তোহ্মা হস্তে সমর্পিলুঁ মোর পতিপ্রাণ
তুহ্মি জ্ঞান প্রভু জানে কি বলিব আন।

এ যেন কোনো সাধারণ ঘরের শঙ্কাতুর মনের উক্তি। এক বাঙালি কবির রচনায়ও এমনি কথা পাই। শ্বশুর কনে-সমর্পণ করবার সময় জামাতাকে বলেছেন :

কুলীনের পো তুহ্মি কি বলিব আহ্মি
হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট পুরে ভাত।
ইত্যাদি।

বিবিধ :

সতেরো শতকে নৌবিদ্যায়, নৌবহরে, নৌযুদ্ধে, জলদস্যুতায় আরাকানিদের জুড়ি ছিল না এদেশে। আরাকানিদের এই গর্বিত দাপট আলাউলের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তিনি সযত্নে আরাকানরাজ্যের শক্তিপ্রতীক নৌবহরের বর্ণনা দিয়েছেন—

অসংখ্যাত নৌকাপাঁতি নানা জাতি নানা জ্ঞাতি
সুচিত্র বিচিত্র বাহএ।
জরিশ পাঠ-নেত লাঠিত চামর যুত
সমুদ্রপূর্ণিত নৌকামাত্র ॥
আচ্ছাদন দিব্যবস্ত্রে অগ্নি আদি নানা অস্ত্রে
সম্পূর্ণ সুরূপ ভয়ঙ্কর।

আরাকানরাজ চন্দ্রসুধর্মার অভিষেক-উৎসবে পৌরোহিত্য করেছেন মুসলমান মহামন্ত্রী নবরাজ মজলিস। রাজা শপথ গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছ থেকেই। সে-শপথও আবার ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবিক :

মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সম্মুখে দাণ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর

না করিবা ছলবল লোকের উপর।
শাস্ত্রনীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত
নির্বলীরে বল না করৌক বলবন্ত।
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্য ধর্মবন্ত।
সুজনেরে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত।
ক্ষেমাধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা।
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা।
আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি।

তারপর :

প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ।

এ নিশ্চিতই মুসলিম সংস্কৃতির গাঢ় প্রভাবের ফল। এ প্রভাব বিশেষভাবে শুরু হয় ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

৬. সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল

দোনাগাজী বিরচিত [মৎ-সম্পাদিত]

দোনাগাজী সতেরো শতকের কবি। তাঁর নিবাস ছিল চাঁদপুর মহকুমার 'দোল্লাই' গ্রামে। তাঁর পুরো নাম দোনাগাজী চৌধুরী।

প্রেমতত্ত্ব

বাংলাদেশে খাঁটি শরিয়তি ইসলাম কখনো অনুসৃত হয়নি। সুফিমতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বাঙালি মুসলমানদের ধর্ম। তাই সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিল মুসলমানদের মজ্জায়। মধ্যযুগের সব কবির স্তুতি-অংশে তাই আল্লাহ ও রসুল অভিন্নসত্তার জাহেরিরূপ বলে পরিকীর্তিত। তা ছাড়া সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে রয়েছে প্রেম। আল্লাহর প্রেমানুভূতিই জগৎ সৃষ্টির উৎস :

আদ্য প্রভু সৃজিয়াছে প্রেমে ত্রিভুবন...
সৃষ্টি সৃজিয়াছে প্রভু প্রেম অনুভবি
প্রেমভাবে সৃজিয়াছে মোহাম্মদ নবী।

তাই, প্রেম সে পরমতত্ত্ব জানিঅ নিশ্চএ

আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ।
প্রেম সে পরম তত্ত্ব, প্রেম সে উত্তম
প্রেম সে মজাএ মন প্রেমে সে জনম।
জগত জনম জান প্রেম অবতার।...

'আদ্যপ্রভু' কথাটিতে বৌদ্ধ 'আদিনাথ' তত্ত্বের প্রভাব ও ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

শিক্ষা

পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হত বালক-বালিকার বিদ্যাচর্চা। রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্রকে :

পঞ্চম বরিখে শাস্ত্র পড়িবারে দিল।

সেকালে পাঠ্যতালিকার তথা পাঠ্যসূচিরও উল্লেখ রয়েছে :

শিখিয়া আপনা শাস্ত্র [শাস্ত্রবিদ্যা] শিশু
কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র শিখিল পুরাণ
সিদ্ধিশাস্ত্র [যোগ] আগম জ্যোতিষ আর যথ
শিখিল যথেক শাস্ত্র কি কহিব কথ।

সে-যুগে সাধারণ ঘরেও নারীশিক্ষা দুর্লভ ছিল না, যোষীকন্যা ও বেনেবউ কেবল শিক্ষিতা নয়, বুদ্ধি ও চাতুর্যে পুরুষের বাড়া। যোষী কন্যা ছিল :

নবীন যৌবনী কন্যা প্রসঙ্গে বিদুষী...
যুক্তি অনুযুক্তা যুক্ত উক্তি অতিরক্তা
বিলাসী সঙ্গীত ভাষী কাব্য পরিভক্তা।
চাতুর্যে মাধুর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্য।...

আর বেনে-বউয়ের পরিচয় এরূপ :

আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বনিতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর
পারগ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত চতুর।

নারীর স্থান

পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নজীবী ও অসহায়। সারাজীবনে তার কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর এবং মাতারূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন। তার বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুরবাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল না কখনো। তবু পরকে আপন করার, অনাত্মীয় নিয়ে ঘর করার, নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার মতো মনের জোর ও স্বভাবের ঐশ্বর্য রয়েছে তার। সে জানে 'পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে।' সেজন্যেই হয়তো নতুনকে বরণ করার মানসিক প্রস্তুতি থাকে তার। তাই পুরুষের চোখে সে 'মহামায়া বামাজাতি মায়ার গঠন।' তবু অনাদর-অবহেলা ও পীড়নের ভয় থেকে যায় তার মনে। তাই সে স্বামী বা প্রেমিককে বলে :

সত্য তুহ্মি আহ্মা আগে কর মহামতি
আহ্মা ছাড়ি অন্যস্থানে না করিবা গতি।
তোহ্মা অধীন হৈলে না করিবা হেলা।...

শঙ্কাকাতর মা-ও কন্যা-সমর্পণকালে জামাতাকে বলে পাঠায় :

কহিও বুঝাইয়া মোর এহি নিবেদন
পালিতে অবলা বালা করিয়া যতন।
ক্ষেমিতে সদয় মনে তার যত দোষ
ধর্মেত পাইবা পুণ্য মোর পরিতোষ।

যোগ ও যোগীর প্রভাব

সাংখ্য ও যোগ অতি প্রাচীন অনার্য জীবনতত্ত্ব। ব্রাহ্মণ্যযুগে এ দুটো সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্বে উন্নীত হয়। এই তত্ত্বদুটোর প্রভাবে হিন্দুযুগে বাঙলার বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের যোগতান্ত্রিক বিকৃতি ঘটে। যোগীতান্ত্রিকের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে যায় এদেশে। বাঙালি মুসলমানের সুফিসাধনায়ও যোগের তথা দেহতত্ত্ব ও দেহসাধনের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। হিন্দুসমাজে একসময় বিবাগীমাত্রেই ছিল যোগী। তাই হাটে-বাটে ও ঘরে-ঘাটে সর্বত্রই দেখা যেত যোগী। এজন্যেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে বঙ্কিম-সাহিত্য অবধি সব গ্রন্থেই পাই যোগীর উল্লেখ। দোনাগাজীও প্রসঙ্গত উপমা দিয়েছেন যোগীর :

ক. কিবা যোগীবেশ ভ্রমি সকল সংসার।
খ. যোগ-কণ্ঠী লইয়া ভ্রমিব দেশে দেশে
বৃক্ষতলে নদীকূলে ব্রহ্মচারী বেশে।
গ. যোগীবেশে যোগিয়া বসন বিবর্জিত।
ভোজন শয়ন রতি বচন বর্জিত।
ঘ. যোগিয়া বসন ভূষণ তোহ্মার।

গৃহ, তৈজস, আসবাবপত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার

রাজা-বাদশার কাহিনীতে গরিবের কুটির, মধ্যবিত্তের ভবন ও ধনীর অট্টালিকার কথা মেলে না। এখানে রাজার টঙ্গী তথা প্রাসাদের ও তার আনুষঙ্গিক যোগ্য বস্তুসামগ্রীর বর্ণনা পাই। আর সেগুলো :

কাঞ্চনের গৃহ সব রত্তনের খাম
হীরামণি মাণিক্য লাগিছে ঠামে ঠাম।...
তাহাতে সুন্দর টঙ্গী রত্তন নির্মাণ।
রজতের কোঠা করিয়াছে চারিভিতে।

তৈজসপত্রও তাই মাটির হাড়া সরা নয় :

১. সুবর্ণের পাতিল সরা সুবর্ণের চুলা
সুবর্ণের কটোরা ঝারি সুবর্ণের থালা।
২. সুবর্ণের রত্নমণি রত্তনের থালা
রজত কাঞ্চন মণি খোড়া বাটি ভালা।

আসবাবপত্র : খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।

দোলনা : কাঞ্চনের ঢুলনি এক রতনে জড়িয়া
তাহাতে রাখিছে কন্যা বসনে বেড়িয়া।

বস্ত্র : ১. সুবর্ণে জড়িত চিত্র পট্ট বস্ত্র আর।
জরির ঝরোকা জড়ি বিচিত্র পাটের শাড়ী।
২. কাতিকশি জরকশি শাড়ী পাটাম্বর।
৩. পাগড়ী পটকা আর নিমা পায়জামা।

অলঙ্কার : ১. কর্ণবালি বনিতার দুই পাশে সাজে
ঢুলনি খেলায় কিবা মদন সমাজে।
ভুজ সুশোভন তার বলয়া সুবলিত
রত্তন আমারী এক জড়িত মণিহারা
চারিভিতে মুকুতা মাণিক্য দিয়া জোড়া।
অপ্সরা ধ্বনি করে কিঙ্কিণী নেপুর
২. অঙ্গদ বলয়া বাহু কঙ্কণ চরণ
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভএ মণিমএ।
৩. কানে বলি কর্ণফুল লোলক শ্রবণ মূল
সুবর্ণ পিপলিপাত দোলে
মুক্তা মণি চূণী জড়া অরুণ প্রভৃতি তারা...।
কপালে অলক টীকে বেশর বিরাজে নাকে....।
তেল'রী [ত্রিলহরী] হাঁসুলি হার সিঁথিপাত শোভাকার
তাড় বাজুবন্ধ করে অঙ্গদ বলয় ধরে
পৈঁচি কঙ্কণ শোভাকার
হীরা মণি হেমে জড়ি মদন মিশাই পড়ি
দিয়াছে বাহুটি বাহুতাড়
কনিষ্ঠ কানি অঙ্গুলে শ্রীঅঙ্গুরী শোভে ভালে
কটিতে কিঙ্কিণী ধ্বনি চরণে নেপুর শুনি
তোড়ল খারুয়া পাএ নখ মাখি আলতাএ
উঝটি বিঝটি পদাঙ্গুলে
মেলিয়া নালুয়া রয় চরণে শরণ লএ।

কাজল-সিন্দূর ও মেহদী-চন্দন

প্রসাধনসামগ্রী : ১. মেন্দি মাখা নখে যেন অরুণ শোভএ।
মুছিল কাজল রেখা সিন্দূরের ফোঁটা
ঠামে ঠামে লাগিছে অরুণ ঘনঘটা।

২. কর্পূর তাম্বুল পুষ্প দিল বিদ্যমান
কুঙ্কুম কস্তুরী আর চন্দন আগর
গোলাব আতর আর কাফুর কেশর।
আর যথ সুগন্ধি সকল রাজনীতি
আপনে কুমার অঙ্গে লাগায় নৃপতি।

৩. ললাটে সিন্দূর বিন্দু অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোঁটা তার কাছে
জলদ কাজল রেখা ভূরু ইন্দ্রধনু রেখা
সমযুক্ত বিরাজিয়া আছে।

বরের পোশাক : কৌতুকে কুমার সাজাইল পুরীমাঝ
বিচিত্র জরির বোঁটা হরিষ বসন
নানা পুষ্পে যেহেন পুষ্পিত পুষ্পবন।
মণি-মুতি জড়িত সুচারু কাবাই উত্তম
মণিরত্ন ঝলমল দীপ্তি মনোরম।
শুয়া সুরুয়াল ভাল মলমল খাস
ত্রিভুবনে যথা চিত্র যথেক চিত্রবাস।
পাগড়ী পেটিকা আর নিমা পায়জামা
সুবর্ণ ওড়নী সনে তাতে মনোরমা।
পুরুষের বিহিত যথেক অলঙ্কার
পরিধান করাইল সাজাই কুমার।

দান, যৌতুক ও উপহারসামগ্রী

উপহার ১. ভক্ষ্য ভোজ্য আসন বসন নানাবিধ
ভূষণ বাহন দিত নানা মূল্য নিধি।
২. রজত কাঞ্চন দান দিলা বহুতর
রত্ন দিয়া তুষি আদেশিলা শীঘ্রগতি।
৩. রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি লৈল অলঙ্কার।
সহস্রেক হস্তী ভরি বস্ত্র আভরণ
হীরা মণি মাণিক্য অমূল্য মূলধন।

উট বাজি গজ ধেনু রাজ ব্যবহার
খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।
তুরুকী এরাকী ছিল মিসির ফারসী
রুমী খোরাসানী তবে আর যথ দাসী।

উপঢৌকন

হস্তী ঘোড়া রত্নমণি রজত কাঞ্চন
শতেক তঙ্কার ছিল বহুল বসন।

যৌতুক :

মাতঙ্গ তুরঙ্গ উষ্ট্র বৃষ ধেনুগণ
মুকুতা প্রবাল মণি মাণিক্য রতন।
বসন ভূষণ বহু বস্ত্র অলঙ্কার
দাস দাসী বহুল কহিব কথ আর।
সপ্তশত হস্তী ভরি মাণিক্য রতন
পঞ্চশত উট ভরি আর যথ ধন।

বাদ্যযন্ত্র

১. ঢোল ধামা পিনাক সারিন্দা পাখোয়াজ।
২. পরা ভেরী মৃদঙ্গ ঝাঁজরা করতাল
দোহরি মোহরি দব ভেউর কর্ণাল।
সারিন্দা রবাব বেণু বীণা সিঙ্গা বাঁশী
ঢাক ঢোল কাড়া কবিলাস অভিলাষী।
কন্দিরা মন্দিরা ধারা ডম্বুর পিনাক
তাম্বুরা জঙ্গলা বাজে শঙ্খ শিঙ্গা ঢাক।
৩. দুমদুমি নাকাড়া, দমা নাঁনান বাজন
পাখোয়াজ সারিন্দা পিনাক কবিলাস
মঞ্জিলের বোলে সবে হইল উল্লাস।
শিঙ্গা বেণু বাঁশী আর সানাই কন্নাল
ডম্বুর তাম্বুরা আর ঝাঞ্জর করতাল।
বাণী দোনা শঙ্খ বাম্বি দোহরি মোহরি
ভূষঙ্গ মৃদঙ্গ কাঁস তবল ভাঙ্গরি।

যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্র

যুদ্ধবিদ্যা :

সর্বশাস্ত্রে কুমার হইল বিচক্ষণ
সর্ব অস্ত্র শিখিল লইল শরাসন।
গদাযুদ্ধে গদাধর হইল দুর্জয়
দ্বন্দ্ব মল্ল সমরেত হইল নির্ভয়।
খর্গযুদ্ধে মহাযোদ্ধা হৈল রাজসুত

অস্ত্রেশস্ত্রে বিশারদ হইল অদ্ভুত।

যুদ্ধাস্ত্র : শল্য, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, নারাচ, নালিকা, অসি, খঞ্জর, বিভিন্ন ধনুর্বাণ, অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, সিংহবাণ, গজবাণ, অর্ধচন্দ্রবাণ, মেঘবাণ ইত্যাদি।

যুদ্ধোপকরণ : অশ্ব, গজ, রথ ও বাদ্য।

আচার-সংস্কার-রীতিনীতি

ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণ এবং সামাজিক রীতিনীতি উৎসব-পার্বণ থেকে মানুষের জীবনযাত্রার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এসব সমাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মানের পরিমাপকও।

সংস্কৃতি : নাটগীতি কাব্যকলা নিত্য ঘরে ঘরে
কাব্যশাস্ত্র কৌতুকে বঞ্চএ রাত্রদিন।

আদর্শ সুখের জীবন : নাটগীতি প্রতিনিতি নিত্য কাব্যরস
কামকলা প্রতিনিত কেলিকলা রস
নানা শাস্ত্র শিক্ষা সব শাস্ত্র অবধান
রতিশাস্ত্র রতিপতি রতি বিদ্যমান।
রমণী বাঞ্ছিত চিত্ত কামোদ আমোদ।

প্রণাম : কদমবুসি ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল।

ক. পুনি পুনি ভূমিগতে করে দণ্ডবৎ।
খ. নামাজের অবশেষ হই দণ্ডবৎ।
গ. যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।
ঘ. ভক্তিভাবে চরণ বন্দিল ততক্ষণ।
ঙ. ভক্তিভাবে কুমার করিয়া দণ্ডবৎ
পাদুকা চুম্বিল তান হৈলা ভূমিগৎ।

মারোয়া নির্মাণ : করি 'দধি মঙ্গল' সুগন্ধি মাখি গাএ
সুবর্ণ শিরোপা মাথে সোয়ার চড়াএ।
সীতাপতি কদলী আনিয়া শুভক্ষণে
করিল আলাম খাড়া আনন্দিত মনে।
মারোয়া লেপিতে দিল যথ সোহাগিনী
করিল বিচিত্র সব পরীর রচনী।

ভরিল সুবর্ণ ঘট নৃপতি সকল
তৈল চড়াইল অঙ্গে মন কুতূহল।

আশীর্বাদ : কপালে চুম্বিয়া রাজা কৈল আশীর্বাদ।

তিথিলগ্ন :
১. মাহেন্দ্র সময় করি রাজার দুহিতা
যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।
২. শুভ লগ্ন নিয়া
দেব আরাধিয়া
গজপৃষ্ঠে তুলি দিল
৩. ইষ্টদেব স্মরি সবে নৌকা আরোহিয়া।

নীতিবোধ : পরদার ডরে রতি সিদ্ধি না হইল।

নজুম গণক-জ্যোতিষী :
১. রাজ্যের সর্বজ্ঞ ডাকি আনহ সাক্ষাৎ
সন্ততি আছে বা নাই দিবেক গণিয়া।
২. এথাএ দুইপাত্র যথ যোষী-বৈদ্য আনি
রাজার জনম পত্র চাহিলেক গণি।
৩. দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা তুরিত
বুলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচার
ভাল মন্দ মোর আগে কহিবা তাহার।

সংস্কার :
১. মোর যথ ধনজন রাজ্য অধিকার
নিছনি এই সকল হউক তাহার।
২. শুভকার্য মাঝ কান্দি নাহি কাজ
৩. রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি লৈল অলঙ্কার।
৪. এসব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।
অপদেব দৃষ্টি নহে নৃপতি নন্দন।
৫. দেবতা লক্ষিল কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী
অপদেব দৃষ্টি কিবা পরী অপ্সরী।

অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরের কর্মফল :
আছএ তোহ্মার কর্মে পুত্র বিচক্ষণ।

দরবারি সৌজন্য :
১. পত্র এক লিখি দূত পাঠাইয়া দিল
উপহার অমূল্য বহুল ধন দিয়া।

২. মিসিরের রাজার দূত আনি বিদ্যমান
বহু ধন দিয়া তারে করিল সম্মান।

৩ গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া চলে নরপতি
দুই হস্তে চতুর্ভিতে ছিটে গজ মোতি
লক্ষ লক্ষ ভরী সোনা নৃপতি নিছিয়া
যাচক উদ্দেশি ফেলে দূরেত ক্ষেপিয়া।

রাজকীয় নিশান : ধ্বজ ছত্র বৈরাগ নিশান রাজনীতি।

ক্রীড়া

নারিকেল খেলা — তুহ্মি মূর্খ অচতুর প্রেমে নাহি কাজ
নারিকেল খেল গিয়া গোঁয়ার সমাজ।

অন্যান্য খেলা : — শতরঞ্চ চৌঅর পাশা সারি সারি
দিবস গোঞাএ নানা রঙ্গ রস করি।

জলুয়া-গেরুয়া — জলুয়া খেলা গেরুয়া মেলে মনোহর আক্ষি
গেরুয়া জলুয়া আর খেলিল অঙ্গুরী।

বেশ্যাবৃত্তি

সেকালে বেশ্যাবৃত্তি এমন নিন্দনীয় ছিল না। তাই বেশ্যারাও ছিল না ঘৃণ্য। বস্তুত বেশ্যারাই ছিল নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পী এবং অভিনেত্রী। বেশ্যা-পোষণ ছিল আভিজাত্যের ও বিত্তবানতার লক্ষণ। সেজন্যেই গৌরব-গর্ব ও মর্যাদার অবলম্বন ছিল বেশ্যা-পোষণ। রাজকীয় দরবারি উৎসবেও তাই দেখতে পাই :

বেশ্যা সবে নৃত্য করে অতি সুললিত
রাজবেশ্যা নৃত্য করে অপরা বর্জিত।

এবং রাজকুমারের বিদেশযাত্রার সময়েও সঙ্গে নিয়েছিল বেশ্যা :

আলিম পণ্ডিত আর জ্যোতিষ গণক
নানা যন্ত্র রাজবেশ্যা গাহন নর্তক।

ধর্মাচার : উৎসব : পার্বণ

১. — দেবদ্বিজ আরাধি করএ দানধর্ম
কায়মনে পুত্র আশে করে এহি কর্ম।

২.ষষ্ঠি-পর্ব : — হইল ষষ্টম রাত্রি জনম অবধি

নাটগীত আনন্দ পূরিল রাজপুরী
বাজ্জএ উৎসব বাদ্য সর্বরাজ্য ভরি
রতন কাঞ্চন দান দিয়া মহারাজ
দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা তুরিত
বুলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচার
ভালমন্দ মোর আগে কহিবা তাহার।

৩. যজ্ঞ-পূজা : জ্ঞাতি অন্ন ভুঞ্জাইল দেব আচরণ
নানা দেব আবাহন কৈল আরাধন।
আগর চন্দন কাষ্ঠ আনল জ্বালিয়া
অবুর্দে অবুর্দে ঘৃত দিলেক ঢালিয়া।

৪. অতিথি সৎকার : লেখিল অতিথ পূজা সর্বশাস্ত্রে ধর্ম।
কথাত গৃহস্থ সেবা করএ অতিথ।...

৫. আচার (বর-কনে): কুমার মুণ্ডের জল কুমারীর শিরে
কৌতুকে ঢালিল সবে নীতি অনুসারে

৬. গ্রহশান্তি : গ্রহ শান্ত কর দান দিয়া বহুধন।
সর্বশাস্ত্রে শুনিয়াছি এমন বিহিত

দান : দানে বিঘ্ন দূর হএ কহিছে পণ্ডিত।

আতস-বাজি-পোড়ানো উৎসব

বাজির নাম : ভূমিচাম্পা সীতাহার বেঙ্গা মেড়া গজ আর
কাশ্মীর চাদর সারি সারি
অপরাজিত রাধাচক্র রাক্ষস দানব বক্র
রাজসব যত ফুলছরি
চতুর্ভুজ শাহভুজ কন্দিল নিন্দিল সূর্য
রোশন-মন্দির শাহজাল
হাউই রোসনতারা লক্ষ লক্ষ গোড়াহারা
সভামণ্ডলে শোভে ভাল।

অপদেবদৃষ্টি, দারু-টোনা ও চিকিৎসা

১. এ সব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।

২. নাড়ী পরীক্ষিতে সবে আরম্ভ করিল
ষট নাড়ী স্থান করি নাড়ী বিচারিল।

টোটকা ঔষধ : সব্য লভ্য বটিকা নাসার অধেঃ রাখি
ঘন ঘন ছিটএ সুগন্ধি গন্ধ মাখি।

টোনা : কেহ বোলে টোনা কৈল বুঝি এই দুষ্ট
কেহ বোলে মন্ত্র পড়ি করিলেক নষ্ট।

চিকিৎসা : কোনজন ধন্ধ হই ধরএ ধরণী
কেহ শিরে তৈল দিয়া কেহ দেয় পানি।

ফাগ ও কর্দম রঙ্গ

উৎসবের সময়ে আনন্দের আবেগ প্রকাশ করার জন্যে রঙখেলা তথা ফাগু খেলার রীতি সুপ্রাচীন। ফাগ বা রঙের অভাবে কাদা ছোড়াছুড়ির প্রথা প্রাচীনতর। গ্রামাঞ্চলে কাদা-মাখামাখি খেলা আজও বিরল নয়। হোলি তো আছেই।

১. পঙ্কজল আনি কেহ পঙ্ক লৈয়া হাতে
পঙ্ক মেলি মারে সব পঙ্কজ সভাতে।
২. সোহাগ কেশর চুয়া আগর আতর
একে রঙ্গে মেলি মারে আরের উপর।
৩. গোলাবের কেশর ঝারি সোহাগ মেলিয়া মারি
কেহ কার বসন তিতাএ।
৪. আবীর চন্দন চুয়া কস্তুরী আনিয়া
কেলি করে একে আনে অঙ্গেত মেলিয়া।

মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার

মুসলিম কবিগণ দেশীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কোনো অসুস্থ মন বা বিকৃত-বুদ্ধি তাঁদের বিচলিত করে নি। দেশান্তরে উদ্ভূত ধর্মের সবকিছু জানার বড় অন্তরায় ছিল ভাষা। তাই ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাদের সহজ অধিকার ছিল না। মুঘল আমলে ফারসির বহুল চর্চার ফলে এবং এদেশের উচ্চবিত্তের ও পদের ইরানি লোকের বহুলতার দরুন ইরানি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রভাব হয় ব্যাপক ও গভীর। আর ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে দরবারি ভাষার প্রতি প্রীতিবশে এদেশী মুসলমানেরাও ইরান ও ইরানি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নেয়। এদিকে স্বাভাবিক কারণেই এদেশের মাটির সন্তান এদেশের মাটির ও পরিবেশের ঋণ অস্বীকার করে নি। তাই দেশজ উপকরণই মুসলমানের রচনায় বেশি। তার সঙ্গে মিশেছে ইরানি ঐতিহ্য। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম

দেশ-ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। ইসলামপূর্ব যুগে এদেশের মানুষের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্যবাদ তাই দেশী ঐতিহ্য বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্যজীবন উদ্ভূত। প্রতিবেশী বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষবশে এ-যুগে দেশী ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার দুর্বুদ্ধি জেগেছে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মনে। কিন্তু যেহেতু জীবনই ভাষার জন্মদাতা, আবার ভাষার মাধ্যমেই জীবন অভিব্যক্তি পায় এবং আমাদের ভাষাটি দেশজ তথা বৌদ্ধ-ব্রাক্ষণ্য মানসপ্রসূত; সেহেতু এ ভাষা ত্যাগ না করলে এদেশী ঐতিহ্য পরিহার করার অপচেষ্টা বিড়ম্বিত হবেই। দেশী ঐতিহ্যের ও প্রতিবেশী বিধর্মীর ধর্মীয় ঐতিহ্যের আকস্মিক অভিন্নতায় গুরুত্ব না-দেয়াই সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক। ঐতিহ্যের ব্যবহার কবির বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য :

১. ইসুফ না হৈল তার রূপের সমান
কূপেত লুকাইল গিয়া পাই অপমান।
কিবা রূপ তাহার দেখিতে করি আশ
ইসুফ মিসিরে আসি হইছিল দাস।

২. বিরাজে অমৃত কূপ অধরের তলে
সহস্র ইসুফ পড়ি ভাসে তার জলে।

৩. ফতেমা আলির যেন ছিল রস রঙ্গ
রসুল বঞ্চিল যেন আয়েশার সঙ্গ।
ইব্রাহিম সায়েরা যেমন রসকলা
তেমন বঞ্চৌক রসে এহি বড় ভালা।

৪. ইসমাইল 'বলি'তে পলটি দিলা মেষ
সশরীরে ইদ্রিসকে নিলা স্বর্গ দেশ।
চতুর্থ আকাশ 'পরে আপেক্ষিলা ইসা
অলিদ দুর্বৃত্ত হাতেঁ পোষাইলা মুসা।
বিকলের কল তুক্ষি অকূলের কূল
ইব্রাহিম দাহ কৈলা শীতল বহুল।
খিজিরক জীবদান দিলা বারেবার
সাগরেত দিয়া ভাটা মুসা কৈলা পার।
বিষম তরঙ্গে কৈলা নুহর নিস্তার।
হেনমতে কর প্রভু মোর প্রতিকার।
কূপ হোন্তে ইসুফে বৈসাইলা আসনে
দাসত্ব হরিয়া রাজা কৈলা কৃপা মনে।
আয়ুবের উপশম কৈলা মহারোগ
দারা পুত্র হৈল দিলা সম্পদ বিভোগ।
ইউনুসকে উদ্ধারিলা মৎস্যোদর হতে
মোর অনুকূল প্রভু কর তেন মতে।

৫. জরথুস্ত্র শূন্য কাগজে মাখিয়া
রবির তনয় শুনি আছএ লিখিয়া।

হিন্দুপুরাণের ব্যবহার

১. বলি কর্ণে এমত না কৈলা কদাচন।
ধনঞ্জয় শরাঘাতে ধন প্রাণ দিল।

২. কল্পতরু তোহ্মার ধরুক সিদ্ধিফল।
হরএ মুনির মন করএ উদাস
যোগনষ্ট করএ তপস্যা করে নাশ।
কশ্যপ তনয় দোলে করি সূতমূল
ভুরু মদনের চাপ না ছাড়এ গুণ
পদতলে পদ্মরেখা লক্ষ্মীর লক্ষণ।
নর দেব গন্ধর্ব থাকএ রূপ হেরি।

৩. বাসুকী বাসরে কিংবা ভুজঙ্গিনী যাএ

৪. কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যেমত আছিল।

৫. রামরাবণের যেন আছিল সমর।

৬. পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুরগণ।

৭. কুম্ভকর্ণের দশগুণ শরীর তাহার।

৮. সীতা হেন একাকিনী কেন বনবাস

৯. ইন্দ্র যম বরুণ কুবের মহেশ্বর।

বিবিধ

১. রাজা-বাদশারা বিয়ে করতেন কনে নিজের বাড়ি এনে। তাই মিশররাজের বিয়ে হল তাঁর দেশেই।
ইয়মনরাজ তাই বলেন : 'কন্যা লই মিসির নগরে কর গতি।'

২. প্রত্যুৎগমনে অভ্যর্থনা : রাজকন্যা আগুবাড়ি আনিতে কারণ
চলৌক দেশের লোক আছে যত জন।

৩. বিবাহোৎসবে বাদ্য : বাদ্যভাণ্ড আনন্দ উচ্ছব নাটগীত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ মন রঙ্গে...
আকাশ পাতাল ব্যাপি হৈল বাদ্যধ্বনি।

৪. কয়েদির জীবন : বুলিল নিশাএ তারে হাতে দিব দড়ি
দিবসে কুটিব আটা কুটিব লাকড়ি।
অল্প যদি করে কর্ম মারিবা বিস্তর
মারিতে মারিতে যেন যাএ যমঘর।

৫. সুশাসন : বটের তস্কর যেন খাণ্ডের নাহি ভএ

কদাঞ্চিত আপদ স্বপনে না দেখএ।

৬. শপথ :

আহ্মার মাথাএ তুহ্মি জুড়ি দুই হাত।
শপথ করিয়া যাও আহ্মার সাক্ষাত।
ধর্মসাক্ষী ছলে যদি কহিএ বচন

৭. খাদ্য :

অন্নজল দধি দুগ্ধ দিল উপহার
ফলমূল শর্করা লাগিল খাইবার।

৮. তত্ত্বকথা :

চিত্তের নয়ানে জান দেখে যেইজন
সেই সে পরম তত্ত্ব গুরুর বচন।

৯. বাক্‌মাহাত্ম্য :

কহিতে লাগিল কন্যা শুন যুবরাজ
বচন সমান ধন নাহি তনু মাঝ।
তরুলতা পশুপক্ষী জীব সবে ধরে
মনুষ্য জীবনে সুখ বচনের তরে।
বৃষের জিহ্বাএ যদি বচন বসিত
মনুষ্য অন্যায় করি কেমনে চষিত।
না খায় কাহার অন্ন না পিন্দে বসন।
বাপ মাএ না বেচিল ধনের কারণ।
তরুলতা তৃণের থাকিত যদি বাক
কি মতে মনুষ্য সবে কাটিত তাহাক।
বচন কহিতে যদি থাকিত ভারতী
কেমতে খাইত নরে পশুপক্ষী জাতি।
কেমতে ধরিত মনে হীন জলচর।
তখনে যাইত ধাই নৃপতি গোচর।
মনুষ্য জিহ্বাএ যদি না হৈত বচন।
কেমনে হইত উক্তি মুক্তি বিরচন।
পণ্ডিতে কেমতে শাস্ত্র করিত প্রকট
কেমতে শিষ্যকে গুরু দেখাইত বাট।
জাতিকুল কেমতে হইত ভেদভিন...
না করিত কর্ম ক্রিয়া না অর্জিত শস্য
রাজা প্রজা না থাকিত না হৈত রাজস্ব।
না হৈত ন্যায়-অন্যায় না হৈত ভেদাভেদ...
পশুবৎ হৈত সব জ্ঞান পরিচ্ছেদ।
কুম্ভকার কারুকর্ম যদি না থাকিত
অবচনে কৃষি ক্ষেতি কেবা শিখাইত।
রজক নাপিত তন্ত্রী সব না থাকিত
যাবন্ত ব্যবসা ভাব কিছু না হইত।

না থাকিত গুণ জ্ঞানহীন হিত
পশুবৎ হইত লোক সর্ব বিবর্জিত।
বচন প্রভাবে হএ যাবন্ত বিচার
অন্ধকার ঘটে প্রাণ ধন্ধকার রূপে
দীপ্তিময় করিয়াছে বচনের দীপে।
সে বচন পরিষ্কার যে কহিতে জানে
জ্ঞানবন্ত হেন তারে লোক সব মানে।

বিদ্যাপরীক্ষা

সেকালে, মৌখিক প্রশ্নে লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যার পরীক্ষা হত। ভৌগোলিক, ধর্মীয়, তাত্ত্বিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করা হত। সে প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই হেঁয়ালির রূপ পেত। বিয়ের পাত্রকেও পরীক্ষা করা হত এভাবেই। এখানে সয়ফুল মুলুকের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করছে দানবরাজ :

প্রশ্ন — বোল দেখি কোন্ বস্তু নিকটে সবার?
উত্তর — মৃত্যু অতি নিকটে উত্তর দিল তার।
প্র. — পুণি বোলে কোন্ বস্তু বোলহ্ মঙ্গল?
উ. — কুমার উত্তর দিল, শরীরের কুশল।
প্র. — সজীবে বহুল কিবা মৃত অতিশয়?
উ. — কুমার বলিল, মৃত জানিঅ নিশ্চয়।
প্র. — নারী কি পুরুষ 'ধিক সংসারের মাঝে?
উ. — নারী 'ধিক উত্তর দিলেক রাজকুমার।

সহেলা : জলুয়া ও গেরুয়া খেলা

গাহএ রসের গীত যথ সোহাগিনী
রঙ্গের ধামালী সহেলা নাচনি
জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আঁখি
অপরূপ রূপ চাহি নাচে সব সখী।
নতুন যৌবন সব নব নব বালি
করতালি দিয়া নাচে হেলায় কাঁখালি।
ঠমকে নাচে ঠমকে গাএ ঠমকে বাড়াএ পাএ
ঠমকে হালিয়া পড়ি ঠমক করি গাএ।
রূপ চাহি গীত গাএ মধুর মধুর
পান খাইয়া উল্কা দিয়া লাগাএ সিন্দূর।
অমিয়া কৌতুক করি মিলি যথা আও (এয়ো)
সব সোহাগিনী মিলি জলুয়া খেলাও।...

অন্যান্য আচার

নিলেক আলাম (ছত্র-মারোয়া) তলে যুবক-যুবতী

নিবর্হিল কুলাচার সম্প্রদান নীতি।
গেরুয়া জলুয়া আর খেলিল অঙ্গুরী
তারপর— বিরল মন্দিরে লৈয়া গেল নব নারী।

কনে সাজ

সহেলা

ছন্দ : ত্রিপদী

অন্তস্পুর নারীগণ বার্তা পাই শুভক্ষণ
মঙ্গল করিল সুবচন
ঘৃতের দিউটি হাতে সুবর্ণ কলসী মাথে
নবীন রূপসী রামাগণ
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গীত গায় বসে
কেহ হাতে তালি মারে রঙ্গে
কার হাতে জল ঘটি কার অঙ্গে মারে ছিটি
কেহ ঠমকএ রঙ্গ ভঙ্গে।
কেহ পান গুয়া খাএ আনন্দে ধামালি গাএ
কৌতুকে খেলএ নানা কেলি
আড়েতে লুকাই পাশে কেহ কাকে পরিহাসে
ফেলাএ কাহার অঙ্গে ঠেলি।
আগর চন্দন চুয়া কর্পূর তাম্বুল গুয়া
কেহ কাকে হরিষে যোগাএ
গোলাবের কেশর ঝারি সোহাগ মেলিয়া মারি
কেহ কার বসন তিতাএ।
কেহ রঙ্গে জড়াজড়ি কেহ করে হুড়াহুড়ি
কেহ কাকে ফেলাএ ঠেলিয়া
কেহ ব্যগ্রগতি মতি অঙ্গ করে নানা ভাতি
রসরঙ্গ কৌতুকে ভুলিয়া।
কৌতুকে যতেক পরী সুবর্ণ কলসী ভরি
চলি যাএ লই অন্তস্পুরে
রাজকন্যা কোলে করি আনন্দে যতেক নারী
বাহির করিল ধীরে ধীরে।
সুবর্ণের পাটে রাখি অঙ্গেতে সুগন্ধি মাখি
আনন্দে গাহেন্ত সব গীত
কেহ করি পরিহাস খসাএ পিন্ধনবাস

কেহ নাচে হৈয়া আনন্দিত।
কেহ বোলে রূপ দেখি লক্ষিতে না পারে আঁখি
মোহিয়া পড়িল অচেতন
রবিশশী জিনি জুতি হেরিতে হরএ মতি
নিরক্ষিতে হরএ নয়ান।
যার রূপে মোহে নারী যেসব জাতিএ পরী
কি সহিব মানব পুরুষে
ইন্দ্র আদি দেব লোকে আরাধিল দেখি যাকে
সেজন ভজিল নর-রসে।
কিমত তপস্যা তার এমত ঘটএ যার
কি জানি করিল আরাধন

কনে স্নান :

যত সোহাগিনী করিয়া নানা কেলি
রাজসুতা করাইল স্নান।
কেহ লএ কেশ পানি কেহ বস্ত্র দেয় আনি
কেহ টানি নেয় বাজু ফিতা
কেহ ধরে বাহুলতা কেহ দেয় জানু হাতা
আনিয়া বসায় রাজসুতা।
মেন্দী দিয়া হাতে-পাএ সুগন্ধি মাখিয়া গাএ
পবিত্র বসনে মুছি অঙ্গ
যৌবন-যমুনা জলে লাবণ্য তরণী হেলে
বহি গেল আকুল তরঙ্গ।
কোন কোন সুবদনী বস্ত্র অলঙ্কার আনি
পৈরাএ আনন্দ কুতূহলে
কেহ বান্ধে কেশ ভার কেহ করে লই হার
আনন্দে তুলিয়া দেয় গলে।
ললাটে সিন্দূর বিন্দু অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোঁটা তার কাছে।

অলঙ্কার :

জলদ কাজল রেখা ভুরু ইন্দ্রধনু রেখা
সমযুক্ত বিরাজিয়া আছে।
কানে বালি কর্ণফুল লোলক শ্রবণ মূল
সুবর্ণ পিপলি পাত দোলে
মুক্তামণি চুনীজড়া অরুণ প্রভৃতি তারা
মুখ-শশী মুখে লইছে কোলে।
কপালে অলক টিকে বেশর বিরাজে নাকে
সারিসারি উড়ি পড়ে তারা
তেল'রী হাঁসুলি হার সিঁথিপাত শোভাকার
মণিমুক্তা জিনি মনোহরা।

তাড় বাজুবন্ধ করে অঙ্গদ বলয়া ধরে
পৈঁচি কঙ্কণ শোভাকার
হীরামণি হেমে জড়ি মদন মিশাএ গড়ি
দিয়াছে বাহুটি বাহুতাড়।
কনিষ্ঠ কাণি আঙ্গুলে শ্রীআঙ্গুরী শোভে ভালে
কাঞ্চন অঙ্গুরী তবে ধরে
অঙ্গুলে নখের সারি ঝর্ঝর অঙ্গুরী ধারী
বিদ্যুৎ দর্পণ শোভা করে।
কটিতে কিঙ্কিণী ধ্বনি চরণে নেপুর শুনি
রুনুঝুনু বাজে সুললিত
মোর মনে হেনএ লএ আনন্দমএ
আনন্দে গাহএ রসগীত।
তোড়ল খারুয়া পাএ নখে মাখিয়া আলতাএ
উঝটি বিঝটি পদাঙ্গুলে
মেলিয়া নালুয়া চয় চরণে শরণ লয়
রঙ্গেত মজিয়া অতি ভালে।
আর যত অলঙ্কার কে জানে নির্ণয় তার
রাজনীতি দেবের ভূষণ।
জরির ঝরোকা জড়ি বিচিত্র পাটের শাড়ি
উল্লাসে করএ পরিধান।
করিয়া কন্যার সাজ শীতল মন্দির মাঝ
হরিষে রাখে সবে নিয়া
কৌতুকে সকলে মিলি স্নান করাইতে বুলি
চলিল কুমাঁর উদ্দেশিয়া।

চ. লালমতি সয়ফুল মুলুক

আবদুল হাকিম বিরচিত

সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় কবি। নোয়াখালীর সুধারামে তাঁর নিবাস বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। ইউসুফ জোলেখা, লালমতি সয়ফুলমুলুক, শাহাবুদ্দিন নামা, নুরনামা প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। 'যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী' প্রভৃতি তাঁরই রচনা।

দানমাহাত্ম্য : দানধর্মে অবশ্য পুরএ মনস্কাম।

বহুধন দান শাহা করি পৃথিবীত
পুত্রহেতু প্রভু আগে মাগহ বাঞ্ছিত।

শাস্ত্র : তোমা আগে চতুর্দশ শাস্ত্র চারিবেদ
গোপনে আছএ যত ইতি ভেদাভেদ।

দানের পাত্র : ভিক্ষুক ভ্রমিক যথ রাজ্যের ভিখারী
মাতাপিতাহীন শিশু পতিহীন নারী।
পুত্রহীন বিধবা যতেক নারীগণ
দরিদ্র দুঃখিত ইষ্টমিত্র হীনবল।
আলেম ওলেমা যত দর্বেশ বৈরাগী
পুত্র পরিজন যেবা পালে ভিক্ষা মাগি
অন্নবস্ত্রে হীন যেবা হএ দেশান্তরী।

ভাগ্য গণনা ও কোষ্ঠী আদেশিলা আনিবারে নজ্জুম পণ্ডিত।
পরম যতনে দেখ শাস্ত্র জকি তাতে।
কোন রাশি হয় দেখ নক্ষত্র কাহাতে।
রাশি কাম গণি যেই বাণে ফলাফল
ভালমন্দ আয়ু যশ সফল কুশল।
বংশের প্রদীপ কিবা কুলের ধিক্কার
কহিবা রাশির মর্ম যেই ব্যবহার।

আচার : নিছনি : বহুধন দান কৈল কুমার নিছনি।
কুমারের অঙ্গে ঘষে কস্তুরী চন্দন
অষ্ট অঙ্গ পরিষ্কার ঝলকে রতন।
কুমারের অঙ্গের বদলে রত্ন ধন
অষ্টগুণ দান কৈল অতি রঙ্গ মন।

নিয়তি-মৃত্যু : যাহার নিবন্ধে যেবা আছএ লিখন।
ললাট লিখন ঘটে পূরিলে শমন
ঘরে কিবা বাহিরে হয় অবশ্য মরণ।
পৃথিবীতে আয়ু যশ রৈতে কদাচন
যদি সে সমুদ্রে পড়ে না হয় মরণ।

নৈতিকচেতনা : বাপ পিতামহ সবে সেবক তোমার
না যাব তোমাকে ছাড়ি অরণ্য মাঝার
খাইলে আমাকে ব্যাঘ্র ধরি খাউক আগে
একসর তোমা ছাড়ি যাইতে স্নেহ লাগে।

ইহাতু অধিক পাপ নাহি পৃথিবীতে
ঈশ্বরে সঙ্কটে ফেলি চিন্তে নিজ হিতে।

পুত্র : বহু দান ধ্যানে পুত্র পাইনু তোমারে।

বাহন : চতুর্দোলে তুলিয়া কুমারে আন হেথা।
গজের আম্বারি 'পরে হই আরোহণ।
গজের আম্বারী মাঝ, চলি যাএ যুবরাজ
নৃপতি চলিল চতুর্দোলে।
ডুলি আরোহণে চলে কোন নারীগণ।

বাদ্য : আদেশিলা নৃপতি উৎসব মঙ্গল
বাজায় নানান বাদ্য পরম উৎসব
ঢাক ঢোল কাড়া দামা পঞ্চশব্দের রব।
সানাই বিগুল ধ্বনি কাস-করতাল
বিগুল কর্ণাল বাজে উৎসব বিশাল।
মৃদঙ্গ বাদল আর কবিলাস চঙ্গ
ঝাঞ্জনের রুণুঝুণু শুনি মনোরঙ্গ।

যুদ্ধযাত্রায় রাজবেশ্যা চলিলেক সারি সারি
যত রাজবেশ্যা নারী
নৃত্যগীতি অতি মনোহর।
নানা বাদ্য বাজে ঘন
নাচএ নর্তকীগণ
সৈন্য চলে হরিষ অন্তর।

স্নানের উপকরণ সজ্জা কৈল নানাবিধ অগুরু চন্দন
কস্তুরী কুঙ্কুম আদি সুগন্ধি সকল
সাক্ষাতে রাখিল দিব্য ভৃঙ্গারের জল।
হাতেতে ফুলেল তৈল লইয়া জননী
স্নান করাইতে চাহে আপনা নন্দিনী।

নৈতিক চেতনা –
কন্যা ও নিজের বাম পাশে খড়্গ রাখি শাহার নন্দন
একই পালঙ্ক মাঝে করিল শয়ন।
পরনারী পরশনে তাতে পাপ অতি
আয়ু যশ বিনাশএ হয় অধোগতি।
আছুক শৃঙ্গার ভিন্ন নারীর সংহতি

ছুঁইলে হরএ আয়ু নরকেতে গতি।

পর্দাপ্রথা : না দেখে যাহার রূপ সূর নিশাপতি
সামান্য মনুষ্য দেখে কন্যার দুর্গতি।
... ঘর হতে বধূ মোর না যায় বাহির
চন্দ্র সূর্য ন দেখএ বধূর শরীর।
ভিন্ন জন সনে কভু না দেয় দরশন
অপরের সনে কভু না কহে বচন।

পাতিব্রত্য : সংসারে সম্পদ নাই পতি সমসর
ক্ষুধাপতি অন্নপতি তৃষ্ণাকুলে জল
আপদে সম্পদে পতি সঙ্কটে কুশল।
শয়নের শয্যাপতি জাড়ের ওড়ন।
পতি সে নারীর অঙ্গে পুরুষ আভরণ।

ফারসি ও হিন্দিকাব্যের প্রভাব :
জিনিল চন্দ্রাণী ময়না লোরের বণিতা।
জিনিল হোসেনবানু বাহরামের নারী।
ছবজাবাগে পরীজাত নৃপতি কুমারী।
নৌসদের প্রাণ ধনী মুখ পূর্ণ শশী
ষোড়শ কদলী জিনি মোচন্দর ধনী।
জিনিলেক ভানুমতী বিক্রমাদিত্য ধনী
জিনিলেক চিত্রলেখা কন্যা মধুমতী।

হিন্দুপুরাণ : শারদ কৃত্তিকা রমা দুহোঁ সমসর
রাধিকা সহিতে রঙ্গ করে যেন কানু
অনিরুদ্ধ সঙ্গেত যেন উদার বিহার
ময়নামতী সঙ্গে যেন লোরেন্দ্র কুমার
... ক্ষণে বলে যক্ষ সঙ্গে আইল পুরন্দর
দেব কি গন্ধর্ব তুমি কিবা বিদ্যাধর।
... কাম দৃষ্টে হরি সীতা লঙ্কার রাবণ
সবংশে বিনাশ হৈল পাপের কারণ।

সতীত্ব : অসতী না করে মোরে ত্রিজগদীশ্বর।
স্থাপিলাম তোমা (আল্লার) করে মোর এই অঙ্গ।
না হোক লণ্ডর হস্তে সত্য মোর ভঙ্গ।

বস্ত্র-অলঙ্কার : সে সবেরে পরাইল পাট পাটাম্বর

অষ্ঠ অঙ্গে কৈল হেম রজতে জড়িত।

অতিথি নিবাস-পান্থশালা :

অন্নশালা পাকশালা রচহ মণ্ডপ
আসিয়া রহিবে যত দেশান্তরী সব।
একশত কুম্ভ আর একশত ঝারি।
অন্ন ভুঞ্জিবারে জল করিবারে পান
বিদেশী ভ্রমিক সবে আসি এই স্থান।

মানৎ :

নিজহস্তে ভরি কুম্ভ রাখে সারি সারি
শতেক কলসী মুখে রাখে শত ঝারি।
তৃষ্ণাকুল গণে জল করিবারে পান
এই পুণ্যে পুরিবারে মানস কল্যাণ।
সেই স্থানে শীঘ্রে আসি মিলিবারে পতি
প্রভুপদে মাগে এই মনের আরতি।

বৃক্ষনাম :

ভাঙ্গএ সালের তরু গজালির গণ।

নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য :

যে সকল বলহীন অনাথ ভুবন
তাহার অন্যায় যদি করে দুষ্ট জন।
সাহায্য না হয় যদি দেখি বিদ্যমান
মহাপাপ হয় তার শাস্ত্রের বিধান।
... উপকারী জনের না কৈলে উপকার
ভুবনে বিফল ছার জীবন তাহার।

ফল :

সেই বৃন্দাবন মাঝে নানা ফল অনুপাম
আঞ্জির আঙুর সেব কিশমিশ বাদাম।
অমৃত খোরমা ইক্ষু পেপিতা কমলা
আনার আখরোট খিরণী চম্পাকলা।
গোলাব জামুন আব আনারস ফল
শ্রীফল, খরমুজা আতা নারিকেল।

এবং শ্যামতারা, শরিফা, গুয়া, আম, কামরাঙ্গা, পাবিয়া, বড়ল, কদলী, কনক, সাকরকন্দ, তোরঞ্জ।

ফুল :

নানা পুষ্প দেখিতে সুন্দর
জুঁই জাতী চাম্পা নাগেশ্বর

গোলতারা দাউদী সেওতী
শতবর্গ লবঙ্গ মালতী
গুলে লালা নাম চম্পা বেলী
গন্ধরাজ জুঁই সন্ধ্যা মালি
ওড়দানা কস্তুরী গোলাব
অপরূপ পুষ্প মাহাতাব
নাগেশ কুসুম্বর কুল
রায়হান শিরিশ চম্বুল
পারিজাত কদম্ব কেতকী
সবুজ আকন্দ সূর্যমুখী
আব্যাস ফেরক্ষ পুষ্প লবঙ্গ
দেখি অতি পুলকিত অঙ্গ
মালঞ্চ খরুচ মকমল
দেখিতে পরম কুতূহল
জাহাঙ্গি হাজারা বস্থল
গোল মিন্দী কদম্ব রসুল
অপরাজিতা জবা ও শিঙ্গাহার
বঙ্গ বালি মঞ্জিট কচনার
নীলকণ্ঠ মাধুরী গোলছুরি
কুরবি ডালিম্ব দোপহরি
অপরূপ কনক মঞ্জরী
পরম শোভিত মুক্তাছরি
ফলাগামী সৃত মনোহরা
অপরূপ কুসম্ব জাফরা
অংশুক কিংশুক মনোহর
ভূমিচম্পা চন্দ্রকেতু আর
পলাশ রঙ্গিমা শোভাকার।

রাজনীতি—

বিদেশী ভীতি : নৃপতির নিষেধ এথা বিদেশীর বাসা।

পুষ্পে-লিখন : কুমারে গাঁথএ পুষ্পতা অদ্ভুত লক্ষণ
বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি নন্দন।
মালিনী গাঁথএ পুষ্প একই প্রকার
সহস্রেক বর্ণে পুষ্প গাঁথএ কুমার।
পুষ্পের আখরে পত্র লেখে যুবরাজ

পক্ষী সম্বন্ধে জ্ঞান : বসন্ত সময় বিনা কোকিল তাপিত

তোমা বিনা তেহেন উদাস মোর চিত।
নিদাঘ গঞ্জিতে কোড়া যেন মনস্তাপ
তোমা বিনা মর্মে মোর তেহেন সন্তাপ।
শরৎ সময় বিনা যেন হুমাপক্ষী
তোমা অদর্শনে আমি তেন মনদুঃখী।
শিশিরের রীত বিনা যেহেন ডাহুক
তোমা বিনা তেহেন বিদরে মোর বুক।
হেমন্ত সময় বিনা যেহেন তিতির
তোমা বিনা তেন মর্ম দহে নিরন্তর।

দারু-টোনা : কুমারের পত্র নহে টোনা মন্ত্রবাণী
যারা মধু মন্ত্র হরে কুমারীর প্রাণি।
ডাকিনী যোগিনী জ্ঞান মনেতে তোমার।

নারীর আভরণ ও পোশাক :
কবরী বান্ধিল শিরে অপরূপ
নানা পুষ্প বিরাজিত অতি মনোহর
নাসিকাতে গজমোতি শোভএ বেশর।
কর্ণে শোভে দুলমণি করেত কঙ্কণ
বাহু যুগে বাজুবন্ধ ভুবন মোহন।
কটিতে কিঙ্কিণী শোভা মদন ঝঙ্কার
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর।
পরিধানে দিব্যবস্ত্র যেন পাটাম্বর
ললাটে সিন্দূর বিন্দু নয়নে অঞ্জন
হৃদেতে বান্ধিল যুগ সুবর্ণ চামিক
কাঁচুলি তুলিয়া দিল হৃদের উপর।

নারীর বিদ্যাচর্চা : নানা পাঠে রাজবালা অতীব পণ্ডিত।
সংস্কৃত ভাষে যত শাস্ত্রের বিধান।
কুমারী কহেন্ত বাক্য শাস্ত্রবিবরণ।

বিদ্যার মাহাত্ম্য শাস্ত্রেত পণ্ডিত যেবা জাতিকুলহীন
সভামধ্যে সে সবের প্রশংসা প্রধান।
কুলশীল জাতি যেবা মূর্খ মূঢ়জন
সে সকল নর হতে উত্তম গোধন।

স্বামীশাসন এবাক্য শুনিলে পতি রাখে কিবা কাটে
না জানি নির্বন্ধ মোর কি আছে ললাটে

কাব্যিক ঐতিহ্য	১. ইউসুফ রূপেতে মজি জোলেখা যুবতী বর্জিল আজিজ মন্ত্রী বিবাহিতা পতি। ২. যেহেন চন্দ্রানী বিভা করিল বামনে কাপুরুষ ছিল যেন দুর্জয় বামন চন্দ্রানী লভিল যেন লোরেন্দ্র নৃপতি।
নীতি :	যদি সে অযোগ্য হস্তে ঘটএ রতন অযোগ্য জনের বৃথা রত্ন প্রতি আশ যাহারে শোভয় রত্ন যায় তার পাশ।
অভিজ্ঞান :	যতেক চরিত্র তোমা পদ্মিনী কন্যার যদ্যপি পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় তথাপি পদ্মিনী কন্যা অসতী না হয়।
পতি-মাহাত্ম্য— পাতিব্রত্য :	দেবের ঈশ্বর কিবা হএ নরেশ্বর না লয় সতীর মনে পতি সমসর। অন্ধ বা রোগীত কিবা ভিক্ষুক ভিখারী না ছাড়ে আপন পতি যেবা সতী নারী।
রাজকীয় আড়ম্বর	যাহার সঙ্গতি চলে চতুরঙ্গ দল ঘোটকের পদ ভরে মহী টলমল। কোটি কোটি অশ্ব চলে লক্ষ লক্ষ গজ নব দণ্ড ছত্র শতে শতে চলে উড়ে ধ্বজ। যার সঙ্গে বাদ্য বাজে সমুদ্র হিল্লোল হাজারে হাজারে ডঙ্কার কাড়া ঢাকঢোল লক্ষ লক্ষ রণ শিঙ্গা ভেউর কর্ণাল শতে শতে উষ্ট্র যায় সঙ্গতি রাজার।
সম্মানার্থ প্রদক্ষিণ- প্রণাম :	গলেতে বসন বান্ধি মহারাজ সুতা দণ্ডবতে চন্দ্রমুখী কুমার চরণে সহস্র প্রণাম কৈল আনন্দিত মনে। কুমার অগ্রেত রামা পরম ভক্তে প্রদক্ষিণ কৈল সহস্রেক দণ্ডবতে।
বরের গুণ পরীক্ষা :	আছএ পরীক্ষা ছয় অতি বিলক্ষণ দ্বারে এক মহাকাষ্ঠ পর্বত আকার

রাখিয়াছে সহস্রেক মনের কুঠার
প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছে জনক আমার।
এক কোপে সেই কাষ্ঠে ফাড়ে যেই কুমার
রাখিয়াছে আর শস্য সহস্রেক মণ
ছিণ্ডিবেক শস্য সব জুড়িয়া ভুবন।
একত্র করিবে যেই নৃপতি নন্দন
মাপই দিবারে যদি পারে সেইজন।
সহস্র মণের অন্ন করিবে রন্ধন
একসর সেই অন্য করিবে ভোজন।
মহা এক অন্ন আছে উন্মত্ত লক্ষণ
নিকটে মনুষ্য গেলে ভৈক্ষে ততক্ষণ।
সে অশ্ব বান্ধিয়া নিজ হস্তে আপনার
আরোহিতে পারে যেই নৃপতি কুমার।
সঙ্কট না গুণি আরোহিয়া তুরঙ্গমে
দাপট করএ যেবা বিজলীর সমে।
গাভী এক রাখিয়াছে পর্বত আকার
নিঃসরে যথেক দুগ্ধ সংখ্যা নাহি তার।
আছুক দোহন দুগ্ধ সে গাভী সাক্ষাৎ
হেন শক্তি নাহি কার উকরে দিতে হাত
যদি সে প্রবৃত্ত হয় গাভী দুহিবার
শুকন না যায় দুগ্ধ বহে অনিবার।
সুরভী দুহিয়া দুগ্ধ বিদিতে রাজার।
খাইবারে পারে যেই নৃপতি কুমার।
আর বাক্য কহি প্রভু অধিক বিরূপ
সহস্র গজের দীর্ঘ আছে এক কূপ
অঘাত সহস্র গজ কূপ বিচক্ষণ
এহি কূপ ভরি যেবা দিতে পারে ধন।
এহি ছয় কর্ম যেবা করিবারে পারে
সেই বর স্থানে মোর বিবাহ দিবারে।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে নৃপ গুণবান।

গন্ধর্ব বিবাহ :

করহ গন্ধর্ব বিভা হরিষ অন্তর
গোপত প্রকারে মোকে লও প্রাণেশ্বর।
পরিয়া আপনা কোস পদে আপনার।
এহাতে কলঙ্ক কেবা ঘোষিবে তোমার।

নীতি :

গুপ্তকর্ম কুলক্ষণ অধৈর্য বিধর্ম।

সাহস ছাড়িলে হয় পুরুষ বিধর্ম।
ধৈর্য পরিহরি কর্ম কৈলে ধর্মনাশ।

খোয়াজ খিজির

সেকান্দর ইলিয়াস আমি (খোয়াজ) তিন ভাই
আমা তিন জন মাঝে ভিন্ন ভেদ নাই।
খোয়াজ খিজির পীর আইল শীঘ্রগতি।
সয়াল সংসার মাঝে যথা তথা যাই
মনে আশা তোমা পদ (খোয়াজের) আরাধিলে পাই
খোয়াজ ভরসা ভরে ত্বরিতে আপদ।
প্রভু সখা পয়গাম্বর তুমি পৃথিম্বীত।

হিন্দুপুরাণ :

হরধনু, রঘুপতি, গরুড় খাণ্ডববন ধনঞ্জয়,
দেওপরী যক্ষ যত গন্ধর্ব দানব বিদ্যাধর,
নিশাচর, ইলিয়াস আদেশএ গঙ্গাভাগিরথী।
কিচক, রাবণ, রাম, ভীম, মহিষাসুর, বালি

অনূঢ়া যুবতী :

যৌবন উন্মত্ত রীত বিবাহ হুতাশ
না চাহে প্রতিষ্ঠা নাহি গণে জাতিনাশ।
আত্ম প্রায় কিবা নাহি জানে বাপ মায়
কন্যা রাখিবারে যুক্ত নহে কদাচন।

তিকথা :

যার সনে বলে নাহি জিনি কদাচিত
বৈরীভাব তার সঙ্গে না হয় উচিত।

মাংসের ব্যঞ্জন :

উট-গাভী মৈষ মেড়া দুম্বা অজা খাসি
অন্নের সহিত মাংস রান্ধ রাশি রাশি।
গউজ গয়াল ষণ্ডা মৃগ কবুতর
খরগোস রাজহংস কুক্কুট কৈতর
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননী নানা উপহার।

নজর :

কুমার বুলিল অন্ত হন্ত সৈন্যগণ
না করিব তোমাদের সাক্ষাতে ভোজন।
তোমার দৃষ্টে অন্ন করিলে আহার
এহাতে উদর ভঙ্গ হইবে আমার।

নৃপযাত্রা :

সসৈন্য চলিল নৃপ দেখিবারে ধন
চলিলেক পাত্র মিত্র সৈন্য সেনাপতি
চতুরঙ্গ দল চলে সকৌতুক মতি।

সহস্রে সহস্রে চলে গজ পাটোয়ার
অনন্ত পদাতি কোটি কোটি অশ্ববার।
শতে শতে ঢাক ঢোল বাজায় তবল
সারি সারি দমা বাজে শুনি কৌতূহল।
ঘন পড়এ কাড়া শব্দ ভয়ঙ্কর
বাঁশরি মুররী বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁঝর।
শিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল বহুতর
সানাই বিগুল মধু শুনিতে সুস্বর।
নানা শব্দে বাদ্য ধ্বনি কাম করতাল।

রাজ-টঙ্গী : উদ্যানে নির্মাএ পুরী দিব্য মনোহর
নীলা কাঁসা জমরুদ আকিক প্রবাল
হীরা ও এয়াকুতে পুরী নির্মায় বিশাল।
সুবর্ণের চাল বেড়া দেখি অনুপাম
হীরামণি মাণিক্য দেখিএ ঠামেঠাম
অধিক প্রচণ্ড জ্যোতি করে ঝলমল
হীরা চূনী পান্না ইয়াকুত আর লাল।
স্ফটিকের স্তম্ভ ঘর মুকুতায় জড়িত
রতনের ঝরোকা সব দোলে চারিপাশে
অতি দীপ্তমান পুরী অন্ধকার নাশে।
রজত প্রাচীর শোভে কনক কাঙ্গুরা
জড়িত শোভয় চূনী মনোহর হীরা
ঝলকয় পুরী যেন হীরার দর্পণ।

উৎসব, নর্তকী : নাচএ নর্তকীসব হাজারে হাজার
বাজএ চৌরাশীবাদ্য উঠে নানা ধ্বনি।

রাজার পরেই বণিকের মর্যাদা :
কন্যা দানে সম্ভাষিত শাহার কুমার
সাধুর রমণীগণ আছে যত ইতি
আমন্ত্রিয়া পুরী মাঝে আন শীঘ্রগতি।
অন্তঃপুরে উৎসবের যে হয় উচিত
নারীগণ লই কর্ম করহ তুরিত।

বাদ্যযন্ত্র : কাড়া ডামা ঢোল ঢাক দ্বারে বাজে লাখে লাখ
শিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল
মৃদঙ্গ কর্তাল কাঁস বীণা বেণু কবিলাস
সহস্র যন্ত্রেত বাজে তাল

দোতারা রবাব বেণু   শুনি পুলকিত তনু
সানাই বিগুল সুললিত।
সারঙ্গী ডম্বরু চঙ্গ   শুনি অতি মনোরঙ্গ
সহস্র গায়ক গায় গীত
শতে শতে কান্ধে বেণু   ঝাঁঝরের রুনঝুনু
দোসরী মোহরী বহুতর।

গীতনৃত্য-উৎসব :   যতেক নাটুয়াগণে   রঙ্গ করে জনে জনে
নানান কৌতুক মনোহর
শতে শতে তাফানারী   যেন স্বর্গবিদ্যাধরী
নৃত্যগীত প্রতিস্থানে স্থান।

উৎসবের আচার— মারোয়া, আলাম :
সুবর্ণ কটোরা ভরি চন্দন ছিটায় চারিপাশ
আবীরে ভরিয়া বাটি   নৃত্য করে ছিটা ছিটি
নারীগণে করে হাস্যলাস
মারোয়ার চারিধার   অতিশয় শোভাকার
অপরূপ করিল আলাম
জয় জোকার করি   সুবর্ণের ঘট ভরি
নানা সাজ কৈল অনুপাম।
অতি মন কৌতূহলে   রাখিল মারোয়া তলে
এ ঘট প্রদীপ মনোহর
সাধুর রমণীগণে মহা   আনন্দিত মনে
নাচেন্ত গায়েন্ত নিরন্তর।

গায়ে হলুদ :   লালবানু পাটে তুলি   সকলেতে হলুস্থুলি
নারীগণ হলদী দিল গায়
দিব্য দিব্য নারীগণে   পরম আনন্দ মনে
গায় তৈল হরিদ্রা চড়ায়
কেহ মন কুতূহলে   হস্তপদ অঙ্গ মলে
কেহ ঢালে ভৃঙ্গারের জল
কোন কোন সাধু বালা   হস্তেতে বরণডালা
আগে কন্যা মন কুতুহল

স্নান :   এহি মতে নারীগণে   অতি সে আনন্দিত মনে
স্নান করাইল লালমতি।

কনেসজ্জা :   বহুমূল্য গজমোতি   বসন অঞ্চলে গুঁথি

কনকী নারী শোভে অতি
অতি দিব্য মনোহর   পরাইল পিতাম্বর
সিঁথাপাটি শিরেতে শোভএ
ঝারা ত্রিলোকের মূল   নাচয় জাদের ফুল
মদন মোহন   জ্যোতির্ময়।
বেসর নাসিকা মাঝ   ভুবন মোহন সাজ
দেখিতে পরম শোভাকার
শ্রবণেত পিনুতারা   অতিশয় মনোহরা
গলে শোভে নবলক্ষ হার
কেয়ুর কঙ্কণ করে   দেখি মুনি মন হরে
ত্রিলোক মোহিনী রাজসুতা
আভরণ শোভে অঙ্গ   দেখি মুনি তপ ভঙ্গ
অঙ্গে জড়ি কনক মুকুতা
আঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে   ব্রহ্মাআদি দেব লোভে
বাহুতে কনক বাজুবন্ধ
দেখি নানা আভরণ   যতেক রমণীগণ
কন্যা হেরে পরম আনন্দ
চরণ চম্পক মাঝ   শোভে অপরূপ সাজ
নেপুর মোহন বাদ্য ধ্বনি।

বরস্নান :

কস্তুরী কুঙ্কুম আদি অগুরু চন্দন
নানা দ্রব্য লেপি অঙ্গে করি আরম্ভণ
স্নান দান করাইল শাহার নন্দন।

বরসজ্জা :

সুবর্ণ সেহরা মাথে শোভিত বিশাল
পায়েতে পিন্ধিলা বহু মূল্য সরুয়াল।
জরকাসি কাবাই গায় অতি মনোহর
কোমরে কোমরবন্ধ কনক অম্বর।
বহুমূল্য অপরূপ দিব্য চারু চীর
দেবাচিনী রুমীবস্ত্র পূর্ণিয়া হরির।
কণ্ঠেত শোভএ অতি দিব্য পুষ্পমালা
অঙ্গেতে শোভএ নবলক্ষের দোশালা।
সুবর্ণ সেহরা শোভে আমামা উপর
হিন্দী রুমী সামী চীনী নসরানী বসন।
নানা বস্ত্র পরিধান অতি লাসময় রূপ।

বরযাত্রা :

নানা বাদ্য নিরন্তর নৃত্য করে নাটুয়া সুন্দর
স্থানে স্থানে তাফাগণে   নাচএ আনন্দ মনে

নানান কৌতুক মনোহর
... যুবরাজ মহামতি, চড়ে গজ আম্বারীর মাঝ
পাত্রমিত্র কুতূহলে জোগান ধরিয়া চলে
চতুর্দোলে প্রতি জনে জনে
নিশিথে চলিল বরে বাজি উড়ে থরে থরে
রজনী দিবস সমসর।

ফুল : কাশফুল, গন্ধরাজ, বেল মন্দিরা, নারঙ্গী ভূমিচম্পা, বেঙ্কা [বৃক্ষরাজি সীতাহার] ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত নামের ফুল।

বাজির নাম : মাহতাবি, জলহংস, পানিকাক, কন্দিল, পোলবন্দী, শুশুক, কুম্ভীর, দীপক, হাউই, ডেড়াঢুম ইত্যাদি।

বর-কনের মিলন : অন্তঃপুর মাঝ প্রবেশিলা যুবরাজ
মিলিলেক কন্যার সঙ্গতি
অতি মন কুতূহলে সুবর্ণ মারোয়া তলে
দাঁড়ায় কুমার লালমতী।

জুলুয়া : পাত্রের রমণীগণে অধিক আনন্দ মনে

গেরুয়াখেলা : জুলুয়া গায়েন্ত মনরঙ্গে
অতি মহামনসুখে সয়ফুলমুলুকে
গেরুয়া খেলএ কন্যা সঙ্গে।

নাস্তা ও খাদ্য : ফালুদা মিসরিক কন্দল বাণি শঙ্কর
প্রভৃতি এসব দ্রব্য মিষ্ট মনোহর।

কর্পূর তাম্বুল : কর্পূর তাম্বুল খায় অতি মনরঙ্গে।

গুরুজন : তৃতীয় জনক শাস্ত্রে আছএ লিখন
পিতা গুরু শ্বশুর যে এহি তিনজন।

নীতিকথা : সেবিতে বড়র পদ যদি মুণ্ড ক্ষয়
তথাপিহ সেবিবারে অতি যুক্ত হয়।
বড়র উচ্ছিষ্ট যুক্ত করিতে ভক্ষণ
নাহিক নিকৃষ্ট কান্ধে হৈতে আরোহণ।

সমাজে নারী :	নারীর অঙ্গ পুরুষের বিহারের স্থল পুরুষ ভ্রমর হয় নারী সে কমল। অলিহীন পুষ্প আমি বিরহে তাপিত।
শিকারযোগ্য পশু-পক্ষী :	ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার, পউজ, কুঙ্গর শিয়া গোস, খরগোস, গোরঘার, বিহঙ্গম, রাজহংস, ময়ূর ছবাস, কোলঙ্গ, গগন ভেড়, যৌঙ্গল, খগেশা খয়রাল, গ লগট, পতকা, আঞ্জন, মোগরী ছবারী, কোড়া, ডাহুক, হাঙ্গর।
পত্নীর দায়িত্ব :	চঞ্চল দুর্বাদী নারী পুরুষের বিষ। যে নারী রাখিতে নারে পতি কৌতূহলে সে নারী দহিবে প্রভু নরক অনলে। ...নিজনারী মুখ হেরি যদি হাসে পতি না হাসিলে শাস্ত্রে সেই নারী অধঃগতি। পতির দেখিল যদি মুখ বিকশিত যে না করে নিজ বদন হসিত। পরকালে নরকেতে অগ্নির দহন। পতির বিরস মুখ দেখিয়া নয়নে না জন্মে অধিক শোক যে নারীর মনে। পরকালে অনুদিন নরক গহ্বরে ডুবিয়া রহিবে নারী অনল উদরে।
বরকে যৌতুকদান :	ঘোড়া, হাতী, মণি, মুক্তা, উট, গাভী, মহিষ, দাস দাসী, রজত, কাঞ্চন, নৌকা, রথ, [এসঙ্গে পথের জন্য বহনযোগ্য] পালঙ্ক, চলনঘর, সুবর্ণ টুঙ্গী, বসন, অলঙ্কার।
নীতিকথা :	লোভেতে কালের বাসা জান তত্ত্বসার। পরধন পরনারী হরে যেই ছার শাস্ত্রেতে প্রভুর শত্রু সেই দুরাচার।
যুদ্ধাস্ত্র :	খড়গ, শিলা, গদা, গুর্জ।
কুটনী দূতী :	দূতী হই যদি নিজ ধর্ম কর নাশ হারাইবে দোহ কুল হইবে নিরাশ। পৃথিবীতে দূতীনারী বড় অপরাধী পর-ধর্ম নাশে আপে হই মিথ্যাবাদী।

বচনে চতুর দূতী জিনিয়া-পণ্ডিত
না রুচে দূতীর বাক্য সতীর বিদিত।

সতীত্বের বর্ম : যোদ্ধাগণ প্রতি যেন দিব্য তনুত্রাণ
সতীনারী প্রতি তেন ক্ষমা ধৈর্য জ্ঞান।
নারীগণ প্রতি পতিসেবা পুণ্য অতি
স্বামী বিনা নারী প্রতি আর নাই গতি।

সপত্নীবিদ্বেষ : সতিনী সহিতে বাদ নহে কদাচিত
নিজ পতি মর্মে সেহ হাসে প্রতিনিত।
...সে সকল নারী সত্য ইব্লিসের দাসী

তিথি-নক্ষত্র : মাহেন্দ্র ক্ষণেতে তোমা জন্ম ক্ষিতি মাঝ।

বিনয় শিষ্টাচার : কুমারকে পুনি পুনি প্রণমিয়া নৃপমণি
কহে গলে বান্ধিয়া বসন।
যুগল করিয়া কর নিবেদএ নৃপবর
সয়ফুল মুলুক চরণে।
...গলেত বসন বান্ধি কুমার সুমতি
পিতা পদে পড়ি কহে মধুর ভারতী।

বধূ ও শ্বশুর-শাশুড়ির মর্যাদা :
সহস্র দুহিতা নহে বধূর সমান
পরের ঘরের দীপ দুহিতা সকল
বধূমূলে নিজ গৃহ প্রচণ্ড উজ্জ্বল।
বৃদ্ধকালে পুত্রবধূ করএ পালন
মৃত্যু হৈলে পুত্র বধূ পরম যতনে
গুরু কৃত্য করে কায়-চিত্ত-মনে।
...দুধেত শর্করা যেন পুত্র সঙ্গে বধূ
উপজিলে পৌত্র যেন তাতে পড়ে মধু।

শাশুড়ি : পতি সে নারীর দেব ধর্ম যত ইতি
পতি বিনা নারী প্রতি অন্য নাহি গতি।
শাশুড়ী বিমুখে পতি সম্ভাষে অকাজ
মক্কাঘর পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নামাজ।
যতেক সেবএ পতি কায় চিত্ত মনে
শাশুড়ী সেবিতে যুক্ত তার চতুর্গুণে।

স্ত্রী আচার —

গর্ভকালে :	একই দিবসে দুই আচরিল স্নান দণ্ড দিন পক্ষ মাসে ক্রমে ক্রমে হয় এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাস মহাদান কৈল শাহা পুন্যের আরতি ষষ্ঠমাসে দান কৈল মনের বাঞ্ছাতে সপ্তমাসে সপ্তফল করাইল ভোজন অষ্টমাসে অষ্ট অঙ্গে লেপিল চন্দন। নবম মাসেতে রাজা নিয়োজিল ধাই দশমাস দশদিন হইল পূরণ শুভ লগ্নে জুমাবারে শিশু প্রসবন।
নবজাতক :	সুবর্ণ ক্ষুরেত ধাই নাভি ছেদ কৈল ক্ষৌর কর্ম ছেদ কর্ম সব নির্বাহিল।
নামকরণ :	এহিমতে পঞ্চদিন যদি নির্বাহিল কোরান পুরাণ দেখি নাম বিচারিল। গণক ব্রাহ্মণ আদি সৌভাগ্য সকল দোহান নক্ষত্র পাইল অধিক নির্মল। ...আলেম সকলে মিলিল চাহিল কোরান একে দুয়ে তিন বারে পাইল জিন আয়ান। জেবলমুলুক থুইল ছাওয়ালের নাম। তিনবার চাহিল ফলে মসহাফ খুলিয়া পাইলেক তিন হরফ-শুন মন দিয়া। কাফ, মিম, লাম এই তিন হর্ফ সার কামিল মুলুক নাম রাখিল কুমার।

যোষীগণ ভাগ্যগণনা করল :

	এত শুনি সকৌতুকে তুষি যোষিগণে ষষ্ঠী দিনে নামমাত্র যদি নির্বাহিল সহরিষে মহারাজ বহু দান কৈল। বিংশ এক দিন হবে জুমাহ বাসর উৎসবের হৈল লগ্ন শুন নরেশ্বর।
জলচর মৎস্য :	মকর কুম্ভীরে গিয়া চোট ভরি খাও কাতলা রোহিত বোয়াল জলচরগণ বাটা, মির্‌গা আদি যত না যায় গণন।
দেওপরীরাজ্য :	গোলেস্তাঁএরাম, কোহকাফ, রোকাম, শার্কিস্থান।

রূপকথার ব্যক্তিনাম : সয়ফুল মুলুক, শাহপরী, বদিউজ্জামান, মেহের জামাল, লালমতি, রোকবানু, জেবলমুলুক, কামিলমুলুক, সামারোখ, রৌশন জামাল, মিশরী জামাল, শাহবাল, সবজাপরী, লালপরী, আসমাপরী, শাহরুখ, এমরান, শাহ-সুফিয়ান, চন্দ্রভান, কায়রাপরী।

শহর :

একঅব্দ নবমাস নগরের চাক
স্থানে স্থানে সরোবর উষ্ণ মরূদ্যান
বড় বড় নদীনালা বড় বড় পোল
বড় বড় বৃক্ষ রহে বড় বড় ঘর
পাকা ইমারাত শিলা বজ্র সমসর।

রাজবাড়ি :

বড় বড় গৃহসব মাণিক্য গঠন
মুকুতার স্তম্ভ সব মাণিক্যের চাল
মনোহর দিব্য টাঙ্গি অধিক উজ্জ্বল
মাণিক্য দেউটি জ্বলে করে ঝলমল
সমস্ত নগর হয় একই বরণ।

ময়দানবের মতো লোকমান :

লোকমান গঠিয়াছে নানা রঙ্গারঙ্গী
মুকুতা প্রবাল হীরা উজ্জ্বল প্রাচীর।

ছ. জেবলমুলুক-শামারোখ

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর বিরচিত (খ্রিস্টাব্দ ১৬৭৩)

সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের সম্ভবত কুমিল্লা জেলায় জন্ম। মাত্র ষোলো বছর বয়সে কবি এ কাব্য রচনা করে অনন্যতা প্রদর্শন করেছেন। 'কলাঅব্দ বয়সেত রচিল কাহিনী।' রচনা (১৬৭৩ সনে রচিত) কালও আব্‌জদে উল্লেখ করা হয়েছে—'লিখন সমাপ্ত হইল কাকে ডিম্ব দিল **আরবা অনাছের** (আরবতুউনাশ্বীর) মধ্যে **ভাস্কর ভাসিল**' এ থেকে ১০৮৪ হি. তথা ১৬৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দ মেলে।

১. অলঙ্কারের বর্ণনা (কনে সজ্জা) :

সুবর্ণশোভিত চম্পাফুল।
শোভিছে কর্ণের পাঁতি, পুষ্পথোপা নানাজাতি,

কনকের ঝরকা বহুল ॥
কর্ণে শোভে কর্ণফুল,   হাতে শোভে ছাকি বৈলা,
তার, বাহু, বেশর শোভন ॥
সির খাড়ুয়া পাএ   অগুরু চন্দন গাএ,
ভ্রমর গুঞ্জরে চারি ধার।
কোমরে কিঙ্কিণী বান্ধা,   হৃদয়ে মাণিক্য ছান্ধা
গলে শোভে গজমোতি হার ॥
যথেক নৃপতি বালা,   সাজায়েন্ত রতিকলা,
গলে শোভে মণিরত্ন হার।
সুবর্ণের নত নাকে   মণি রত্ন শোভে চাকে,
নানা পুষ্প শোভএ অপার ॥
কেশেত পাটের খোপা,   গজ মুক্তা থোপা থোপা,
নানা মতে কেশ বিলাসন।
কটিতে কিঙ্কিণী দোলে,   পাএত পাঞ্জব বোলে,
চলনেতে করে ঝুন্ ঝুন্ ॥

নারীর নাচ-গান জলসা :

আইস সোহাগিনী সই,   মন রঙ্গে গীত গাই,
সেহেরা শোভিত শিরে লাল।
ঝলকে বাদলা তার,   ঠামে ঠামে মুক্তাহার,
হৃদএ কাঁচুলী ঝলমল।
কুচ মধ্যে শোভে পাট্টা,   ঝলকে বিজলী ছটা
কোর্‌তা কাবাই অঙ্গে বুটা শোভে নানা রঙ্গে,
আতর গোলাপ চন্দন
কন্যাকে পরাই সাড়ী   মুকুতা কাঞ্চন জড়ি
চূড়া বান্ধে জাদের থোপন ॥
পিন্দাই ভূষণ বেশ,   তুলিয়া বান্ধিল কেশ,
যেন চূড়া বান্ধিল কানাই
কি কব চূড়ার সাজ,   দিয়া পুষ্প গন্ধরাজ,
জার গন্ধে গুঞ্জরে ভ্রমাই ॥

বাদ্যযন্ত্র :

সুর ডঙ্কা বাজে স্তব্ধ হইল চারিভিত।
সুস্বরেত ভূমিকম্প হৈল আচম্বিত ॥
দোতারা, সেতারা বাজে মৃদঙ্গ, কাঁসর ॥
রামশিঙ্গা, নহবত বাজে হাজারে হাজার ॥
ঢাক, ঢোল, কাড়া, শিঙ্গা, কাংস, করতাল।
দোসরি মোহরি বাজে ভেউর কর্ণাল।

জ. জেবল মুলুক-শামারোখ
রফিউদ্দীন বিরচিত

ইনি কুমিল্লা জেলার কবি। সম্ভবত সতেরো শতকেই তাঁর আবির্ভাব ঘটে। ঐ জেলার সৈয়দ মুহম্মদ আকবরও একই বিষয়ে উপাখ্যান রচনা করেছেন। রফিউদ্দিনের জন্ম নারানঞা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আশরফ।

বর-বরণ :

সাজে জত সোহাগিনি, বরিতে কুমারমণি
পরিধানে নানা অলঙ্কার।
বসনে কুসুম রঙ্গ, সুগন্ধি চন্দন সঙ্গ,
হেলি টলি করন্ত বিহার॥
সমুখে প্রদীপ থুইয়া, ধান্য দূর্বা সাজাইয়া
বরিলেন্ত চামরি রাজন।

মারোয়া :

কুমারী বরিতে আনি, আগে দিল সোহাগিনী,
মারোয়ার পাশেত আনিয়া।
ঘৃতের দিঅটি ধরি জতেক জুবতী নারী
ধান্য দূর্বা দিল তুষ্ট হৈআ ॥
চারিগাছ রাম কলা, পুণ্য ঘট বসাইলা,
রাজা রতি তাতে বসাইল।
সহলা মঙ্গলা বলি, ঘোমটা বসন ভুলি
চন্দ্র সম মুখ দেখাইল ॥
গাড়ুআ লইয়া হাতে, মারেন্ত দোহান মাথে
আনন্দেত পুলকিত মন।
সখিগণ দূর্বা দিআ, রবি-শশী মিলাইআ
অন্তর হৈল সখীগণ ॥

অভ্যর্থনা বরণ :

ঘরে দ্বারে আইসে জদি চামরি ঈশ্বর।
ধান্য দূর্বা ঘট দিআ নিল অন্তপুর ॥

যাত্রার শুভ-নিদর্শন :

এরাকি তুরুকি নানা আর কত তাজি।
গজ অশ্বে আরোহিলা চলিলেক সাজি ॥
কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুই পাশে।
আম্র ডাল দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে ॥
সমুখে ধবল গাভী বাচ্চা দুধ খাএ।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ চলে বামে শিবা ধাএ ॥
দধির কলসী লইয়া গোপের রমণী।

	হরষিতে মহারাজ শুভযাত্রা জানি ॥
ভূত-দৃষ্টি :	ভূত প্রেত দৃষ্টি নাই শিশুর উপর। কেহ বোলে দেও দৃষ্টি কুমার উপর। কেহ বোলে হাওয়া বাতাস লাগিল কুমারে ॥
গণক জ্যোতিষ :	সহস্র সহস্র জ্যোষী আসিয়া মিলিল। শত জন বাছি রাখি সবে বিদাএ দিল ॥ রজনী প্রভাতে জ্যোষী গণিতে লাগিল। জয় জয় বলি খড়ি ভূমিতে পাতিল ॥ দৈবকে পাতিল খড়ি, আঁকিয়া মেদিনী জুড়ি, লগ্ন পাইল প্রথম জুম্মাবার।
শপথ-অঙ্গীকার :	এ বলিআ কুমার শামার হস্ত ধরি। সত্য কৈল দুই জন ধর্ম সাক্ষী করি ॥ সামারোখ হস্ত দিল কুমারের মাথে। সামারোখ মাথা দিল কুমারের হাতে ॥ যাহার কারণে তুমি আসিয়াছ এথা। মোরে জদি হও বাম খাও মোর মাথা ॥ পদাতি হইল বীর পিতা প্রণামিতে। দেখিআ চরণ ধরি পড়িল ভূমিতে ॥
কদমবুসি, পদধূলি :	শ্বশুর শাশুড়ী দেখি কন্যা তিনজন। মনোরঙ্গে ভক্তি ভাবে বন্দিল চরণ ॥
অন্নপ্রাশন :	পঞ্চমাসে করাইল ক্ষীর অন্ন পান।

প্রণয়োপাখ্যানাদি অন্যান্য গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

[১৮ শতক]

ক. গুলে বকাউলি
নওয়াজিস বিরচিত (১৮ শতক)

ইনিও আঠারো শতকের কবি। নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত 'সুখ ছড়ি' গাঁয়ে। তাঁর 'গুলে বকাউলি' ছাড়াও 'জোরওয়ার সিংহ প্রশস্তি' গীতাবলি, 'পাঠান প্রশংসা' প্রভৃতি রচনা রয়েছে।

শুভাশুভ :

পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাত।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে গুর্ণিত ॥
এই পঞ্চতিথি মধ্যে এমত বোলয়।
কৃষিবিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয় ॥
বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইব।
যাত্রা কৈল্যে সেই সমে সিদ্ধি না হইব ॥
ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর।
ধেনু বৎস পয়ঃ পিয় বৃষ গজ হয়।
পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উড়য় ॥
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত কাঞ্চন।
দ্বিজ-নৃপ গণকাদি সম্মুখে শোভন ॥
সদ্য মাংস দধি সুধা শুক ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত।

জন্মভূমির মাহাত্ম্য সম্পর্কে :

উত্তম জানিবা নিজ জন্মভূমি দেশ।
স্বজাতির মাঝে গতি হরিষ বিশেষ ॥

মন্ত্রের মাহাত্ম্য : শুদ্ধমন্ত্র হইলে সর্বত্রে হয় কার্য।
শুদ্ধ পাত্র হইলে রাজা রাখে নিজ রাজ্য।
মন্ত্র এক পরতেক পাপ লভ্য হয় ॥
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয়।
মন্ত্রে স্বর্গ মন্ত্রে নর্ক মন্ত্রে কার্য সার।
জানিয় এতিন মন্ত্র সংসার মাঝার ॥
হেন মন্ত্রশুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া।

—নওয়াজীস খান

১. এথেক ভাবিয়া মনে তাবিজ বানাইল।
তাবিজে ভরিয়া কুমার গলেত রাখিল ॥
নিশিথে নিকালি কুমার কেলি রস করি।
দিবসেত রাখে কুমার তাবিজেত ভরি ॥
এ বলিয়া কুমারীএ তাবিজ লিখিয়া।
কুমারের গলে তাবিজ দিলেক বান্ধিয়া ॥
সেই গুণে কুমার এক কুমারী যে হইল।
সুবর্ণের পিঞ্জরা ভরি টাঙ্গিয়া রাখিল ॥

—মুহম্মদ আলী

২. তবে কন্যা ভাবে মনে বুদ্ধি বিমষিয়া।
তিলিসমাত মন্ত্র এক পত্রেত লিখিয়া ॥
লেপটিয়া পাত্র গণে বান্ধিল তখন
শুক বর্ণ হইল পাত্র মন্ত্রের কারণ ॥
হেন মন্ত্রশুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া।
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া ॥
দিবসে মন্ত্রভাবে শুক বর্ণ হয়।
রাত্রেত মনুষ্য হই হরিষে ভুঞ্জয় ॥

—নওয়াজীস খান

৩. মহাগুণী পরী এক কবচ লিখিল।
বহরমে গলে দিয়া শুক বানাইল ॥
সুবর্ণ পিঁজরার মাঝে সে শুক বঞ্চএ।
কখন কখন আনি হৃদেতে রাখএ ॥
এইমতে দিবা মধ্যে বানাইয়া শুক।
রাত্রি হৈলে নানা কেলি ভুঞ্জএ কৌতুক।

—মুহম্মদ মুকীম

আজি সত্য হৈল যেই গণকে কহিল।
জ্যোতিষ গণন বাক্য হাতে হাতে হৈল ॥

পাথেয় : সপ্ত শত বহিত্র কইল পূর্ণ ধনে।
গিরি সম একশত হস্তী লৈল সনে।
পঞ্চশত এরাকী লইল অশ্ববর
স্বর্ণ বস্ত্র দ্রব্য অস্ত্র লৈল বহুতর ॥
সুবর্ণ মুকুতা লাল জড়িত রতন ॥
কুণ্ডল খাওরি সূর্মা অলঙ্কার জ্যোতি।
মলমল মসলন্দ বস্ত্র লাল সাল।

আপ্যায়ন : কর্পূর, তাম্বুল দিয়া সন্তোষ করিল ॥

প্রার্থনা ও মুসলিম পুরাণ :
আয় প্রভু মুই অনাথেরে কর পার।
জলেতে নূহরে যেন করিলা উদ্ধার ॥
কূপ হন্তে ইছপেরে যেন নিস্তারিলা।
মীনোদর হোন্তে যে ইউনুচ তরাইছ।
মুছাকে করিলা আজ্ঞা সমুদ্রে ত্বরিতে।
ইসা প্রতি নিস্তারিলা মাতৃ গর্ভ হস্তে ॥
আইউবকে ব্যাধি হন্তে কৈল্যা সুস্থদান।
ইব্রাহীম অগ্নি মধ্যে কৈল্যা পুষ্পোদ্যান ॥
যেন মোহাম্মদ রসুলকে জানি মিত।
হ্রদ হন্তে উদ্ধারিলা সিদ্দিক সহিত ॥
করজোড়ে নওয়াজিসে কহে প্রভু স্থান।
আদি অন্তে সেবকেরে করিবা কল্যাণ।

খাদ্য : ঘৃত সুধা শর্করাদি যথামৃত রীত।
আটা পিষ্ঠ তৌল মিষ্ট ফুল যদি পাই।
সকল একত্র করি ভোজনেত খাই ॥

উপমা : খোয়াজ প্রদীপ যেন সমুদ্রে ভাসায় ॥
বৈষ্ণব চরিত্র দেখি কহিতে লাগিল ॥
বোলে হেন রীত কেন হইল তোমার ॥

উদ্যান রচনা : নির্মিতে প্রাচীর উদ্যান বন মাতাইতে।
হেন কর বকাওলী উদ্যান স্বরূপ।
গোলাপ ঝরণা যেন আতরের কূপ ॥

আনাইল বহুমূল্য লাল বদখ্‌সান।
এমনি আকীক মুক্তা মণি মরকত আর।
জবরজঙ্গ এয়াকুত জ্যোতি আনিবার ॥
আর যত জ্যোতিমন্ত শিলা আনাইল।
সুবর্ণ মলম্বা হেতু পুঞ্জে পুঞ্জে থুইল।

জন্মোৎসব : দান : আজি শুভদিন পুত্র হইছে তোমার।
আমি সব দারিদ্র্য খণ্ডাও একবার ॥

সত্য : সত্য শাস্ত্র শিখিবারে হেতু গুরু শিষ্য।
সত্য ঘটে না থাকিলে না বলি মনুষ্য ॥

দেশাচার : সে দেশে নিয়ম এই বিভা হয় যদি।
জামাতাকে রাখে কন্যা গর্ভের অবধি ॥
নিজ দেশে যদি কন্যা হয় গর্ভবতী।
তবে যাইতে আজ্ঞা করে জামাতার প্রতি।

প্রেমতত্ত্ব : প্রেমভাবে নর কিবা নিরঞ্জন বশ।
প্রেমহীন লোকের দোহানে অপযশ ॥
প্রেমভাবে সংসার সৃজিল নিরঞ্জনে।
প্রেমেতে মহিমা পাইল অলি নবীগণে ॥

খাদ্য : মিশ্রি কন্দ ঘৃত দুগ্ধ সুধা শর্করা দধি।

মারোয়া : মণি মুক্তা সারি সারি গ্রন্থি চারিভিত।
অগণিত সামিয়ানা অষ্টদশ স্থান।
জড়িত পূর্ণিত জ্যোতি সবিতা সমান ॥
আবলুসের স্তম্ভ স্বর্ণ বস্ত্রের শুভিত।
রূপবতী পৃষ্ঠে যেন চিকুর লম্বিত।
খীমা সব জ্যোতিমন্ত্র জ্যোত শিলা হস্তে।

যুদ্ধযাত্রা : ছত্রিশ বরণ লোক করিয়া সঙ্গাতি।
যুদ্ধমূলে সসৈন্যে চলিল নরপতি ॥
শুদ্ধ বস্ত্র শুদ্ধ অস্ত্র ডান সৈন্যগণ।
বাম সৈন্য লৌহময় জড়িত পৈরণ ॥

প্রখ্যাত প্রেমিক : লাইলী পাইল জ্যোতি, মজনু আকুল গতি,
শিঁরি হস্তে ফরহাদ উদাস ॥

দমনেত নৃপমন   অতি প্রেম মোহিতন,
ভাবি চাহ এসব প্রকাশ ॥

বণিক : কহিলেক মোর পিতা মহা সাধু ছিল।
বাণিজ্যেত চতুর্দিকে পৃথিবী ফিরিল ॥

হার্মাদ : দৈবগতি বহিত্রেত হার্মাদ উঠিয়া।
লোক বধি ধন সব লৈ গেল লুটিয়া ॥

বর-সজ্জা : হরিরাদি কিনিকন,   মসর্জর সুবসন,
সকলে সাজায় কুমাররে।
পৈরাইল অলঙ্কার,   গলে মণি
স্বর্ণপুষ্প দিল শির 'পরে
হস্তে নবরত্ন দিল,   বাজুবন্ধ চড়াইল,
কোটি মণিমুক্তা সপ্ত লহর।
করাঙ্গুলে রত্নাঙ্গুরী   দর্পণ হস্তেত করি,
স্বর্ণ পাংখা লইয়া গোচর ॥

খাদ্যবস্তু : মস্ত্রী কন্দ দুগ্ধ ঘৃত,   তণ্ডুল সঙ্গমিশ্রিত,
সুধারস সুগন্ধি পূরণ।
দধি দুগ্ধ শর্কে ঘৃত,   মিশ্রি কন্দ সুধামৃত,
বাতাসা মণ্ডের বহুছন্দ।
নানারূপে পাকোয়ান,   নানান মধুর নান।
প্রচারিতে আমোদ সুগন্ধ ॥

দাম্পত্য : স্বামীর দোসর প্রভু মান্য করে নারী।
পুরুষে জানিব স্ত্রী প্রেমের ঈশ্বরী ॥
স্ত্রীকুল লজ্জাভাণ্ড জানিবা জগতে।
লজ্জা ভাণ্ডি জাত নষ্ট নহে যেন মতে ॥

কন্যা-স্নান : এ সকলে কন্যাকে আস্নান করাইল।
গোলাব আতর যে সুগন্ধি গায় দিল ॥
কোলে তুই লই   গেল সুবর্ণের ঘরে ॥

কন্যা-সজ্জা কন্যাকে সাজায় বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া ॥
প্রথমে কোড়াই কেশ দিয়া চতুর্সম।
বান্ধিল পাটের জাদে খোপা মনোরম ॥
তাহাতে মুকুতা ছড়া করিল শোভন।

চন্দ্রিমা উদিত যেন বিদারিয়া ঘন ॥
সিঁথিপাতি মধ্যেত সিন্দূর বিরাজিত।
যেন প্রকাশিত হৈল প্রভাত আদিত্য ॥
রত্নের টিকলি বিন্দু ললাটেত শোভা।
বালাচন্দ্রে পাইল কিবা পূর্ণচন্দ্র প্রভা ॥
রতনে মুকুতা জাল উপরে ঢাকিল।
যেহেন নক্ষত্র বৃষ্টি মেঘেত প্রকাশিল ॥
কপালে তিলক দিল সনেত্র বরণ।
হরেত সুধঙ্গে গ্রহি যেন ত্রিলোচন ॥
একস্থানে চন্দ্র তারা সবিতা সুরঙ্গে।
ব্যূহবান্ধী কৈল্য কিবা বিদ্যুতের সঙ্গে ॥
নাসিকায় বেশর দিল রত্ন শোভাকর।
হরি শিরচক্র যেন অরুণ প্রচার ॥
যুগল শ্রবণে দিল রত্নের কুণ্ডল।
অলকা ফণীর মুখে মাণিক্য উজ্জ্বল ॥
বাহুমধ্যে চড়াইল রত্ন বাজুবন্ধ।
সুবর্ণের তার যুগ শোভিত সুছন্দ ॥
করেত কঙ্কণ নবরত্নে শোভা করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী রত্ন অতি জ্যোতি ধরে ॥
গলে শোভা করিল সুবর্ণ তে-লহরে।
কণ্ঠমালা গন্ধমোতি মণি বহুতর।
কোমরে কিঙ্কিণী নবরত্নে সপ্তলহরী।
বাজরি শোভিত কটিঁ চতুর দিগ ভরি ॥
পায়েত ঘঙ্গুর দিল চলিতে বাজন।
সুবর্ণ মোকব দিল জড়িত রতন ॥
আঙ্গুলে নালিকা সাজে সুবর্ণ গঠিত।
সর্বঅঙ্গ অলঙ্কার অধিক শোভিত ॥
তাতে বহু মূল্য পাটাম্বর পরাইল।
কটি অলঙ্কার তুলি তার 'পরে দিল।
গলেত কাঞ্চুলি দিল সুবর্ণ জড়িত।
আকল ঘোঁঘট দিল শিরেত শোভিত ॥
তাহাতে তোরণ শোভে অমূল্য বসন।
হরিতাদি মসবস্ত্র কিবা কিংকন ॥
কিরমিজ বস্ত্র অতি মূল্য ধরে।
হরিষে কন্যারে পরাইল সআদরে ॥
আজ্ঞা পাই মাওলানায় নিকাহা পরাইল
শাদী মোবারক বলি সকলে ফুকিল ॥

দশটি চরিত্রদোষ :	কৃপণতা উচ্চবাক্য উচ্চ অহঙ্কার। নাবড়ানি প্রেম হানি কুবাদ বেভার। আত্ম উচ্চ পর নীচ অপকারী মনে। পরদ্রব্য দৃষ্টি করে সে সকল গণে। এ দশ চরিত্র জন্ম অশুদ্ধের গতি।
বর-কনের যাত্রালগ্ন	তবে কন্যা লই যাত্রা করিতে কুমার। শুভ যথ তিথি লগ্ন করিল সুসার। যোগ আর চন্দ্রিমা নক্ষত্র শুভালয় সকল বাহন তেজি সিংহের সময়। নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা সঞ্চরিত ক্ষিতি লগ্ন সমস্ত বুঝিয়া হিতাহিত। বার বেলা তেজি শুভ পাইয়া সকল যোগী নিজ কীর ক্ষেপ দিক সুমঙ্গল।
যাত্রার শুভাশুভ :	এবে কহিবারে বেলা বুঝ যেই মতে। সেই ক্ষণে কদাপি না যাও কার্য গতে। অর্কেত তপন দণ্ড পরে এক যাম। বার বেলা বুঝিয়া না কর কোন কাম ॥ সোমে চারি দণ্ড পরে চারি দণ্ড নষ্ট। নেত্র প্রহরের পাছে চারি ঘড়ি কষ্ট ॥ কুজে বিংশে দণ্ড পরে নষ্ট চারি ঘড়ি। দিন সে চারি দণ্ডে কার্যে না নিঃসরি। বুধে যাম পরে চারি দণ্ড মন্দ হয়। যোগ যাম পরে চতুর্দণ্ড ভাল নয় ॥ গুরু নেত্র প্রহরেত নষ্ট অষ্ট দণ্ড। শুক্রে যাম পরে যাম কার্যেত পাষণ্ড ॥ শনি আধে চারি মধ্যাহ্নেত চারি ঘড়ি' দিন শেষে চারি দণ্ড কার্য পরিহরি। বারবেলা বুঝিয়া চলিব বুধগণ। এবে কহি নন্দা ভদ্রা আদি লগ্ন সার। বুধজনে চলিব বুঝিয়া শুভ তার ॥ প্রদীপ ষষ্ঠএ একাদশী নন্দা নাম। অর্ক বাম পায় যদি না করিব কাম ॥ দ্বিতীয় দ্বাদশী সপ্ত ভদ্রা বলি যারে। কভু কর্ম না করি সোম শুক্রবারে ॥ ত্রিতিয়া ত্রয়োদশী আট তিথি জয়া যার।

শুভ কার্য না কর পাইলে বুধবার ॥
চতূর্থী নবমী চর্তুদশী রিক্ত তিথি।
গুরুবারে কার্য হেতু না বান্ধিবা মতি ॥
পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে পূর্ণতে ॥
এই পক্ষ তিথি মধ্যে এমত বোলয়।
কৃষি বিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয়।
সে-সমে সঙ্গমে গর্ভ হইবেক পাত।
বাণিজ্যেতে মূলে নষ্ট হইব তাহাত ॥
বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইবে।
যাত্রা কৈল্যে সেই সমে সিদ্ধি না পাইবে ॥
যেমতে পাইব সিদ্ধি কহি শুন সার।
হয় কি না হয় তাকে করিয় বিচার ॥
সোমে শুক্রে তিথি নন্দা কার্য কর ভাবি।
বুধে ভদ্রা শনি রিক্তা জয়া কুজা রবি ॥
গুরু পূর্ণা তিথি যদি কার্যগতে হয়।
এ সবেত শুভ সিদ্ধি জানিঅ নিশ্চয়
বিচারিয়া পঞ্চ তিথি চলিব সুজনে।
জ্যোতিষ ডাকিয়া কহে নোয়াজিসে হীনে।
এবে কহি শুভ ক্ষেণ যোগী যেবা হয়।
কোন কোন দিবসেত পৌছে সম হয় ॥
শুক্রে দুপ্রহর পরে অষ্ট ঘড়ি আছে।
সোম শনি অষ্ট ঘড়ি প্রহরেক পাছে।
গুরু রবি আড়াই প্রহর পরে অষ্ট।
আদ্যে বার ঘড়ি পরে অষ্ট শ্রেষ্ঠ।
অষ্ট ঘড়ি মঙ্গলে চতুর্থ ঘড়ি পরে।
শুভক্ষণ সপ্তদিন কার্য অনুসারে ॥
এবে কহি সপ্ত রাত্রি যেমন উচিত।
শুভক্ষণ হয় জান যেই মত রীত ॥
ভৌমে শনি রাত্রি আদ্যে পাইলেক চারি।
রবি রাত্রি এ দুই প্রহরে অষ্ট ঘড়ি।
সোম শুক্র বুধ নিশি প্রহর পশ্চাতে।
বসু বসু ঘড়ি শুভ আছয় তাহাতে ॥
গুরু রাত্রি দ্বাদশ ঘড়ির পরে আট।
এই শুভ হেরি সবে চলিবেক বাট ॥
শুভক্ষণে রাত্রি দিন যোগের সমএ।
পূর্ব শাস্ত্র মতে হীন নোয়াজিসে গাএ ॥

যোগিনী চাল :

এবে কহি শুন সবে যোগিনীর চাল।
যে বুঝিয়া বহে বাট হয় তার ভাল ॥
চন্দ্র গ্রহ ষষ্ঠ দশ চতুর্বিংশ দিনে।
যোগিনী নিবাস নিত্য বুঝ অগ্নিকোণে ॥
নেত্র রুদ্র অষ্টদশ হয় বিংশ দিনে।
চন্দ্রের এথেক দিনে যোগিনী দক্ষিণে ॥
যোগ দিগ পঞ্চবিংশ অহ সপ্তদশে।
যোগিনী নৈঋতে বইসে এথেক দিবসে ॥
বেদ সূর্য ঊনবিংশ সপ্তবিংশ জান।
যোগিনী বৈসয় নিত্য পশ্চিমের স্থান ॥
বাণ এয়োদশ বিংশ এথেক দিবসে।
যোগিনী আপনে যাই বায় বৈঞ বৈসে ॥
বসু পঞ্চদশ নেত্র বিংশ ত্রিশ দিনে।
উত্তরেত উত্তরএ যোগিনী আপনে ॥
ঋত চন্দ্র বিংশ অষ্ট বিংশ দিন এথ।
যোগিনী আপনে গিয়া রহে ঈশানেত ॥
সমুদ্র ভুবন যোগ বিংশ ঊনত্রিশে।
যোগিনী চন্দ্রের এথ দিনে পূর্বে বৈসে ॥
কহে নোয়াজিসে হীনে যোগিনীর চাল।
সেই দিনে সেই দিগে বুঝি চলে ভাল ॥
পান্থ হস্থা নক্ষত্র পঞ্চাঙ্গ সিদ্ধি বর।
ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর ॥
ধেনু বৎস প্রসবিলে বৃষ গজ হয়।
পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উদয় ॥
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত কাঞ্চন।
দ্বিজ নৃপ গণকাদি সমুখে শোভন ॥
মদ্য মাংস দধি সুধা সরু ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত ॥

গীত-বাদ্য-নাট্য :

নিত্য সভা পূর্ণ করি সেই ইন্দ্ররাজ।
গীত নাট বাদ্য বাজএ সেই সভা মাঝ ॥
মহারূপী কন্যাকুল নাটিকা সদায়।
অপরূপ নাট হেরি সভা মোহ পায় ॥
হাস্যরস রাজরস বাদ্য বাজে নিত।
পতি শব্দ শুনি স্তব্ধ সুস্বর সুগীত ॥
দোতরা সেতারা কাড়া কাস করতাল।
ঝাঞ্ঝরী মন্দিরা বাঁশী ভৈরব কর্ণাল ॥
আর বহু বাদ্য আদি মৃদঙ্গের সান।

বাজাইতে লাগিল সম্পূর্ণ পঞ্চতাল।
নাচিতে কুমারী অঙ্গ লহরী বিশাল ॥
সম্পুর্ণ করিল নাট শূন্যে করি কর।
উড়এ পতাকা যেন বিদুৎ লহর ॥

অলঙ্কার : চিকুর জলধ জিনি সিন্দূর তপন।
কস্তুরী সৌরভ তাহে করিছে মাজন ॥
বেলন পাটের জাদ চিকুরে বান্ধিছে।
তাহাতে মুকুতা ছড়া খোঁপায় বেড়িছে ॥
ভাল বালচন্দ্র 'পরে টিকলী শোভিত।
মেহেন্দী সঞ্জোগে নখে যেন চন্দ্র সুর।
তাহাতে নালিকা গোলক ঘুঙুর নূপুর ॥
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে বাজএ সঘন।
তে-লহরী মণিমুক্তা তাহাতে শোভন ॥
অষ্ট অঙ্গে অলঙ্কার করে শোভাকার
হরিদ্রাদি বস্ত্রকুল পৈরে অনিবার।

জাতিগত আচার : তবে কি উল্টো হয় জাতির সমাজ।
মুসলমান শূদ্র সঙ্গে হইবারে কাজ ॥
বহু গিয়া এড়িয়াছে শাহী বসন।
উদাসী ফকির বস্ত্র লইছে এখন।
হেন সাজি কন্যা চলে জগত মোহিত।
জলিখা চলিছে যেন-ইছুপ বিদিত ॥

মন্ত্র-গুণ : শুদ্ধ মন্ত্র হইলে সর্বত্র হয় কার্য।
মন্ত্র এক পরতেক পাপলভ্য হয়।
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয় ॥
মন্ত্রে স্বর্গ মন্ত্রে নর্ক মন্ত্রে কার্য সার।
জানিও এ তিন মন্ত্র সংসার মাঝার ॥

সৌজন্য ও সুব্যবহার : ভালমন্দ বিচার রাখএ যে সকল।
মিথ্যা বাদে লোক সঙ্গে না করে কন্দল ॥
ছোট বড় সঙ্গে বাক্য মধুরে কহিব।
আপ্ত পর সব সঙ্গে আদর রাখিব।
কিবা মাতা কিবা পিতা গুরুলোকরে মানিব।
অহঙ্কার দুর্বচন কাকে না কহিব।
হীন লোক দেখি কভু না কর বড়াই।
তার সম মহাপাপ আদি অন্তে নাই ॥

যে সকলে পুণ্য করে পাপ পরিহরি।
সে সকল ধন্য ধন্য ত্রিভুবন ভরি ॥
দানে দাতা ধন্য ধন্য সংসার পূরণ।
দান সম ধর্ম নাহি এ তিন ভুবন ॥

খ. গদা-মালিকা সম্বাদ

শেখ সাদী বিরচিত [মৎ-সম্পাদিত]

ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের আমলে (১০৯২-১১২২ ত্রিপুরাব্দে বা ১৬৮২-১৭১২ খ্রিস্টাব্দে) কবি শেখ সাদী তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে যুবরাজ চম্পক রায়ের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত শেখ সাদী চম্পক রায়ের কর্মচারীও ছিলেন। গ্রন্থে রচনাকালও রয়েছে।

পড়িয়া বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ।

১১২২ ত্রিপুরাব্দে বা ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত। এটিও অনুবাদমূলক বলে কবি দাবি করেন :

ফারসী বাঙ্গলা করি করিলুঁ রচন।

গ্রিক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সে-কালের গ্রন্থের গুরু-শিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সবরকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাংলা ভাষায়ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহ্‌র সওয়াল, মালিকার হাজার সওয়াল, গদা-মালিকা সম্বাদ, সিরাজ কুলুব, হরগৌরী সম্বাদ, তালিব নামা প্রভৃতি উক্ত রীতিতে লিখিত বাঙলা গ্রন্থ। এই বৈশিষ্ট্যে গুরুত্ব দিয়ে এগুলোকে 'সওয়াল সাহিত্য' নামে চিহ্নিত ও অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

একের অভিজ্ঞতাই অপরের কাছে জ্ঞান। কাজেই অভিজ্ঞতায় লভ্য জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার চিরকালই মন্থর। তা ছাড়া অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিকতায় জন্মায় পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞান। সব ক্ষেত্রে তেমন পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটে না। তাই আদিকালের মানুষের নানাবিষয়ক অনেক জ্ঞানই ছিল ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যোগ্যতা তখনো অর্জিত হয় নি। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যত প্রশ্ন মনে জেগেছে, তার বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রসূত উত্তর সন্ধান করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এমনি মনোময়

ধারণাভিত্তিক শাস্ত্র, জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষের জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা।

বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনের প্রতি সাধারণ মানুষ সাধারণত উদাসীন। তাই জ্ঞান, বিদ্যা ও ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ পরবুদ্ধিজীবী ও পরচিন্তানুসারী। তা ছাড়া, আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার ঘরোয়া ও সামাজিক সমর্থনে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্তরে উন্নীত হয়ে ধর্মশাস্ত্রীয় বিশ্বাসে পরিণতি পায়। এ কারণেই আজকের দিনেও মানুষ বিদ্যালব্ধ জ্ঞানকে অবহেলা করে এবং শাস্ত্রোক্ত সত্যকে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়। সুতরাং মানবসভ্যতার শৈশব-বাল্যের সেসব ধ্যান-ধারণা, জগৎ-চিন্তা ও জীবন-ভাবনা আজও পরচিন্তানুসারী উদাসীন মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যেসব রহস্য-জিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আবু . করেছে, সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতিজ্ঞানপ্রসূত উত্তর দানের চেষ্টা আছে 'সওয়াল সাহিত্যে'। যেহেতু জগৎ ও জীবনের উৎস ও আধার হচ্ছেন স্রষ্টা আল্লাহ, সেহেতু জ্ঞানও আল্লাহ-প্রোক্ত। রসুলের মাধ্যমে সে-জ্ঞান প্রচারিত-প্রচলিত হয় মর্ত্যে। তাই মুসলিমজীবনে হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি নবী-পরম্পরায় জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মুহম্মদ আকিলের মুসানামা, নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের মুসার সওয়াল, আব্দুল করিম খোন্দকারের হাজার মসায়েল, রজ্জাক-নন্দন আব্দুল হাকিমের সাহাবুদ্দীন নামা, শেখ চান্দের তালিব নামা, হর-গৌরী সম্বাদ ও শাহ্দৌলাপীর, মুহম্মদ খানের সত্য-কলিবিবাদ সম্বাদ, আলি রজার সিরাজকুলুব, এতিম আলমের আবদুল্লাহ্র হাজার সওয়াল, শেখ সাদীর গদা-মালিকা সম্বাদ, সেরবাজের মালিকার হাজার সওয়াল বা ফক্র নামা, সৈয়দ নূরুদ্দীনের মুসার সওয়াল, আদম ফকিরের জোহরার সওয়াল, মুহম্মদ খাতেরের সওয়াল ও জওয়াব প্রভৃতিতে মুখ্যত শাস্ত্রীয় জ্ঞানদানের চেষ্টা আছে। সে জ্ঞান কখনো শরিয়তি, কখনো-বা মারফতি কিন্তু সবক্ষেত্রে তা ধর্মশাস্ত্রানুগ নয়; লৌকিক বিশ্বাস ও শ্রুতি-স্মৃতি ভিত্তিক। লেখকদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, অধ্যাত্মতত্ত্বে আগ্রহ, পির-নির্ভরতা ও দেশগত লৌকিক সংস্কারের প্রভাবই এ বিকৃতির মুখ্য কারণ। তা ছাড়া মুমিনের কাছে কোরআন সব জ্ঞানের ও চিরন্তন তত্ত্বের উৎস ও আধার। এ বিশেষ তাৎপর্যেই হয়তো লেখকেরা সব বিষয়েই প্রায় নির্বিচারে কোরআনের, রসুলের ও আল্লাহর দোহাই ও বরাত দিয়েছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই না-জেনে দিয়েছেন, জেনে দিয়েছেন ক্বচিৎ। কাজেই তাঁদের পরিবেশিত সত্য ও শাস্ত্র, তথ্য ও তত্ত্ব তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা, তাঁদের লব্ধ জ্ঞান, তাঁদের অর্জিত ধারণাও তাঁদের কল্পনা ও জীবন-ভাবনার প্রসূন। সাধারণ সত্য কিংবা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক পরোক্ষ কিংবা অনির্ণীত। শাস্ত্রকথার ফাঁকে ফাঁকে অন্য জ্ঞানদানের চেষ্টাও আছে। কিছু ভৌগোলিক, কিছু পৌরাণিক, কিছু প্রাকৃতিক জ্ঞানদানের আয়োজন যেমন রয়েছে; ধাঁধা, হেঁয়ালির ব্যবস্থাও তেমনি বিরল নয়। বিদ্যা ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য অথবা রহস্যচিন্তা উদ্রিক্ত করবার জন্যই হয়তো এগুলো দেয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে ধাঁধা, হেঁয়ালির উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য।

মধ্যযুগের এইসব গ্রন্থের লেখকরা লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ-দৃষ্টিতে এঁদের সওয়াল-সাহিত্যকে **লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা** নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করত। –

এভাবে লব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যত্নবান হত। সেদিক দিয়ে এ-সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা এতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলেও, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছে, একটি স্থূল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতন-পথ রুদ্ধ রেখেছিল।

২

কবি শেখ সাদী রচিত 'গদা-মালিকা সম্বাদ'ও সওয়াল-সাহিত্য। অন্যান্য সওয়াল-সাহিত্যে মুসা ও আল্লাহ্, আলি ও রসুল মুহম্মদ, হর ও গৌরী, আবদুল্লাহ্ ও রসুল, শিষ্য ও পির প্রভৃতির কথোপকথনের মাধ্যমে গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়েছে। পাঠকের ও শ্রোতার কৌতূহল জাগাবার উদ্দেশ্যে শেখ সাদী ও কবি সেরবাজ স্বয়ম্বর-কামী বিদুষী রাজ্ঞী ও রাজকন্যা কর্তৃক বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে ভাবী বরের যোগ্যতা পরীক্ষাচ্ছলে প্রশ্নোত্তর পরিবেশন করেছেন। কবির উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তার প্রমাণ কবি শেখ সাদীর ও কবি সেরবাজের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আজও সুলভ। বোঝা যাচ্ছে রোমান্সসন্ধানী পাঠক-শ্রোতা পরম আগ্রহে উক্ত দুটো পুঁথি পড়েছেন ও শুনেছেন। রোমান্সের মোড়কে নীরস ধর্মকথা শোনানোর এই সদিচ্ছা একালের মিষ্টি ঔষধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্নোত্তরের কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। শাস্ত্রকথায় দলিল হিসেবে নিঃসঙ্কোচে কোরআনের আয়াতের দোহাই দেয়া হয়েছে, যদিও কোরআনে তা ক্বচিৎ মিলবে। দেশ-দুনিয়ার নানা কথাও প্রশ্নোত্তরে বিধৃত। আর প্রহেলিকাও বিরল নয় :

প্রশ্ন : কোথা হন্তে আসিয়াছ কহ তুমি সার?
কোন্ স্থানে থাক তুমি কহ মোর ঠাঁই?
উত্তর : পিতার ঔরস আর মাতৃগর্ভ হতে।
নানাস্থানে থাকি আমি স্থান স্থিতি নাই।

প্রশ্ন : কি খাও এবং কি পান কর?
উত্তর : খাই খাবেরের গম এবং 'গুলা পিই অবিরত'।

আল্লাহর উদ্ভব, রসুল-সৃষ্টি ও জগৎ-পত্তনের দীর্ঘ বর্ণনার পরে—
প্রশ্ন : তবে পুছে কথা হন্তে স্বর্গ-নরক সৃজন?
উত্তর : আল্লাহ্‌র গজব দৃষ্টে দোজখ হইছে
কোহ্‌তুরের দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।
(অন্যত্র : আল্লাহ্‌র গৌরব দৃষ্টে ভেহেস্ত মির্মিছে।)

প্রশ্ন : তবে পুছে রবি-শশী কা-হতে জন্মিল?
বীর্যের উৎপত্তি বোল কিরূপে হইল?
উত্তর : প্রভুর ধ্যান হইতে তারা (রবি-শশী) উপজিল।
নূরের যে অঙ্গ হতে (বীর্য) ফকির কহিল।

তারপর, দিন-রজনী, সুমেরু-কুমেরু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত।

প্রশ্ন : আব আতস খাক বাত কিরূপে হইছে?
উত্তর : নুরের অঙ্গের ঘর্মে প্রভুএ সৃজিছে।

রিজিক ও দৌলত : পূর্বদিক হন্তে জান রিজিক আইসএ।
পশ্চিমদিক হন্তে দৌলত জানিও নিশ্চএ।

দেহের হাড়ের ও রগের সংখ্যা :
গদা বোলে তিনশত ষাটখান জান।
তিনশত ষাট 'রগ' জানিও নিশ্চএ।

মালিকা এবার প্রহেলিকার আশ্রয়ে প্রশ্ন করল :
তবে আর এক কথা পুছে মালিকাএ
এক বৃক্ষের বার ডাল আছএ নিশ্চএ।
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত
বেশ কম নাহি জান সমসর তাত।
সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সফেদ আকার
এক পৃষ্ঠে 'ছেহা' রঙ্গ শুন কহি সার।
এক এক পত্র মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।

উত্তর হচ্ছে : বৃক্ষ হল বৎসর, ডাল হল মাস, পাতা হল দিন,
পাতার সাদা-কালো, রঙ হল দিবা-রাত্রি এবং পঞ্চফুল হচ্ছে
দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ নবী বাদশাহ্ও ছিলেন?
উত্তর : ইউসুফ, সোলেমান, জুলকর্ণ ও মুহম্মদ—এই চার জন।

প্রশ্ন : চিরজীবী কারা?
উত্তর : ঈসা আর ইলিয়াস, আলি আজগর (ইদ্রিস),
খিজির পয়গাম্বর— এই জান চার।

এদের মধ্যে ঈসা ও ইদ্রিস যথাক্রমে আকাশে ও স্বর্গে বাস করেন, খিজির জলে এবং ইলিয়াস স্থলে বিচরণশীল।

পেচক দানা-পানি খায় না, তার কারণ : গুন্দম ভক্ষণ করেই আদম স্বর্গভ্রষ্ট হন এবং নুহ্নবী প্লাবনে কষ্ট পেয়েছিলেন। পেচক 'আপনার রক্ত আপে ভক্ষিএ সদাএ' বেঁচে থাকে।

শরীরে বিভিন্ন রাশির সংস্থিতি সম্বন্ধেও 'কোরান আয়াত পাড়ি ফকিব কহিল।'—

যেমন : অজুদ আসমানে জান সিংহরাশি রএ

কন্যারাশি গর্দানেত ফকিরে বোলএ।
মেষ জানুতে থাকে বৃষ পদমূলে
মিথুন পদ্ম মূলে রহে কহিল সকলে।

আবার শরীরে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পবন প্রভৃতির অবস্থান-তত্ত্বও বর্ণিত হয়েছে :

চন্দ্র উলিয়াছে জান দীলের অন্তর
নক্ষত্র রহিছে জান কলিজা উপর।
অরুণ উদিত জান কোমর মধ্যত
মগজ হন্তে উথলিয়া বসন্তের বায়
মানুষের নাভিমূলে রহন্ত সদায়।

আল্লাহ্ এই সৃষ্টিরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কাজেই—

অদ্বৈততত্ত্ব : শশীরূপ ধরি তবে করএ পসর।
রবিরূপে তাপ দিয়া চৌদিগে ব্যাপিত
শীতলরূপে রহিয়াছে জলের সহিত।
তেজরূপে রহিয়াছে অনল মাঝারে
শীতল সুগন্ধিরূপে পবন সঞ্চার।
অলিরূপ ধরি চরে পুষ্পের মাঝার
মোহাম্মদ নবী জান নিজ অবতার।
আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শূন্যাকার
নানারূপে কেলি করে হৈয়া অবতার।

প্রশ্ন : হিন্দুয়ানী কিরূপে হৈল কহ শুনি?
উত্তর : পুরাণ-কোরান দুই শাস্ত্র যে সৃজিল
হিন্দু-মুসলমান দুই পরিচিহ্ন কৈল।
পূর্বে পুরাণ শাস্ত্র আছিলেক শুদ্ধ।
অখনে ইব্লিসে পাইয়া করিছে অশুদ্ধ।

হিন্দুর উদ্ভব অনাদি থেকে। অনাদির সন্তান পিশাচ, দেও, পরি প্রভৃতি এবং অনাদি মুখ-নিসৃত হচ্ছেন ব্রহ্মা। তাঁর চারিমুখ চতুর্ভুজ পরম সুন্দর ইব্লিসের খপ্পরে পড়ে হিন্দুরা নানা মিথ্যাচার বরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

শবেমেরাজ কালে নবী মুহম্মদ আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আল্লাহ্র অবয়ব :

পুরাণ পুরুষ অতি নবীন সুরত।
মনুষ্য শরীর নহে নাহি রূপ রেখা
নয়ান গোচরে নবী দেখিল প্রত্যেক।
দুইদিকে উত্তাল কুন্তল জলাকার
নির্লক্ষ্য নিরূপ অতি পরম সুন্দর।

প্রশ্ন : এ সপ্ত জমিন রৈছে কাহার উপর?

উত্তর : মৎস্যের উপরে ক্ষিতি বহে মহাভার
জলমধ্যে সেই মৎস্য ভাসএ অপার।
মৎস্যের শিরের 'পরে গোশৃঙ্গ আকার
গোশৃঙ্গ উপরে রহে হুকুমে আল্লাহ্‌র।

গর্ভের শিশুর উদ্ভব ও দেহগঠনতত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্‌র হুকুমে মিকাইল ফিরিস্তা বৃষ্টিবর্ষণ করেন। মিকাইল—

এক এক স্থানে তবে ধূম্র আকার।
মণে মণে পানি মাপি দেয়ন্ত সবার।

তারপর, জলের গুরুজ ঝামা কান্ধেত করিয়া
সকল ফিরিস্তা মিলি ফিরএ ভ্রমিয়া
একেক গুরুজ মারে একেক যে স্থানে
সেই সে গুরুজ সব ঠাঠা বিজুলির
গুরুজের ঘাতে হএ সহস্রেক চির।
তবেত শাণিত হএ মেঘের সাজন
বরিখএ জলধারা করিয়া গর্জন।

প্রশ্ন : দুনিয়া পত্তন কাহাত, কাহাত নিমজ্জন?
উত্তর : গদা কহে খোয়াজের হতে উৎপন
আখেরে খোয়াজের হাতে হৈব নিমজ্জন!

প্রশ্ন : সপ্ত আসমান হৈছে এ সপ্ত জমিন
কা হতে প্রচার হৈছে কহত সুজন?
উত্তর : গদা কহে মোহাম্মদ হতে সর্বকথা
প্রচার হৈছে আকাশ-ভুবনের কথা।

রুহ ও আত্মা পাঁচ প্রকার : হায়ওয়ানী, রহমানী, সোবহানী, সুলতানী ও হাবিলি।
উস্তাদ-মাহাত্ম্য : উস্তাদ অন্ধের আক্ষি শুন নরগণ।
প্রশ্ন : আল্লাহ্‌র শের, নবীর শের বোলএ কাহারে?
উত্তর : আল্লাহর শের জান আলিম-খলিফা,
রসুলের শের জান মোহাম্মদ হানিফা।

নামাজ-রোজা-এল্‌ম হচ্ছে যথাক্রমে স্তম্ভ. বেড়া ও চাল :
নামাজ দীনের 'ঠুনি' বোলএ ফকিরে।
রোজা দীনের টাটি জানিও নিশ্চএ
এলেম দীনের ছানি ফকিরে যে কএ।
প্রশ্ন : দুনিয়াতে মানুষ ছোট, ধনী-নির্ধন হয় কেন? অল্পায়ুই-বা হয়

কেন?

উত্তর : আল্লাহ্ মানুষের রুহ বা আত্মা সৃষ্টি করে স্তূপাকার করে মজুদ রেখেছেন। সেগুলো 'তপজপ করে নিত্য' এবং 'অবিরত ভাবে প্রভু একমন চিত্ত।' এবং এই তপস্যার পুণ্যানুসারেই অর্থাৎ—

যেবা যত তপ কৈল তার তত পদ
দুনিয়াত আসি পাএ এ সুখ সম্পদ।

আর— যে সকল বালক মরএ পৃথিম্বিত
সে সকল মানুষ্য নহে জানিও নিশ্চিত।

—তারা ফিরিস্তা, এবং

দুনিয়া দেখিতে তারা আসিয়া থাকএ।
যতদিনের আউ-বাউ লৈয়া আইসএ
ততদিন বাদে পুনি মউত যে হএ।

কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তামাক সেবন :

গদা কহে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।
অন্ন হতে তামাকু জানিব বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ-বালকের রহিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে
হাঁটিতে চলিতে লোকে পিব পথে পথে।
পিতায় তামাকু পিতে পুত্রে করে আশ
তামাকুতু করিবেক ভুবন বিনাশ।

কবি আফজাল আলিও তাঁর 'নসিহত নামায়' তামাকের নিন্দা করেছেন এবং তেরোশ হিজরি সনের অর্থাৎ আখেরি জামানার লক্ষণ বলে জেনেছেন। এ ছাড়া 'হুক্কা পুরাণ' (সাহিত্যবিশারদ) এবং 'তামাকু পুরাণ' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 'পুরাতনী'—নলিনী নাথ দাশগুপ্ত) গ্রন্থ রচিত হয়েছে দেখতে পাই।

কলিযুগের অন্যান্য লক্ষণ :

ক. লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার
বে-ইমান হৈব লোক সংসার মাঝার।

খ. নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ না থাকিব
পুরুষে নারীর কথা ধরিয়া চলিব।
পুরুষের কথা কভু নারী না ধরিব।

গ. বাপে পুতে দ্বন্দ্ব করিব প্রতিদিন—

ঘ. সোয়ামীর সহিতে নারীর না রৈব পিরীত। ইত্যাদি—

ঙ. অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
চোর উজ্জ্বল হৈব সাধু হৈব মলিন। ইত্যাদি।

চ. বিঘৎ-প্রমাণ জান নর সব হৈব।

কেয়ামতের সময় : চল্লিশ দিবস জান আখেরের সমএ
বরিখিব মুষলধারা জানিও নিশ্চএ।

তারপর হাসরে ভেহেস্তের হুরেরা এগিয়ে এসে পুণ্যবানদের অভ্যর্থনা করে নেবে—
কেহ নানা যন্ত্রবাদ্য বাজাইব আনন্দে
মঙ্গল গাহিব কেহ মিলিব সানন্দে।

আলিমের মর্যাদা : আলিম দেখিয়া যেবা সালাম না করএ
ভিহিস্ত না পাইব সে আখের সমএ।
আলিমেব সনে যেবা করএ বড়াই
সত্য সত্য হইব তার দোজখেতে ঠাঁই।

নরকযন্ত্রণা, পাপীর শাস্তি ও ভিহিস্তের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্‌র হুকুম-যে রদ হবে না—পরিবর্তন হবে না তার প্রতীকী ইঙ্গিত :
ততক্ষণে এক অজা আল্লা-আজ্ঞাএ আনি
সেইক্ষণে ফিরিস্তাএ করিবা কোরবানী।

গদা-মালিকার বিয়ের সময় :
নানা বাদ্য ধ্বনি আছিল বাজিতে
মেঘের গর্জন সম ভয় লাগে চিতে।

বাদ্যও বিচিত্র :
ঢাক-ঢোল, নাকাড়া, দামামা, বিউগুল, সানাই, কন্নাল-ভেউর, রামশিঙ্গা, ডম্বুর, ঝাঞ্ঝারী, মৃদঙ্গ, তাম্বুরা, মুরলী, কবিলাস, দোতারা, মোরচঙ্গ, মন্দিরা, সারিন্দা প্রভৃতি। এসঙ্গে—

চলিতে চলিতে কেহ গাএ নানা গীত
বাজিকর নাটুয়া যাএ সকলে মিলিয়া।

গজারোহণে গদা বিয়ে করতে গেল, মহাধুমধামে মহোৎসব হল। যথারীতি মারোয়া তৈরি হল, জুলুয়া দেয়া হল এবং বর-কনে গেরোয়াও খেলল। মধুর দাম্পত্য এভাবেই হল শুরু।

গ. গোপীচাঁদের সন্ন্যাস

শুকুর মাহমুদ বিরচিত (১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত)

কবি আবদুস শুকুর মাহমুদ রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে স্থিত 'সিন্দুর কুসুম' গাঁয়ের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শেখ আনোয়ার ফকির। কবি ১১১২ বঙ্গাব্দে তথা ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ কাব্যে যোগতত্ত্বের সঙ্গে অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পার্বণিক আচার-আচরণের এবং রীতি-পদ্ধতির কথাও রয়েছে।

ষষ্ঠীপূজা ও কোষ্ঠী : ছএদিনে করাইল ছাইলার ষষ্ঠীর বার।
পণ্ডিত লেখিল কোষ্ঠী করিয়া বিচার ॥
পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোসাঞি।
পুরাণ বিচারিয়া লেখে কোষ্ঠীর প্রমাঞি ॥

নামকরণ অনুষ্ঠান : ধন মাল গাভী দান অতি দান অন্ন।
একত্রিশ দিবসে করে বালকের নামকরণ ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত আর পুরোহিত।
নিয়ন্ত্রণ করিল মুনি সকলের পুরিত ॥

অন্নপ্রাশন : পঞ্চমাসের বালক হইল যখন।
মানিকচন্দ্র করে পুত্রের অন্নপ্রাশন ॥

বাল্যবিবাহ : যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর।
বিবাহ করাতে চিন্তা করে রাজ্যেশ্বর ॥

উত্তরবঙ্গে বিবাহে পাতিল-ডুবানো অনুষ্ঠান :
শুভলগ্ন করিয়া পাতিল ডুবাইল ॥
হরিদেব করিল এথা মঙ্গলাচরণ ॥

বিয়ের বাজনা : ঢাক ঢোল বাজে আর ধাঙসা নাকাড়া।

দক্ষিণী জোড়খাই বাজে কাড়া টিকারা।
রণশিঙ্গা ভেউর বাজে হইয়া এক সঙ্গ।
মৃকুল সহরে হইল বিভার বাদ্যের রঙ্গ ॥
খোল মৃদঙ্গ বাজে নারদী মন্দিরা।
মোহন মুরারী বাজে সারিন্দা দোতারা ॥
রবাব পিনাক বাজে মুচঙ্গ তম্বুরা।
বাঁশী মনোহর বাজে মোওয়ারি ঝুঞ্জুরা।

বিয়ের সজ্জা : চারি দিকে চারি সারি কদলী রুপিল ॥
আলিপন রেখ দিল দেখিতে শোভিত।
নৃত্য করে নর্তকী গাইনে গাএ গীত ॥

বরস্নান : সুগন্ধ চন্দন দিয়া স্নান করাইল ॥
রাজবস্ত্র অলঙ্কার অঙ্গে পরাইল।
সুবর্ণ দোলাএ রাজাক তুলিয়া লইল ॥

যৌতুক : যৌতুকে করিল দান রজত কাঞ্চন ॥
শ্বেত নেত বস্ত্র দিল আর জামা জোড়া।
চড়িয়া বেড়াইতে দিল তাজি নামে ঘোড়া ॥
জল পথের দিল মান্য নৌকা জলকর।
যাহার উপরে আছে সুবর্ণের ঘর ॥

গুরু আপ্যায়ন : গলাএ বসন দিয়া চরণ বন্দিল ॥
বসিতে আনিঞা দিল যোগের আসন।
ভিঙ্গারের পানি দিয়া ধোয়াল চরণ ॥
চরণেতে জল দিয়া আসনে বসিল।
চরণ বন্দিয়া মুনি সাক্ষাতে বসিল।

যোগীর বেশ : কপাটি পরিয়া সিদ্ধা কমর বান্ধিল।
রুদ্রাক্ষের মালা তবে গলাতে তুলি দিল ॥
কপালে পরিল রক্ত চন্দনের ফোঁটা
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল গলে যোগ পাটা ॥

বামা বর্জিত যৌগিক সাধনা :
স্ত্রী লইয়া [যেবা] করে সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ॥
রাজ্য করে গুপীচন্দ্র লইয়া চারি নারী।
কিমত প্রকারে তাহাক জ্ঞান দিতে পারি ॥

নারী পুরী ছাড়ি যদি হএ দেশান্তর।
সেবক করিয়া তখন করিব অমর ॥
গলা ক্ষেতা পরাইব দ্বাদশ দিব হাতে।
মস্তক মুড়াইয়া দাঁড়াইবে রাজপথে ॥
মুখেত ভস্ম মাখি যুগী হইয়া যাএ।
তক্ষনি করিব সেবক কহিলাম নিশ্চএ ॥

পুরুষ বিনাশক রতি ও নারী :

হাটের নারী ঘাটের নারী নারী প্রতি ঘরে।
যত পুরুষ দেখ সবে নারীর বেরণ করে ॥
সহস্র ফোঁটা রজে হএ রতি মহারস।
সে ধন ফুরাইলে পুরুষ হএ নারীর বশ ॥
সিংহের আকার নারী ব্যাঘ্রের মত চাএ।
হাড় মাংস শরীরে থুইয়া মহারস টানি লএ ॥
পুরুষ ধন লৈয়া নারী বেপার করে।
লোভেতে থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মরে

বর্ণ-বিদ্বেষ :

যেই মাত্র শুনিল গুপী হাড়িপার নাম।
কর্ণে হাত দিয়া রাজা বলে রাম রাম ॥
হাড়িপার কথা শুনি কান্দিতে লাগিল।
মুখের তাম্বুল রাজা তখনে ফেলিল ॥
গুপীচন্দ্র বলে মাএ গেল জাতি কুল।
হাড়ির সেবক হব আর নাহি মূল ॥
মালী তেলী আছে কত কায়স্থ্ কুমার।
বৈদ্য গোওয়াল আছে মাও নাপিত কামার ॥
ব্রাহ্মণ সুজন আছে সবার প্রধান।
এসব থাকিতে আমি লবো হাড়ির জ্ঞান ॥

যোগীর খাদ্য :

আতপ চাউলের অন্ন থালেতে ভরিনু।
বার বছরকার শুকুতা নিম তাতে মিশাইনু ॥
সিদ্ধা মহন্ত যোগী পান নাহি খাএ।
পানের বদলে তারা হরিতকী চাবাএ ॥

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব :

এহিত সংসারের মধ্যে আছে যত লোক।
কোন পুরুষ হইয়াছে নারীর সেবক ॥
জন্মিলে মরণ আছে সর্ব শাস্ত্রে কএ।
আমি হইব স্ত্রীর সেবক মরণের ভএ ॥
তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে যদি মরি।

তবুত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি ॥

দেহতত্ত্ব : শুন বাছা গুপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইন শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি ॥
খাকের খুঁটি নৌকার টাটী আবের গড়া।
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া ॥
অসারেরে সার করি কেন রহিলি ভুলি
মরিলে খাইবে মাংস শকুন শৃগালী ॥
কাক কাণ্ডারী নাএর শকুন ভাণ্ডারী।
শৃগালে বলেন আমি নাএর অধিকারী ॥
দুইখানি চৌউর নাএর বৈঠা দুইখানি।
ভমরা সাক্ষাতে বৈসে আছে নৌকার দেয়ালি ॥
পাঁচ পণ্ডিত লৈয়া মনুরাই বৈসে হৃদয়ে।
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয় ॥
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাএ অন্যঘাটে।
বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরঞ্জনের ঘাটে।

পাশাখেলা : চারি রানী খেলে পাশা হরষিত হৈয়া।

কেশবিন্যাস : চিরুনি লইয়া করে ধরিয়া মাথার 'পরে
চিরে কেশ করিয়া যতন।
গাঁথিলেক মাথার বেণী যেন হইল নাগের ফণী ॥
মঞ্জুর বান্ধিলৈক খোঁপা
তাতে কদম্ব ফুল আগর কস্তুরী তুল
জাদ দিল মাণিকের ঝাঁপা।

অলঙ্কার : বাহে তার 'পরে বাজুবন্ধ।
বাজু পরিল যাত তাহা আর কব কত
তাহাতে দিব্য পুষ্প মকরন্দ ॥
নগরি পঁউছি সাজে শঙ্খ কঙ্কণ বাজে
অঙ্গুলে পরিল অঙ্গুরী
পরিল লক্ষের সাড়ী বসন্ত কুসুম্ব বেড়ি।
যেন দেখি চন্দ্রের পুতলি
চুলটি উছটি যত বাঁক পাতা মল কত
পাএ পরে সুবর্ণ পাশলী ॥

প্রসাধনসামগ্রী : আগর চন্দন চূয়া মুকতা কস্তুরী।
সুবেশ করিয়া [অঙ্গে] পরে চারি নারী ॥

আতর গোলাপে অঙ্গ করিল ভূষিত।

অষ্ট অলঙ্কার : অষ্ট অলঙ্কার নহে যে পেটারী ভরিব।

ভণ্ডযোগী : তোমার বাপের যুগী সদাএ জাএ শুঁড়ি পাড়া।
মদ খায়া নিন পাড়ে শুঁড়ির দামড়া ॥
মদ খায়া মত্ত হএ নাহি জানে জ্ঞান।
নাহি সেবে গুরুর পদ না [হি] করে ধ্যান ॥

ছদ্মযোগী : স্ত্রী সঙ্গে করি যদি হইবে সন্ন্যাসী।
সর্বলোক কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী ॥
নারী সঙ্গে করি যে জন যুগী হয়া যাএ।
মাগুয়া যুগী করি তাকে সর্ব লোকে কএ ॥

পান-সুপারি : অখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান।

অন্নব্যঞ্জন : একভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্ধিল তুরিতে ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্ধে নানান প্রকার।

সিদ্ধিভক্ষণ : শূন্যরাজে আনিয়া সিদ্ধির ঝুলি দিল ॥
সোওয়া মণ সিদ্ধির গুঁড়া লইল বাম হাতে।
সোওয়া মণ ধুতুরার বীচি মিশাইল তাতে ॥
সোওয়া মণ কুচিলার বীচি একত্র করিয়া।
মুখেতে তুলিয়া দিল শিবের নাম নিয়া ॥

যোগসাধনায় দীক্ষা ও যোগীবেশ :
পুত্রকে যুগী করে এথা মএেনামতী রাই।
নাপিত আনিঞা রাজা [র] মস্তক মোড়াইল
গলে ক্ষেতা দিয়া মুখে ভূষণ চড়াইল ॥
বগলে বগলী দিল সিংহনাদ গলে
রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরাইল কপালে ॥
চকমকি পাথর দিল বটুয়া আধারী।
ঘোর মেখলি দিল বসের খাপুরী ॥
গলেতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের মালা।
কটিতে পরিতে দিল বাঘাম্বর ছালা ॥
কঞ্চু চক্রি সন দিল দ্বাদশ দিল হাতে।
গুরু সেবিতে রাজা যাএ মাএর সাথে।
ঝুড়ির ভিতরে দিল কড়ি একুশ বুড়ি।

বসের থলি পুরিয়া দিল সিদ্ধি খাওয়ার গুঁড়ি ॥

নৃত্য :

তাল ঝুনঝুনি খোল মৃদঙ্গ শুনি
করে কত কত কাল।
শতেক নাচনে নৃত্য সর্বজনে
পদের সাথে সাথে তাল ॥
পাএর নেপুর ঝুমুর ঝুমুর
চলিতে সুনাদ শুনি।
গাঞেন গাহিনী ছত্রিশের রাগিণী
ছয়রাগ লইয়া পুরে ॥

কড়ি ও নাড়ু :

মুদির দোকানে ছিল কড়ি একুশ বুড়ি।
সিদ্ধির নকুল খাইল কামেশ্বরের বড়ি ॥
কামেশ্বরের নাড়ু খাইয়া আনন্দিত হইল।

বেশ্যার সজ্জা :

পাইয়া রাজাক বেশ্যা হরষিত মন।
নানান অলঙ্কারে বেশ্যা করিল আভরণ ॥
রত্নের পেটারী বেশ্যা খসাইয়া আনিল।
যথাতে যেহি সাজে বেশ্যা পরিতে লাগিল ॥
হস্তে করি নিল বেশ্যা সুবর্ণের চিরুনি।
মস্তকের কেশ চিরি গাঁথিল বিয়ানী ॥
গন্ধ পুষ্প তৈল বেশ্যা পরিল মাথাতে।
সুবর্ণের জাদ বেশ্যা পরিল খোঁপাতে ॥
কাম সিন্দূরের ফোঁটা পরিল কপালে।
দিননাথ উদিত যেন প্রভাতের কালে ॥
গৌর বরণ বেশ্যার দীপ্ত করে তনু।
কপালের সিন্দূর যেন প্রভাতের ভানু ॥
জোড় ডোঙের মধ্যে পরে তিলকের ফোঁটা।
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজলীর ছটা ॥
নঞানে কাজল পরে মেঘের মনে বাদ।
লক্ষের বেশর বেশ্যা পরিল নাসিকাত।
মন্ত্র পড়িয়া তৈল মাখিল বদনে।
আঁখির ঠমকে জ্ঞান হরে যুবক জনে ॥
অধর শোভিত কর্ম কর্পূর তাম্বুলে।
দশন ভ্রমর যেন বসিল কমলে ॥
পান খাইয়া বেশ্যা মদন মুরলী।
বুকের উপরে যেন চম্পকের কলি ॥
চিকন মাঞ্জা দিঙ্গল কেশ বাএ হালে গাও।

পুরুষের মন হরে শুনি মুখে রাও ॥
কপালের সেঁতিপাটি হীরায় জড়িত।
কিঞ্চিত হাসিতে যেন তারা বিকশিত ॥
গলেতে পরিল বেশ্যা শ্বতেশ্বরী হার।
সুবর্ণের প্রদীপ যেন জ্বলে অন্ধকার।
বাহু মৃণাল যেন লক্ষ চাম্পার কলি।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহে পরে কলি ॥
করেত কঙ্কণ যেন নিশানাথের শোভা।
হৃদএ কনক স্তন অতি মনোলোভা ॥
অপূর্ব কাঁচলী পরে বুকের উপরে।
দেখি দুই স্তন যুবকের মন হরে ॥
কমরে পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল্যের শাড়ী।
রসিক জনের মন বেশ্যা নেএ হরি ॥
কর্ণেতে পরিল বেশ্যা হীরাধর কড়ি।
আঁখি ঠারে মুচকি মারি মন্মথএ কাড়ি।
বাঁকপাতা মল পাএ সুবর্ণের পাসলি।
যুবক পাইলে বেশ্যা মন করে চুরি ॥
গন্ধর্ব চন্দনে অঙ্গ করিল ভূষিত।
মধু লোভে অলি ধাএ দেখিলে কিঞ্চিত।

আসন ও আসর : পাট বস্ত্র আনিয়া বেশ্যা রাজার তরে দিল ॥
শীতল মন্দির ঘর হিঙ্গুলের রঙ্গ।
তাহাতে বিছায়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ ॥
পালঙ্গ বিছায়া বেশ্যা না করে আলিস।
আশে পাশে গির্দা দিল শিয়রে বালিশ ॥
সুবর্ণের বাটাতে দিল তাম্বুল ভরিয়া।
সুবাসিত জল থুইল ভিঙ্গার ভরিয়া ॥
উপরে টানিয়া দিল ফুলের চান্দয়া।

দাসের কাজ ও খাদ্য : পানি আনে কাষ্ঠ কাঠে গৃহে দেএ ছড়া।
ভক্ষণ করিতে পাএ একপোয়া চিড়া ॥

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা : [তুল : চর্যাপদ]
বাসাতে ছাও নাই সদাএ উড়ে পড়ে।
নগরেত মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে ॥
পুকুরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন চোবে।
অন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে ॥
চূড়ায় নূপুর বাজে কাঁকালে বাঁশী বাএ।

মকর কুণ্ডল তিলক আজ্ঞাএ তার পাএ ॥
ক্ষীরোদ মকর মণি কাছে কাছে দোলে।
এহি বড় অপূর্ব চন্দ্রেক রাহু গিলে ॥
কি করিতে পারে শ্রীনগরের কোতয়ালে।
মকসের পশর হইল শকুন রাখালে ॥
ভরিল ইন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী।
শুতিয়া আছে ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী ॥

বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাজা।
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঁজা ॥
ছুঞ্চার পানি ফুটি টুঞ্চি করিয়া ধাএ।
শুয়া পক্ষি বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ ॥

শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুঝে।
কোটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে।
তবুত কোন লোক না বুঝে সন্ধান।
ডুবিল সোনার নৌকা ভাসিয়া গেল জান ॥

ঘ. নসিয়ত নামা

আফজল আলি বিরচিত (আঠারো শতক) [মৎ-সম্পাদিত]

আফজল আলি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া অঞ্চলের কবি। স্বধর্মীয় সমাজহিতৈষণার প্রেরণা-বশে তিনি শাহ্ রুস্তম নামের এক দরবেশের তত্ত্বোপদেশ স্বপ্ন-দর্শনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সমকালীন শরিয়ৎ-বিরোধী লোকাচার ও লোকচরিত্রের নিন্দাই তাঁর এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অসংকোচে কাল্পনিক শাস্ত্র ও স্বপ্ন তৈরি করেছেন। লোকহিত কিংবা সমাজ-সংস্কারের সদুদ্দেশ্যেও-যে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এ-গ্রন্থ তার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত।

কলিযুগের মানুষ : বার সদীতে জন্মিতের সদী পাইছে
যে সকল লোকে দৌ-আঁসলা হইয়াছে।
তের সদীতে জন্ম যে সকল হইব
খানে দজ্জালের নায়েব সে সকল হৈব।

গয়বী ফকির : গয়েবের ভেদ যত আল্লায় জানন্ত

আল্লার সদৃশ হই গায়েবী কহেন্ত।
গয়েবী ফকির যেবা তারিফ করএ
দোজখেত সে সকল তাড়িব নিশ্চএ।
কলিযুগে গয়বী ফকির বহু হৈব
বাম পাশে ইব্লিসের পর্দাফাড়া যাইব।

ভাগ্যগণনা [ফালনামা ও গণনা] :

কাহার যদি সে হইল ব্যারাম গাএ
আল্লা ছাড়ি খোন্দকার খলিফা আছে যাএ।
ফালনামা চাহি বোলে 'আসর' হইছে
মঘিনী মোহিনী কিবা দেবতা পাইছে।
নতু বোলে পরীর আছর হইয়াছে
হেনমত কহি যদি ডালি তুলি দিছে।
কোরানে কাফের তারে বোলএ সর্বথা।

ডালি :

দেও পরী ডালি দিছে যথ মুসলমান
থাকিব দোজখে দুঃখ পাইব নানামত।

তামাক সেবনের নিন্দা :

তামাকুর পায়রবী করএ পঞ্চজন
তামাকু যে ক্ষেতি করে, যেবা মাখি দিছে
যে জনে ভরিল হুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে।
আর যে সকল ভক্ষে এই পঞ্চজন
হিসাবেতে 'ছেহা' বর্ণ হইব বদন।
এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ
শ্বশুরে জামাতা বন্ধু এক নলে খাএ।

ভণ্ড ফকির :

অ-চরিত্র দেখি বেশ এই জামানার
বহু বহু লোক ফকিরের বেশ লইয়া
রাজ্য রাজ্য ভ্রমিবেক ফকির বুলিয়া।
হস্তে বাঁকা ছড়ি লই গাল দিছে হেলি
শিরে কালা পাক খণ্ডি বগলে লএ তুলি
হস্তে ছড়ি গলে তজবী শিরে দীর্ঘ চুল
বেশ দেখিয়া যেন লাগে ফকির মকবুল।
রাত্রি হৈলে তবে এক বাড়ীত যাইব
ফকির জানিয়া লোকে তবে জাগা দিব।
নিশি ভাগ হৈল যদি সেই পাপমতি

যে গৃহীর ঘরে সিঁদ দিব শীঘ্রগতি।
তবে তার যথেক সম্পদ নিব হরি।

পরিহার্য পঞ্চজন : সরাবী যে ভাঙ্গি, জাঙ্গি, ঢঙ্গি, বেনামাজী
এই পঞ্চজন সঙ্গে প্রীতি না করিবা বুঝি।

ঙ. ফকির গরীবুল্লাহ

দোভাষী শায়ের

১৭৬০-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সোনাভান, জঙ্গ-নামা, ইউসুফ জোলেখা, সত্যপীর পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করেন। হুগলী জেলায় তাঁর জন্ম।

অলঙ্কার : গলায় সোনার হার কাঙ্গনের শোভা তার
আগুপিছু শোভা করে ঝাপা।
হেন নথ নাক মাঝে গজমতি তাহে সাজে
ছেড়ে শোভা কনকের চাঁপা ॥
কপালে মানিক পঠি গাঁথিয়া বান্ধেন চুটি
যেন শোভা আকাশের তারা।
তিলক কপাল 'পরে চন্দ্র যেন শোভা করে
বক্ষ বান্ধে সোনারূপার ডোড়া ॥
পায়েতে নূপুর দিল অন্ধার উজাড় হল
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি।

হেনকালে সহর হইতে আসিল এক বুড়ী ॥
জোলেখার আগে আইল হাসিয়া হাসিয়া।
পরিয়া পাটের শাড়ি পান গুয়া খাইয়া ॥
তাড়াবালা বাজুবন্দ হৃদয় কাচুলি।
হাতেতে কার চুড়ি চুড়ি পায়েত পাশলি ॥

নাচ-গান : জোলেখা হুকুম দিল করিতে লগন।
নাচগীত আনন্তিত বেহার ছামানা ॥
আজিজ জোলেখা দোন হইল দেখা শুনা।
নাচগীত আনন্দিত বিহার ছামানা ॥
নানা রঙ্গে নাচে দু'দলের মাঝ।

কামানে পলিতা দেয় বন্ধুকের আওয়াজ ॥
লস্করে লস্করে খেলে করিয়া পায়তারা।
দোতরা সারঙ্গী বাজে ঢোলক মন্দিরা ॥
ময়ূরের কাছে নাচে ময়ূরী ঘুরিয়া ॥
গায়ে ' যে গীত গায় ডুবকি বাজায়।
আজিজের হাতে দাই সঁপে জোলেখায়।

(ইউসুফ জোলেখা)

হোলি :

ডাড়ুয়া নাটুয়া লোক মেলুক আসিয়া।
জরদ গোলাপী রঙ পিচকারী করিয়া ॥
দিবেক সবার গায় যে আসিবে হেথা।
এমাম করেন বেহা কেবা এই কথা ॥

বিবাহোৎসব :

যাইয়া দেখিল বান্ধি বাজে সাদীয়ানা।
ঠাঁই ঠাঁই নাব গীত পাকে খানাপিনা ॥
বাইজীগণ, নাচে, গীত গায় রাগে রাগে।
রঙের পিচকারী ছাড়ে গায়ে এসে লাগে ॥
ভাড়ুয়া রোমজানি কত করে নানা বাজি।
পুছিতে কহিল এমামের সাদী আজি ॥

(জঙ্গনামা)

অলঙ্কার :

১. সেই মর্দ দিবে মোরে অষ্ট অলঙ্কার ॥
তারবালা বাজুবন্ধ গলায় হাসুলি।
সিঁতেপাটি চন্দ্রহার পায়েত পাসুলি ॥
কানে কানবালা দিবে গলায় দিবে হার।
হাতে চুড়ি পৌছি আর পাজের সোনার ॥

(সোনাভান)

২. দেলে বড় হয়ে খুশী   তামাম ছেহেলি আসি
দেলে খায় করেন সেঙ্গার ॥
নথ ও সেঙ্গারে সাদ   কোঠনে সোনার চাঁদ
গলে দিলে গজমতি হার
নাকেতে সোনার নথ   মতির জড়িত কত
রতশনি করে ঝলমল।
কানেতে কনকপাতি   হীরালাল তার সাথি
ঝলমল গগন উজ্জ্বল ॥
হাতেতে কাচের চুড়ি   বাওটি কামের বেড়ি
কাঙ্গনে কনক তার শোভে।

পিঠ পরে পিঠ ঝাপা মাথার সোনার চাঁপা
মুনিমন ভুলে যায় শোভে ॥

(ইউসুফ জোলেখা)

৩. গলায় সোনারহার কাঙ্গনের শোভা তার
আগুপিছু শোভা করে ঝাপা।
হেন নাথ নাক মাঝে গজমতি তাহে সাজে
ছেরে শোভা কনকের চাঁপা ॥
কপালে মানিক পটি গাঁথিয়া বান্দেন চুটি
যেন শোভা আকাশের তারা।
তিলক কপাল পরে চান্দ যেন শোভা করে
বাদ বান্দে সোনা রূপার ডোরা ॥
পায়েত নূপুর দিল অন্ধার উজালা হইল
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি।
ছিরি তার ওঠে ডাল আন্ধারেতে হইল আলো
বিজলি সমান ঝিলিমিলি ॥

(আমির হামজা)

৪. নয়নে কাজল দিল কপালে সিন্দূর।
জোলেখার বেশ যেন চমকে চিকুর ॥
তার ঝাপা ঝজুবন্দ হৃদয়ে কাঁচুলি
গলে গজমতি হার করে ঝিলিমিলি ॥

(ইউসুফ জোলেখা)

বুড়ী বলে বাজারেতে কড়িপয়সা নিয়া সাথে
যাব বাবা শোন মোছাফির ॥
হানিফা কহেন বুড়ী লিয়া যাও কত কড়ি
শুনে বলে কড়ি তিন পণ।

(সোনাভান)

অথবা

মুজুরি করিয়া আনে কড়ি তিনপণ।
পুছিবে কি হৈল কড়ি কি কব তখন ॥

(সোনাভান)

তাহার ভিতরে বিবি আপনি যাইয়া।
ইউসুফ জোলেখা চিত্র করেন বসিয়া ॥
হিঙ্গুলে হরিতাল দিল হাতেতে তুলিয়া।
একে একে চিত্র করে ভাবিয়া ভাবিয়া ॥

(ইউসুফ জোলেখা)

সওয়া মণ আনে আটা সওয়া মণ চিনি
সওয়া মণ আনে দধি আর যে বিরণী ॥
পাকা কলা আটা আদি তাহাতে ডালিয়া।
ভরিলে বাসন সব হালুয়া করিয়া ॥
এক হাজার পান আর যে শুপারি।
আগর চন্দন চুয়া গোলাব কস্তুরি ॥

(সত্যপীরের পুঁথি)

চ. বিবাহমঙ্গল (গেরোয়া খেলা)

আইনুদ্দীন [মৎ-সম্পাদিত]

আদিম কৌম সমাজে মাতৃ বা ক্ষেত্র প্রাধান্যের অবসানে গড়ে ওঠে পিতৃ বা বীজ-প্রধান সমাজ। ক্ষেত্র ও বীজ প্রতীক অবশ্যই কৃষিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত। বিবাহরীতি প্রবর্তনের ফলেই-যে ম্যাট্রিয়ার্কেল তথা মাতৃপ্রধান সমাজের বিলুপ্তি ঘটেছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। কেননা, বিবাহ এক বিশেষ সমাজচিন্তার প্রসূন। এই চিন্তার সহজে উন্মেষ হয় নি। এও এক বিশেষ মানবিক বোধ-বুদ্ধি ও রুচি-সংস্কৃতির অবদান।

জীব নির্বিশেষে না হোক, অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষুধা দ্বিবিধ : ঔদরিক ও মানসিক। ঔদরিক ক্ষুধা খাদ্যে নিবৃত্তি পায়, দেহের রক্ষণ ও পুষ্টির জন্যে তা প্রয়োজন। আর মানসিক ক্ষুধা রক্তের একপ্রকার চাহিদা মাত্র। এর নাম কাম। এটি সৃষ্টিসম্ভব, তাই অমোঘ।

আদিম মানুষ যতদিন প্রাণীবিশেষ ছিল, ততদিন কাম ছিল নির্ভেজাল দৈহিক। তার মানসিক বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ ঘটার সাথে সাথে তার চোখে রঙ ধরে— তার মধ্যে রূপতৃষ্ণা জাগে। এর পর কেবল বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হলেই তার চলে না, সাথে আকর্ষণীয় রূপ এবং যৌবনও চাই। শক্তিমান পুরুষ রূপসী ও যৌবনবতী ধর্ষণে হল প্রয়াসী। রূপ নিয়ে পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের এভাবেই হয় শুরু। তার অনেক পরে আসে জমি ও জেবর নিয়ে মারামারি হানাহানির পালা— তা অবশ্য জীবিকাবিরল জনবহুল সভ্যসমাজের ব্যাপার।

এই প্রাণধ্বংসী দ্বন্দ্ব-কোন্দল-সংঘাত থেকে পারস্পরিক নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে মানুষ যে বিবাহ-রীতি চালু করেছে—নিঃসংশয়ে তেমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। তখনো প্রবর্তিত ধর্মের যুগ আসে নি। কাজেই এ হচ্ছে একপ্রকার সামাজিক চুক্তি যার নাম দেওয়া যায় Policy of non-interference। কারো সঙ্গে কেউ জুটে গেলে, সেই যুগলের জীবন নির্বিঘ্নে রাখা, তাদের উপর থেকে অন্যদের আকর্ষণ ও দাবি প্রত্যাহার করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্ভোগে সামাজিক স্বীকৃতি দান প্রভৃতি সেই নিরাপত্তানীতির অন্তর্নিহিত

শর্ত। কোন্দলে হনন এড়ানোর এই আশ্চর্য বুদ্ধি থেকেই সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ ও কল্যাণচিন্তার জন্ম।

সর্বপ্রাণবাদী জাদুবিশ্বাসী মানুষ সেদিনও নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তির দোহাই মেনেছে, শপথ নিয়েছে কোনো শক্তির নাম উচ্চারণ করে এবং কোনো টেবোও হয়েছে সর্বজনমান্য। যেহেতু মানুষের কোনো বিশ্বাস-সংস্কারের মৃত্যু নেই এবং যুক্তি-বুদ্ধি কোনো ভীরুতাকেই অতিক্রম করতে পারে না, সেহেতু পরবর্তীকালের প্রবর্তিত ধর্মের আশ্রয়ে, সৌন্দর্যপ্রিয় মনের প্রশ্রয়ে এবং বিকশিত সমাজের প্রচ্ছায় সেই আদিম মিলনলগ্নের নানা আকুতি আজও রূপান্তরে ও সূক্ষ্মতায় বিবর্তিত তাৎপর্যে ও নতুন লাবণ্যে আমাদের সমাজে দৃশ্যমান হয়ে সংস্থিত।

সভ্যতর সমাজে স্বয়ম্বরপ্রথা সেই আদিম-নীতির পরিস্রুত রূপায়ণ মাত্র। যতই দিন গেছে, স্থূল সম্ভোগ-বাঞ্ছা রুচি ও লজ্জার প্রলেপে ও মহৎ পেলবতায় মধুর এবং উন্নততর জীবনবোধ ও সমাজসংস্থার ভিত হিসেবে মহৎ হয়ে উঠেছে। এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে আত্মীয় সমাজ, গোত্রীয় চেতনা ও কৌম-জীবন। এই রক্তের বন্ধনে পবিত্রতা ও আনুগত্য আরোপিত হয়ে তা ঐহিক-পারত্রিক জীবনের অন্যতম নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে দাম্পত্যসুখ, বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য, ঘরোয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারিবারিক বন্ধন, সন্তান উৎপাদন, ধর্ম-সাধনা, সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার প্রভৃতি নানা নীতি ও কৃতি সম্পৃক্ত হয়ে বিবাহপ্রথা আজকের জীবনযাত্রীর একান্ত অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

জমি ও জরু চিরকালই বীরভোগ্য। বাহুবল, আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও ভোগবাঞ্ছা যার আছে, সে-ই বীর। নারীরাও তেমন বীরেই হয় আকৃষ্ট। এককালে বীরেরা নারী হরণ করত, কায়িক শক্তি প্রয়োগেই প্রতিষ্ঠা করত নিজের অধিকার। তাই আজও বিয়েতে দোর আগলে বরকে বাধা দেয়ার রেওয়াজে সেই কৃতি ও স্মৃতি আচারিক মর্যাদায় রক্ষিত। উৎসব-পার্বণকালে মেলায় জীবনসাথি বেছে নেওয়ার রেওয়াজ সুপ্রাচীন। সাধারণের স্বয়ম্বরসভা ঐ মেলাই। জলক্রীড়া, রাখীবন্ধন, মাল্যদান, পাণিগ্রহণ, হোলি প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হত, তেমনি অবিচ্ছেদ্যতার শপথ নেয়া হত— চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, ফুল, পশু, পাখি প্রভৃতি সাক্ষী রেখে। আবার রজ্জু কর্তন করে, মৃৎপাত্র ভেঙে, কিংবা গাটছড়া বেঁধে এই বন্ধনের অমোঘতার ও স্থায়িত্বের প্রতীকী অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করা হত। আবার দীর্ঘায়ু, স্থায়ী প্রীতি, প্রতুল খাদ্য, অমিত প্রজনন, অম্লান যৌবন, অবারিত বৃদ্ধি, বাঞ্ছাপূর্তি প্রভৃতির প্রতীক হয়েছে দূর্বা, ধান, মাছ, আমপাতা, কলাগাছ, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি। শুভকামনায় নিরাপত্তার প্রয়োজন এবং আনন্দের আয়োজনে মানুষ প্রতীক ও অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক অনেক বাড়িয়েছে।

বিবাহোৎসবে এ আগ্রহের মূল কারণ হয়তো মনস্তাত্ত্বিক। শৃঙ্গার-রসে বঞ্চিত ও কৃতার্থ সবাই সমভাবে উৎসাহী। এক্ষেত্রে তৃপ্তি-অতৃপ্তি দু-ই সমভাবে বেদনামধুর এবং চিরনতুন ও সার্বক্ষণিক। তাই বিয়েমাত্রই কেবল বর-কনের পক্ষে নয়, পরিচিত-পরিজন সবার পক্ষেই আনন্দের। সেজন্যে সম্পদগত সামর্থ্যানুসারে বিবাহোপলক্ষে আনন্দের আয়োজন বিবাহপ্রথারই সমকালীন। তারই ফলে বিবাহোৎসব আচার ও অনুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যে, বিভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যে সামাজিক মহোৎসবের রূপ পেয়েছে। নাচ-গান-পান-ভোজন ছাড়াও এর আচারিক ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিপদ্ধতি ধর্ম ও বিশ্বাসের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে উন্নীত হয়েছে। তাই বিবাহের পূর্বে ও পরে দীর্ঘদিন ধরে এ উৎসব চলত। আজকাল আবার নানা কারণে বিবাহোৎসব ঋজু ও স্বল্পস্থায়ী হয়ে গেছে।

আলোচ্য 'পদবন্ধ'গুলোতে দু'শ বছর আগেকার বিবাহোৎসবের একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। মুসলিম-ঘরেই তা জনপ্রিয় ছিল। শাহ্‌নজর কালে অর্থাৎ বর-কনের মিলনলগ্নে এইসব ক্রীড়ার মাধ্যমে অপরিচয়ের শরম ও সঙ্কোচ পরিহার করা সহজ হত। সখা-সখী ও ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের উপস্থিতি ও হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে বাসরের মধুমিলনের প্রস্তুতিপর্ব এভাবে হত অতিবাহিত।

বর-কনের শুভ সাক্ষাতের জন্যে তৈরি হত সুসজ্জিত মঞ্চ। উপরে থাকত চাঁদোয়া। এই মঞ্চগৃহের নাম মারোয়া। আর ঐ শুভ সাক্ষাৎ বা শাহ্‌নজরের নাম জুলুয়া। এই সময়ে বর-কনেকে অভিনন্দিত করে যে-গান সমবেত কণ্ঠে গীত হত তার নাম জোলুয়া-গীত।

বর-কনে সখা-সখীর উপস্থিতিতে তখন পুষ্পস্তবক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করে। গেরোয়া মানে ফুলের স্তবক (তুল : ফুলের গেরোয়া সঘনে লুফএ— বৈষ্ণবপদ)। পুষ্প লোফালুফিতে অবশ্য হার-জিৎ ছিল, এ অনেকটা এ-যুগের 'ভলিবল' খেলার মতো। এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রাস ও হোলির প্রভাবও ছিল। তারপর বর-কনে উভয়ে খেলত পাশা। তাতেও বরের যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ হত। তা ছাড়া বর-ঠকানো ধাঁধা-হেঁয়ালি এবং বরকে জব্দ করার নানা ফন্দি-ফিকিরের ব্যবস্থাও থাকত।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩ খ্রি.) তাঁর এক প্রবন্ধে আফসোস করে বলেছেন : "পূর্বকালে মুসলমানের বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে পাশাখেলা ও গেরোয়া খেলা অনুষ্ঠিত হইত। ...এই সব অনুষ্ঠান বড় আমোদজনক ছিল। আমার ছোটকালে পাশা খেলা দেখিয়াছি মনে পড়ে কিন্তু গেরোয়া খেলা দেখি নাই। সেকালে এক একটা বিবাহে দীর্ঘদিন ধরিয়া কত রকমের কত আনন্দ-উৎসব হইত। অধুনা তাহা কল্পনার বস্তু হইয়াছে।— এখন এ দুইটি খেলার একটারও প্রচলন নাই। দৈত্যের (ইংরেজের) আগমনে অধুনা সকল রকম আনন্দ-উৎসব দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। কি সুখের দিন দৈত্যেরা আমাদের নষ্ট করিয়াছে। এ জীবনে টাকায় ছয় আড়ি (৯৬ সের) ধান্য ও তিন আড়ি (৪৮ সের) চাউল দেখিয়াছি আর আজ দেখিতেছি টাকায় পাচসের ধান্য (মণ দশ টাকা) ও সোয়াসের চাউল।" ['কাফেলা'— কাজী নজমুল হক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩৫৮ সনে প্রকাশিত 'গেরোয়া খেলা' প্রবন্ধ।]

সংস্কার-প্রত্যয় উন্নীত হলে তা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানেও জাকাত, এবাদত, হজ, কোরানপাঠ, ইসলামপ্রচার ও স্বর্গবাঞ্ছা প্রভৃতি মুসলিমের অবশ্যিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পদকার সহজ সাধনের পন্থা বাতলে দিয়েছেন— যেমন : চারবার সুরা 'ফাতেহা' পড়লেই জাকাত দানের পুণ্য, তিনবার সুরা 'কদর' আবৃত্তি করলে হজের পুণ্য, তিনবার সুরা 'এখলাস' আওড়ালে কোরানপাঠের ফল আর তিনবার কলেমা 'তমজিদ' পড়লে কাফেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার সুকৃতি এবং তিনবার 'আস্তাগফের' আবৃত্তি করলে স্বর্গের অধিকার লাভ করা যায়। অতএব বর-কনে বাসর-শয্যা গ্রহণের পূর্বে এসব সূরা-কলেমা পড়ে যাবে। এবং এই—

পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানেতে যাএ
পুত্র কন্যা যত জন্মে তথ পাপ হএ।

মুসলিম দাম্পত্যের আদর্শ হচ্ছেন আলি ও ফাতেমা। তাই দম্পতিকে হিতাকাঙ্ক্ষীরা আশীর্বাদ করে :

"আলি ফাতেমার যেহেন আছিল পিরীতি
তেন মনে রহি যাউক দোহান আকৃতি।"

নিকাহ্ মঙ্গল [বিবাহোৎসব]
[জলুয়া, গেরোয়া ও পাশা]

[প্রস্তাবনা]

বিসমিল্লা নাম জান ত্রিভুবন সার
যাহার গৌরভে প্রভু সৃজিলা সংসার।

প্রথমে বন্দেগী করি সৃজন যাহার
মনিষ্য গন্ধর্ব আদি সৃজন তাহার।
সংসারে ব্যাপিত সে যে নৈরূপ নৈরেখ
অনন্ত মহিমা তান কেবা কহিবেক।
এনারী পুরুষ দোহ্ করিয়া সৃজন
নিজ অংশ রূপ দিয়া কৈলা সুলক্ষণ।
প্রভুর পরম সখা নবী মোহাম্মদ
যার হেতু ত্রিজগতে এ সুখ সম্পদ।
নিকাহ-বিভা রঙ্গে এ মহিমা যার
এহাতুন অধিক সুখ কিবা আছে আর।
আল্লার যে কৃপা স্থানে জান নারীগণ
তেকারণে পতির সনে করিতে মিলন।
তবে শুন মুসলমান শাস্ত্রের নিবেদন
শাস্ত্রনীতি কারিলে সে পাপেতুন আমান।
একদিন পয়গম্বর আপনার ঘরে
আলি স্থানে দিলা বিভা বিবি ফাতেমারে।
পয়গম্বরে কহিছন্ত আলিত ব্যবস্থা
পঞ্চকর্ম করি যাইতে বিছানে সর্বথা।
পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানেতে যাএ
পুত্র কন্যা যথ জন্মে তত পাপ হএ।
প্রথমে করিবা দান সুবর্ণের তঙ্কা শত

দ্বিতীএ মক্কাত যাই কর এবাদত।
তৃতীএ সমাপ্ত করি পড়িবা কোরান
চতুর্থে জাহিল সব কর মুসলমান।
পঞ্চমে ভিহিস্ত রুজু হইবা সদাএ
এই মতে পঞ্চকর্ম করিবা আদায়।
তবে কহি শুন সবে কে করিতে পারে
উপদেশ কহিছন্ত যদি পারে করিবারে।
সুরত ফাতেহা যদি পড়ে বেদ'বার।
সুবর্ণের শত তঙ্কা দান কৈলা সার।
হজ গুজারিতে যদি চাহ নিশ্চিত
তিনবার সূরা 'কদর' পড়িবা তুরিত।
কোরান খতম যদি চাহে পড়িবার
সূরত 'এখলাস' শাহা পড় নেত্র বার।
যদি সে কাফির চাহ মুমীন করিবার
কালেমা 'তমজিদ' শাহা পড় নেত্র বার
যদি সে ভিহিস্ত রজু চাহ হইবার
ভাল মতে 'আস্তাগফের' পড় তিনবার।
তার পাছে বিছানেত করিবা গমন
প্রতি কাঞিএ বিসমিল্লা যে করিবা স্মরণ।
শোকরানা নামাজ পড়িবা দুই 'রাকাত'
কন্যার আঞ্চলের 'পরে প্রভুর সাক্ষাৎ।
তবে যদি যুবতী-পতি হৈল রঙ্গমতি
আউজু-বিসমিল্লাহ পড়ি ভৃঞ্জিবা সুরতি।
প্রথমে চিবুক ধরি দুই উরু মাঝ
কোলে তুলি লৈলে কন্যা জান পুণ্যকাজ।

[গেরোয়া] জুলুয়া গান :

এবে কহি শুন সবে রসিক সুজন
দামাদ কন্যার প্রতি জুলুয়া গাহন।
গেরোয়া খেলহ শাহা আনন্দিত হৈয়া
'শোকরানা' কহ শাহা এই কন্যা পাইয়া।
প্রথমে কনক পদ্মে গেরোয়া খেলাও
এর সম কৌতুকে শাহা গেরোয়া ফিরাও।
দ্বিতীএ গেরোয়া খেল রঙ্গিম বান্ধুলি
যুবতী ফিরাএ পুনি নিজ কান্ত বুলি
তৃতীএ গেরোয়া খেল মারুয়া গোলাল
যুবতী ফিরাএ পুনি যেন লাগে ভাল।
চতুর্থে গেরোয়া খেল কনকের জুতি

ফিরাইয়া খেল সতী পুরাউক আরতি।
পঞ্চমে গেরোয়া খেল চম্পা নাগরাজ
তুরিতে ফিরাও কন্যা করি ভাল সাজ।
ষষ্টমে গেরোয়া খেল মালতী নব যুথী
ফিরাইয়া খেল কন্যা লও নিজপতি।
সপ্তমে গেরোয়া খেল পুষ্প-বিরাজিত
শতবর্গ লঙ্গ আদি দাউদী সহিত?
পুষ্পের গেরোয়া শাহা দিলা কন্যার হাতে
হুর হৈল যেন কন্যা শাহার সাক্ষাতে।
অষ্টমে গেরোয়া খেল মন কুতূহলে
মণি মুক্তা রত্ন হার দেএ কন্যার গলে।
এ শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যারে কর দান
লোকে যেন ধন্য ধন্য করুক বাখান।
গেরোয়াল দূরে করি পতি পত্নী মিলিয়া
'সরবত' 'তাম্বুল' খাও পাটেত বসিয়া।
আলি-ফাতেমার যেন আছিল পিরীতি
তেনমত রহি যাউক দোহান আকৃতি।
চিরদিন নিরোগী হো'ক দোহজন
ধনে পুত্রে এ দোহান হোক প্রধান।
এ শাহা সুন্দরী প্রতি হৈতে অনুদিন
'খায়ের ফাতেহা' পড়ে কহে আইনদ্দিন।

আখের জুলুয়া [পাশার রাগ] :

জপ আল্লার নাম শেষ নবীবর
তার শেষে বন্দি যথ পীর পয়গাম্বর।
পুরুষ যুবতী যদি কেহ না জানএ
ফোরকান কিতাবে তারে হারাম লেখএ।
তৌরাত ইঞ্জিল আর জবুরত ফোরকান
এ চারি কিতাব মাঝে ফোরকান প্রধান।
আর পুণ্য জুমাহাবারে যে করে গোছল
গোরেত চেরাগ জ্বলে দেখএ সকল।
কলিমার হোন্তে দুঃখ গাইব তিনজন
একে একে কহি শুন তার বিবরণ।
প্রথমে পাইব দুঃখ জনক যাহার
তবে দুঃখ পাএ পুত্র স্বামী আপনার।
তক্তেত বসিয়া শাহা খেল পাশা শাইর
কেহ হারাএ কেহ পাএ সুবর্ণ কটোর।
কন্যাএ হারি দিলে অষ্ট অলঙ্কার

দামাদ হারিলে দিব ততেক বেভার।
প্রথমে পাশার ডাল শাহা পড়িয়া গেল এক
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা দেখ পরতেক।
দ্বিতীএ পাশার ডাল পড়িয়া গেল ধুলা
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা পিঞ্জরের শুয়া।
তৃতীএ পাশার ডাল শাহা পড়িয়া গেল তিন
দামান কন্যা খেলে পাশা শরীর মাত্র ভিন।
চতুর্থে পাশার ডাল পড়িয়া গেল চারি
দামাদ কন্যা খেলে পাশা করি সারি সারি।
পঞ্চমে পাশার ডাল পড়িয়া গেল পাঁচ
দামান কন্যাএ খেলে পাশা হস্তের ভাঙ্গিল কাচ।
ষষ্টমে পাশার ডাল পড়ি গেল ছয়
তুমিত নিলাজ বন্ধু মোর মনে লয়।
সপ্তমে পাশার ডাল পড়ি গেল সাত।
তুমিত নিলাজ বন্ধু ঘন বাড়াও হাত।
অষ্টমে পাশার ডাল পড়ি গেল আট
পাটি বালিস পাইয়া শাহা আর মাগে ঘাট।
নবমে পাশার ঢাল পড়ি গেল নয়
দামান কন্যাএ খেলে পাশা হস্ত করি লয়।

ঝড় পড়ে ফুটি ফুটি বিজলি পড়ে খরি
চল শাহা ঘরে যাই আল্লা নাম স্মরি।
দশনে পাশার ডাল পড়িয়া গেল দশ
দামান-কন্যাএ খেলে পাশা যেন লাগে খোশ।
'এয়াজদোহুম' পাশার ডাল পড়ি গেল এয়াজদোহা
দামান-কন্যাএ খেলে পাশা জিনি গেল শাহা।

গেরোয়া খেলা :

[বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম]
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
দ্বিতীএ প্রণাম করি ফিরিস্তার গণ।
তৃতীএ প্রণাম করি রসুল আল্লার
নিমিষে সৃজিলা প্রভু সয়াল সংসার।
সৃজিয়া সয়াল প্রভু কৈলা আত্মপর
দ্বিজরাজ জিনিয়া বদন শাহার
পুষ্পের গেরোয়া মারে অমৃত সংসার।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
প্রথম গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।

ফুলের যে মাঝে আছে ফুলের পঞ্চভাই
গেরোয়া খেলেরে শাহা চাঁদোয়া জামাই।
গলার গুন্থির হার পুষ্প পরিচয়
কৌতুকে মেলিয়া মারে পুষ্পপরিচয়।
তাহান পুষ্পের গেরোয়া পাইয়া তুলি লইল মাথে
ফিরাইয়া দেয় কন্যা দামাদের হাতে।
পুষ্পকে পাইয়া শাহা তুলি লৈল মাথে
ফিরাইয়া দেয় কন্যা দামাদের হাতে।
পুষ্পকে পাইয়া শাহা আপনার সুখ
সুগন্ধি কুসুম্ব গেরোয়া দেখত কৌতুক।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
দ্বিতীএ গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।

যুথি জাতী মালতী যে করি সমতুল
কন্যাকে মেলিয়া মারে যত পুষ্পকুল।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
তৃতীএ গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।
নবীন পুষ্পের বাএ অলি সুললিত
গেরোয়া খেলেরে শাহা লোকের বিদিত।
তপন ভরিয়া তুলে যত পুষ্পবর
পুষ্প উৎক্ষেপে শাহা শিরের উপর।
সন্তোষি জলুয়া যে করিয়া দিলুম সঙ্গে
ব্যাকুল কদম্ব মেলে কন্যা সর্ব অঙ্গে।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
চতুর্থ গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।

বেল ফুল কদম্ব আর চম্পা নাগেশ্বর
দামাদে গেরুয়া খেলে দেখিতে সুন্দর।
চারি গাছ রাম কলা আমের হরতিত
ফিরাইয়া গেরোয়া খেলে পুরাউক আরতি।
শাহা দামাদ দামাদ বুলিরে তোম্মারে
গেরোয়া ভূষণ শাহা দেউরে কন্যারে।
গেরোয়া ভূষণ শাহা যদি কন্যা পাএ
অনুরূপ বেশ ধরি শাহার সঙ্গে যাএ।
শাহা দামাদ দামাদ বুলিরে তোমারে
হস্তের শ্রীঅঙ্গুরী দেউরে কন্যারে।
হস্তের শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যা পাএ

মাও বাপ ছাড়িয়া কন্যা শাহা সঙ্গে যাএ।

শাহ দামাদ শাহ দামাদ বুলিরে তোমারে
তোমার কণ্ঠের হার দেউরে কন্যারে।
তোমার শ্রীঅঙ্গুরী শাহা কন্যারে কর দান
লোকে যেন ধন্য ধন্য করএ বাখান।
তোমার শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যাএ পাএ
মা বাপ ছাড়িয়া কন্যা শাহার সঙ্গে যাএ।

াত্রা : ছাড়িলাম মাতাপিতা সোদর ভাই
শাহার সমান দরদবন্দ্ সংসারেত নাই।
কাটাইলে কাটিয়া পানি সেরীত মাপিল
সেরীত মাপিয়া পানি ঘটেত ভরিল।
ঘটেত ভরিয়া পানি মারুয়া তলে রাখিল
বিসমিল্লাহ্ বলিয়া পানি শিরেত ঢালিল।
এহি দোন জনের জোড়া এমত সৃজন
প্রভুর সাক্ষাতে দোন করুক বরণ।
দামাদ কন্যা জান না হৈব ভিন
যাহাম ফাতেমা পড় কহে আইনদ্দিন।

ছ. তমিম গোলাল চতুর্থ ছিলাল

মুহম্মদ রাজা বিরচিত (১৮ শতক)

মুহম্মদ রাজার অপর কাব্যের নাম মিশরীজামাল। মুহম্মদ রাজা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনীকাব্য রচয়িতা।

বাদ্যযন্ত্র : ঢাক, ঢোল, কাড়া যত কাঁস, করতাল।
সানাই, বিগুল বাজে শুনিতে বিশাল ॥
দোসরি বাঁসরি বাজে বাজাএ মোরচঙ্গ।
দোতারা সারিন্দা বাজে করি নানারঙ্গ ॥
সারঙ্গ, মোহরি বাজে মুস্বর করি রাও।
যুবক যুবতী শুনি উল্লসিত গাও ॥
বীণা, বেণু, মধুবাঁশি, বাজাএ তোগর।
বিরহিণী কিবা শক্তি রহিবারে ঘর ॥

নানা পক্ষী সুর ধ্বনি করে নানা রব।
রাজকন্যা ছিল্লালের বিভার উৎসব ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনি সুললিত।
নাচএ নর্তকী সব গাহি সাদি গীত ॥
মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজে বাজএ তম্বুরা।
খাঞ্জরি, ঝাঞ্জরি বাজে বাজএ ডম্বুরা।
রবাব, ভেউল বাজে বাজে কবিসাল ॥

সজ্জা : কপালে সিন্দূর পরে দেবতা লক্ষণ
নিজ হস্তে নরপতি কুমার সাজাএ।
সুগন্ধি আতর জামা অঙ্গেতে পরাএ ॥

মহাদেবী নুরবানু হরিষ অন্তরে।
শাড়ির অঞ্চল ধরে শিরের উপরে॥
সুগন্ধি আতর আর গোলাপ চন্দন।
সখিগণ অঙ্গ 'পরে করন্ত লিপন।

আতশবাজি : ছাড়ি দিল পরী বাজী যেন উড়ে পরী
তিমিরে দিবস করি চলে সবে ঘিরি।

জ. সত্যপীর

ফয়জুল্লাহ বিরচিত (আনু. ১৮ শতক)

রাঢ় অঞ্চলের কবি সত্যপীর পাঁচালিকার ফৈজুল্লার গায়েনসুলভ এই বন্দনায় পির নারায়ণ 'সত্য'-এর স্বীকৃতিতে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসক-শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহাবস্থান ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে একটা আপসরফা হয়েছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম রচিত প্রায় ৫৫/ ৬০ খানা 'সত্যপীর' পাঁচালির অস্তিত্বই আমাদের এ-ধারণা বদ্ধমূল করে। সাম্প্রদায়িক চেতনা বা জাতিবৈর প্রবল থাকলে এ-ধরনের বহু বন্দনা এবং পীর-নারায়ণ সত্যের মাহাত্ম্যকথা সমাজে সমাদৃত হত না।

বন্দনা

কহেন ফৈজুল্লা কবিওলা পায়ে মতি
কেতাব দেখিয়া ফৈজুল্লা করিল সারি

মুসলমানে বল আল্লা হিন্দু বল হরি।
সেলাম করিব আগে পীর নিরাঞ্জন
মহাম্মদ মস্তফা বন্দো আর পঞ্জাতন।
সের আলি ফাতেমা বন্দো একিদা করিয়া
হাচেন হোছেন পয়দা হৈল যাহার লাগিয়া।
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারি দহ ইমামের নাম লব কত।
এবরাহিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে কোরবানি দিল দীনের কারণ।
কোরবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া
সেই হৈতে নিকে-বিভা হইল দুনিয়া।
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালোআন দুইজনে
এসমাইল গাজি বন্দো গড় মান্দারনে।
বন্দিব(বদর) জেন্দা পীর কামাএর কুনি
বড়-খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার শখি-খাঁয়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্য পীরের চরণ।
সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত
এক লাখ আশি হাজার পীরের নাম লব কত।
সম্বল পীরিনী বন্দো বিবিগণ যত
বিবি ফাতেমার কদমে বন্দিব শত শত।
হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম-নিরাঞ্জন
যার ধবল ঘাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞি
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোসাঞি
কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন।
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিণী বন্দো শচী ঠাকুরাণী
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
শুনহ ভকত লোক হএ এক চিত
সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত।...
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ

শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন।
ভকত না একের তবে মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া।
ছাড় গাজি মক্কার স্থান আসরে দেহ মন
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পদে মন।

ঝ. শমশের গাজীনামা

শেখ মনোহর বিরচিত (১৮ শতকের শেষপাদ)

ফেনী-ত্রিপুরা রওশনবাদ পরগণার রাজনৈতিক ইতিহাসমূলক কাব্য এটি। আঠারো শতকের বিদ্রোহী শমশের গাজীর কৃতি ও কীর্তি বর্ণিত রয়েছে এ কাব্যে।

শিক্ষাব্যবস্থা : তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া।
সন্দীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া
কোরান পড়াএ সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্তান হৈতে এক মৌলবী আনিল
আরবী এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
যুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গলার বাণী।
ঢাকা হইতে মুন্‌শী আনি ফারসী পড়াএ
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ।
দিনমধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি দুভাগে পড়িতে।
ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর
পাঠের সময় করি দিল গাজীবর।

ঞ. তামাকু পুরাণ

সিত কর্মকার, শান্তিদাস ও রামপ্রসাদ বিরচিত [মৎ-সম্পাদিত]

রেওয়াজ ছিল না বলেই মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে খণ্ড-কবিতা দুর্লভ। আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসাত্মক ছড়া-বচন চালু থাকলেও ঐধরনের খণ্ড-কবিতা সুদুর্লভ। তেমন

এক বিরল রচনা আলোচ্য 'তামাকু পুরাণ'। রচনাটি পরিহাসাত্মক, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-বাণও রয়েছে এতে। কিন্তু বাহ্যত একটা ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আবরণ সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। এমনি আরেকটি রচনা হচ্ছে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত 'হুক্কা পুরাণ।' এবং অন্য একটি হচ্ছে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত 'তামাকু মাহাত্ম্য'।

বিদ্রূপ আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন তামাকুর জন্মবৃত্তান্তে পৌরাণিক মর্যাদা ও মহিমা আরোপিত হয়। দেবগণের সমুদ্রমন্থনকালে রত্ন-আদি নানা বস্তুর সঙ্গে 'মহাবস্তু' তামাকুর বিচিও উত্থিত হল। স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু তা লুকিয়ে পৃথিবীর উপর ছিটিয়ে দিলেন। এমনি করে স্বর্গ-মর্ত্যের পরিসরে দেবানুগ্রহে মানবকল্যাণে তামাকু ও হুক্কার উদ্ভব। তাই 'পুরাণ' নামটি সুপ্রযুক্ত ও সার্থক। সম্ভবত আদিতে শব্দটি 'তাম্বাকু' [তাম্রকুট?] ছিল। তাই 'তামাকু'-ই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। একালে আমরা বলি তামাক। Tobacco-ও 'ও' কারন্ত।

এ পুরাণের প্রবক্তা মুনি শুক এবং শ্রোতা স্বয়ং রাজা পরীক্ষিৎ। অন্য পুরাণের মতো এ পুরাণও :

যেবা লেখে যেবা শুনে পঠে যেই জনে
বিশেষ পবিত্র হএ ইতিন ভুবলে।

কবি শান্তিদাসের কামনা— 'জন্মে জন্মে থাকে যেন তামাকুতে মতি।'

কেননা,

ভারতে আসিয়া যেবা তামাক না খাএ
প্রাণ গেলে (মরার পরে) সেই জন মহাদুঃখ পাএ!

আরো ভয়ের কথা, 'তামাক সেবন অভ্যাস না করে যে মরে' সে

'পশু হৈয়া জন্মে গিয়া শৃগালী' উদরে
'হুক্কা হুক্কা' বলি ডাক ছাড়ে নিরন্তরে!

Mock heroic কবিতার মতো বলা চলে এটিও একটি Mock-religious কবিতা। এখানেই এর অনন্যতা।

দুই

ভাঙ-চণ্ডু-চরস-গাঁজা-রস-ধেনো প্রভৃতি নানা নেশায় এদেশের মানুষ আবহমানকাল থেকে অভ্যস্ত হলেও, তা ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু। এবং সেগুলো কখনো তেমন ঘৃণ্য বা নিন্দনীয় ছিল না। বরং দেবভোগ্য বলে অনুকরণীয় ছিল। একরকম সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল। কিন্তু তামাক তেমন নেশাকর নয়, মনও তেমন মাতিয়ে তোলে না, সম্বিৎ হারাবার তো আশঙ্কাই থাকে না। মধ্যযুগেই এই নতুন ঔষধির এদেশে আমদানি। সম্ভবত এও পর্তুগিজদের দান। শোনা যায়, রাজা-বাদশাহ্‌র মধ্যে সম্রাট জাহাঁগীরই প্রথম তামাক-সেবী। এতেই বোঝা যায়, তামাকে নেশা না থাকলেও আড়ম্বর ছিল, এ ছিল পুরোপুরিই বিলাস-ব্যসন প্রকাশের অন্যতম বাস্তব

অবলম্বন। আভিজাত্য, ধন ও মানের বড়াই পদাধিকারের দর্প ও দাপট এবং মজলিশে সামাজিক আড়ম্বর প্রকাশের প্রতীকরূপে সুদীর্ঘ সুন্দর জরি-জড়ানো নল ও কারুময় রৌপ্যখচিত সুগোল কলিকাযুক্ত দামি বৃহৎ ধাতব হুক্কায় ধূমপান বা সুগন্ধ তামাক সেবন একটি আনুষ্ঠানিক রীতির মর্যাদা পায়। ফলে অধিকারী-ভেদ স্বতোই স্বীকৃত হয়। তাই অন্যান্য নেশা-সেবনের ক্ষেত্রে আদব-কায়দার প্রশ্ন কখনো গুরুতর ছিল না বটে, কিন্তু তামাক-সেবনের মতো নির্দোষ বিলাসের বেলায় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ ও নিয়মনীতি কঠোরভাবে মেনে চলা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এতে গুরুজন, মান্যজনেরই একচেটিয়া সামাজিক ও মজলিশি অধিকার। সামন্ত-সমাজে মান্যজনমাত্রই প্রভুকল্প। আর যারা মানবে, তারা নিকট-আত্মীয় হলেও দাসকল্প। তাই স্ত্রীও চরণাশ্রিতা, সন্তানও সেবক, খাদেম প্রণত, খাকসার। অশনে-বসনে-আসনে-বাহনে— জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে গুরু-মান্যজনের অগ্রাধিকার ও সিংহভাগ।

শস্তা, সহজলভ্য, সুসেব্য ও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কাবিহীন হওয়ায় তামাক-সেবন শিগ্‌গিরই গণ-অভ্যাসে পরিণতি পেল। বলতে গেলে এমন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নিরপেক্ষ গণসেব্য বস্তু বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। গণ-ব্যবহারে তামাক ও হুক্কা, দু-ই মূল্য ও মর্যাদা হারিয়ে সাধারণ ও সামান্য হয়ে ওঠে। তখন তালের গুড়-মাখা তামাক -- বাঁশ, মৃৎপাত্র ও নারিকেল খোল কিংবা কেবল কলিকা-আশ্রিত হয়ে গণদাবি মেটাতে থাকে। তবু কিন্তু গুরুজন মান্যজনের সামনে সেবনের নৈতিক বাধা অপসৃত হল না। আজকের বিড়ি-সিগার-সিগারেটের যুগেও সে-বাধা জগদ্দল হয়েই রয়েছে। আরো অনেক ব্যাপারের মতো তাৎপর্য হারিয়েও মধ্যযুগ এক্ষেত্রেও অনড় হয়ে অবিচল মহিমায় বিরাজ করছে। কাজেই সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তামাক-সেবনের অধিকার-অনধিকার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও পদাধিকারভেদের পরিমাপক। বয়স, সম্পর্ক, যোগ্যতা ও পদবিভেদে এ অধিকারভেদ সর্বস্তরের মানুষের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কথায় বলে : 'মানলে পর্বতের চূড়া, না মানলে ভাঙা নায়ের গুঁড়া', কিংবা 'মানে তো উচ্চ, না মানে তো তুচ্ছ'। আমরা মানি বলেই তামাক-সেবনও নীতি-সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ, শিষ্টাচারের মাপকাঠি এবং স্থান-কাল-পাত্রের আপেক্ষিকতা নির্ভর। ঘরে-সংসারে-সমাজে সর্বত্রই অশনে বসনে আসনে এই অধিকারভেদ আজও গুরুত্ব পায়।

তিন

হুক্কার উদ্ভবেও রয়েছে দেবলীলা ও দৈব দান :

> হুক্কা বানাইতে ব্রহ্মা দিল কমণ্ডুল
> শিবে দিল লিঙ্গ আর ধুতুরার ফুল।

তাতেই হল খোল-নৈচা-কল্‌কে। তারপর জাহ্নবী হলেন জল, কৃষ্ণ দিলেন বাঁশী, বাসুকী স্বয়ং হলেন নল। আর 'রহিল নরিচা যেন ব্রহ্ম সমসর।' রূপ ও মূল্যভেদে হুক্কার নাম হল আলবোলা, ফর্সি, গুড়গুড়ি, ডাবা প্রভৃতি।

হুক্কা টানে টানে বাদ্যের মতো যে-ধ্বনি তোলে, তারও মহিমা-মাহাত্ম্য অশেষ। এক হুক্কার ধ্বনি হরিসংকীর্তন, দুটোর ধ্বনি গঙ্গাস্নানের পুণ্য বিলায়; এমনি করে হুক্কার

সংখ্যাবৃদ্ধিতে কাশী-বারাণসী-গয়া-প্রয়াগ দর্শনের পুণ্য মেলে। ছয়ে মেলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য ; আট হুক্কার ধ্বনিতে স্বর্গ আসে হাতে, আর 'নব হুক্কা হৈলে বিষ্ণু' প্রত্যক্ষ হন।

উৎসবে-পার্বণে-ভোজে সব উপকরণ থাকলেও 'তামাকু রহিত হৈলে কার্য না জুয়াএ।' তামাকুর প্রধান গুণ 'বারেক তামাকু খাইলে শ্রম শান্তি হএ।' ক্ষুধা-তৃষ্ণা-তাপের দুঃখও 'বারেক তামাকু খাইলে সকল পাসরে।' তামাকুর শ্রেষ্ঠ দান— সাম্যভাব। এতবড় সাম্যসংস্থাপক আর কোনো বস্তু নেই। তামাকখোরের—

শুচি অশুচি নাহি স্নান অস্নান
রাত্রি দিবা ভেদ নাহি, নাহি কুলজ্ঞান।
জগন্নাথ দ্বারে নাহি জাতির বিচার।
একজনে আনহ শতেক জনের আহার।
হুক্কার জানিঅ ভাই সেই অভিপ্রায়
এক হুক্কার জলেত শতেক জনে খায়।

তামাক যে কেবল জাত-বর্ণ-ধর্মের ভেদ ঘুচায়, তা নয়— লজ্জা-সঙ্কোচ-শরম আর সংযমও ঘুচিয়ে দেয় :

তামাকু খাইতে লজ্জা নাহি কদাচিত।
বাপে খাএ তামাকু পুত্রে বলে দেও
একটান খাই আমি পাছে তুমি নেও।
বাপের হুক্কা পুত্রে নেয় ভাইর হুক্কা ভাই
তামাকুর লজ্জা জান গুরু-শিষ্যে নাই।

এমন শরম-সঙ্কোচ-সংযম-ভাঙা বলেই 'গোবিন্দ নাম ভুলানো' তামাকের উদ্ভবে 'এহি ভুবন পবিত্র' হয়েছে, হয়েছে ধন্য। আর 'তামাকু খাইয়া সুখী হইল সর্বলোক'।

চার

আঠারো শতকের চট্টগ্রামবাসী কবি আফজল আলি (আনু. ১৭৩৮ – ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর নসিয়তনামায় [মৎ-সম্পাদিত] গাঁজা-তামাকুর ধূম পানের পাপ ও তামাকুসেবীর পরিণাম বর্ণনা করেছেন। এটি সমাজপতি ও শাস্ত্রবিদের পাঁতি-ফতোয়া। নীতিশিক্ষামূলক গম্ভীর রচনা!

মুসলমান হিন্দু আর যত জাতি আর
সকলে করএ ভক্ষণ না করে বিচার।...
আমার আশেক বহু তামাকুত ছিল।
স্বপ্নের মাঝারে আমি বড় ভয় পাইল।
সংসারেত যে সকলে তামাকু পিয়এ
অন্তরে কালির বর্ণ হইয়া আছএ।
তামাকুর পায়রবি করিয়া পঞ্চজন
মুচি হস্তে কতল করিব নিরঞ্জন।
তামাকু যে ক্ষতি করে, যেবা মাখি দিছে,

যে জনে ভরিল হুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে।
আর যে সকল ভক্ষে— এই পঞ্চজন
হিসাবেত 'ছেহা' বর্ণ হইব বদন।
হেনমত স্বপ্ন দেখি বড় ভয় পাইলুম।
তেকারণে মুঞি পাপী তামাকু ছাড়িলুম।
আমল করিয়া বুঝ মুমীন সকলে
রঙ্গিলা ঘরেত ধুঁয়া নিত্য জ্বালাইলে।
কালির বরণ কিবা হএ কি না হএ
হেন জ্ঞান ভাবি কেনে না চাহ মনএ।
কিবা ভাল কিবা মন্দ নাহি বিচারএ
এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ!
শ্বশুরে জামাতা বন্ধু এক নলে খাএ
সেই নলে মাগ খাএ জান সর্বথাএ।
জ্ঞানবন্ত মুসলমান যে সকল হএ
তবে কেন হেন চিজ ভক্ষণ করএ।
তামাকু যে সবে পিএ রুহু 'ছেহা' তার
সে-দোষে না পাইব দেখ রসুল আল্লার।
এ সকল দেখিলাম খোয়াব মাঝার
কোরান হাদিসে চাহ করিয়া বিচার। (পৃ. ২১)

আর স্বপ্ন দেখিলেন্ত গাঁজা যে পিয়ন
সে সবের সর্ব অঙ্গ ইব্লিস বাহন।
সে সবের সঙ্গতি যে মেলা করিবার
নিষেধ করিছে নবী হাদিস মাঝার। (পৃ. ২২)

পাঁচ

আঠারো শতকের কবি শেখ সাদী তাঁর 'গদা-মালিকা' নামের 'তত্ত্ব জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে তামাক সেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন :

গদাএ কহে যেইক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।
অন্য হতে জানিব তামাকু বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে
হাঁটিয়া যাইতে লোক পিব পথে পথে।
পিতায় তামাকু পিতে পুত্র করে আশ
তামাকুতু করিবেক ভুবন বিনাশ।

তা ছাড়া— খাইতে না ভরে পেট মিছা ফাঁক ফুক।
'লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে।'

এটাই সম্ভবত কলিকালের মুখ্য লক্ষণ।

ছয়

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 'পুঁথি পরিচয়'-এর ১ম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় 'গাঁজা ও তামাকু'র একটি গান সংকলিত হয়েছে। গানটির রচয়িতা দ্বিজ (ন্যাড়া) রামানন্দ। "পুঁথি সংখ্যা ১২৪। অখণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১। আকার ৯"× ৩"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। পল্লীকবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত রচনা কৌতুক-রসের কবিতার ভালো ও পুরানো উদাহরণ বলিয়া রচনাটি সবিশেষ মূলবান।" পঞ্চানন মণ্ডল, পৃ. ৬৯।

তামাকু

মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই। ... (ধুয়া)
উঠি অতি নিশি ভোরে হুঁকাটি লইয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।
কয়্যা জাব তনয়েরে মৈল্যে জখন শ্রদ্ধা করে
কুশ পট্যো টেন্যা ফেল্যা
কোঁচর তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই।
দ্বিজ রামানন্দে ভনে স্থান দিয়া শ্রীচরণে
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা জাই।

বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবনে, অভাব-বঞ্চনা-পীড়নক্লিষ্ট মনে তামাক-সেবনের মুহূর্তগুলো শান্তি-সুখের প্রলেপ বুলায়। আর স্বস্থ ও সুস্থ ধনী-মানীকে ধূমপান দেয় স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

গাঁজা

মনের গৌরবেতে চিন্‌লি না রে অরে গাঁজাখোর।... (ধুয়া)
গাঁজার পাতা জলে ভাসে দেখি ভাঙ্গি হাঁসে
আর এক ভাঙ্গি ওরেৎ জাহাদ এইল মোর।
ভাঙ্গা ঘরে সুঞা থাকে গগনেতে তারা দেখে
আর এক ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোর।
রামানন্দ নাড়ায় বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে চক্ষে হয় ঘোর।

[পৃ. ৬৯]

এই নিরুদ্দিষ্ট রসিকতা নেশার বস্তুর মধ্যে কেবল গাঁজা সম্পর্কেই মেলে। যদিও গাঁজা

'কারণ বারি'র মতোই পবিত্র ও সাধন-সহায়। কেননা গাঁজা মহাদেব-সেব্য। তামাকের অর্বাচীন উদ্ভব তাকে দেবভোগ্য হবার সৌভাগ্য ও সম্মান থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

শান্তিদাসের *হুক্কাপুরাণ* 'সমুদ্র মথনে যবে গেল দেবগণ' তখন 'পঞ্চম মথনে জন্মে তামাকুর বিচি।' এখানে কেবল গদাধর নন, তামাকুর বিচি 'দেবগণে হরিলেক যার যেই রুচি।'

এভাবে,

তামাকু হইল দেখ পৃথিবীর সার
গাঁজা-ভাঙ-ধুতুরা তবে হইল অবতার।

এবং

নেশাখোর নেশা খাএ সবার বিদিত
তাহার যে নিন্দা করা হএ অনুচিত।

কেননা

নেশাখোরকে বাখানিছে আপনি শঙ্কর
তাহাকে যে নিন্দা করে কেবল বর্বর।

যদিও অবশ্য

নেশাখোরে নেশা খাইয়া হএ হতজ্ঞান
আপনার স্ত্রীকে দেখে মাএর সমান।
মাকে গালি পাড়ে আর বাপকে বলে শালা।

এবং

বাপে তামাকু খাএ পুত্রে বোলে দেঅ

আর

জামাতা তামাকু খাএ চাহেন শ্বশুরে।

সিত কর্মকারও হুক্কা তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তা শান্তিদাসের দেয়া বিবরণের মতোই। যথা :

ব্রহ্মা দিল কমণ্ডলু হুক্কার কারণ
শিবে দিল শিবলিঙ্গ নৈচার গঠন।
সঙ্গে ধুতুরার ফুল করে সমর্পণ
সেই ফুলে কল্কি গোটা করে আরম্ভন।...
নৈচা শিবলিঙ্গ হৈল যেন শিলাস্তম্ভ....
আপনে জাহ্নবী দেবী হুক্কার ভিতর....
শ্রীহরি দিলেন বংশী নল বানাইতে...
বাসুকী হইল দেখ গন্ডার স্বরূপ।

উপসংহারে কবি বলেন :

ভারতে জন্মিয়া যেবা তামাকু না খাএ
অন্তকালে সেই পাপী স্বর্গেত না যাএ।
পরলোকে জন্ম হএ শৃগাল উদরে

'হুক্কা হুক্কা' বলি ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে।

অতএব, উভয় পুরাণে তামাকু-দ্বেষী মানুষের পরিণাম-চেতনা অভিন্ন। তবে তামাকু সেবন না করেও স্বর্গের প্রত্যাশা করা যায়, যদি 'তামাকু পুরাণ এই শুনে কোন জনে' এবং 'এক মনে শুনিলে সে স্বর্গপুরে যাএ।'

অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এক অখ্যাত কবি রামপ্রসাদ-রচিত তামাকু-মাহাত্ম্য-এর পরিচিতি দিয়েছেন। চরণ সংখ্যা ১২০/লিপিকাল ১২০৮ সন তথা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ। অতএব রচনাকাল আঠারো শতকের শেষ পাদ। তামাকুর জন্মবৃত্তান্তে সামান্য পার্থক্য আছে। এখানে বীজশিব-জটা থেকে স্খলিত। আর—

এক হুকা যথা সেহি সালগ্রাম হয়ে
দুই হুকা লক্ষ্মীনারায়ণ
তিন হুকা যেবা দেখে সেহি যায়ে স্বর্গলোকে
কি কহিবা তার পুণ্যফল
চারি হুকা যথা বসি সেহি গঙ্গা বারানসী
সেহি বৃন্দাবন নীলাচল।

তামাকুকে অবজ্ঞা করে সীতা, হরিশ্চন্দ্র রাজা, বলিরাজা, রাবণ, দুর্যোধন প্রভৃতি হৃতসর্বস্ব।

উদ্ধৃতাংশের বিষয়পঞ্জি

অ

অঙ্গীকার-৩০২
অট্টালিকা-২৪৬
অতিথি-৯৮, ১৭৬
অতিথি নিবাস-২৮৬
অতিথি বরণ-১৭৬
অতিথি সৎকার-২৭৪
অদৃষ্ট-১১২, ১৭১, ২১৩
অদৃষ্ট, নিয়তি-২৪৭
অদৃষ্টবাদ-২১৪
অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরের কর্মফল-২৭২
অদ্বৈততত্ত্ব-১৬০, ১৬১, ১৮২, ১৮৩, ৩১৭
অদ্বৈত দর্শন-২১৯
অদ্বৈতবাদ-২৬৫
অনুশোচন মাহাত্ম্য-২০২
অনূঢ়া যুবতী-২৯১
অন্নপ্রাশন-৩০২, ৩২১
অন্নব্যঞ্জন-৩২৫
অন্যান্য আচার-২৭৯
অপক্ক শিরনি-১২৯
অপদেব দৃষ্টি-২৭৪
অবতার-১৭২
অভিজ্ঞান-২৮৯
অভ্যর্থনা-১৭১, ৩০১
অমাত্য সভায় নাচগান-২৪৪
অমানুষ-৯৮
অলঙ্কার-১০৭, ১০৮, ১৭০, ১৭৪, ১৮৮, ২০৪, ২১৬, ২১৮, ২২৬, ২৬৮, ২৮১, ২৯৯, ৩১২, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩১
অশ্বচালনা বিদ্যা-২৫১
অষ্টনায়িকা-২৫৩
অস্পৃশ্যতা-১৩৪, ১৩৮

আ

আউশ ধান্য-১৩৮
আচার-২৮৩
আচার (বর-কনে)-২৭৪
আচার সংস্কার-২১৪
আজিজ মিসির-১৭০
আতশবাজি পোড়ানো উৎসব-২৭৪, ৩৪২
আতিথেয়তা-১৯৫
আত্মজ্ঞানী-৯৭
আত্মনির্ভরশীলতা-১৩৯
আদব-লেহাজ-১৪০
আদর্শ পরিবার-৯৯
আদর্শ সুখের জীবন-২৭১
আদিনাথ-২৬৬
আদ্যপ্রভু-২৬৬
আপ্তবাক্য-৮৪, ৮৬
আপ্যায়ন-১৭৬, ২০৭, ৩০৫
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ-২১২, ২২৫
আব্দুল্লাহ্‌র রূপ-২০৫
আমিষখাদ্য-১৮৭
আযান মহিমা-১৪১
আরাকান রাজ্য-২৩৫
আলাউল-২৩৫
আল্লাহর উক্তি-১৯৮
আশরাফ আতরাফ ভেদ-১৯৩
আশীর্বাদ-২৭২

আশুরা (মূর্তিনির্মাণ)-১২১
আসন-১৭৬, ৩২৭
আসর-৩২৭
আসবাব-১৬৯
আসবাবপত্র-২৬৭
আয়ুবৃদ্ধি-৯৫
আয়ুহ্রাস-৯৫

ই
ইটের গোহারী-২০৩
ইব্লিস-১৮৮
ইমামবিজয়-২১২
ইরানি ঐতিহ্য-২৭৫, ২৭৬
ইসলামি সংস্কার-১৯৭
ইঙ্গলা-২২৮

উ
উচ্চবিত্তের বেশ-ভূষা-২৪১
উজির হামিদ খান-২১৪, ২২১
উৎসব-২৪৯, ২৭৩, ২৯২
উৎসবের আচার-২৯৩
উদ্যান রচনা-৩০৫
উপঢৌকন-২৭০
উপবীত ধারণ অনুষ্ঠান-১৮৭
উপমা-১৬৯, ৩০৫
উপহার-২২৭, ২৬৯
উল্টাসাধনা-১৫৯

ঋ
ঋতু ও রমণ-২৩০
ঋতুস্রাব-১৩০

এ
একাগ্রচিত্ততা-১৯৫
এয়ো-১৮৭

ও
ওস্তাদ-১৬৯

ক
কড়ি-৩৩২
কড়ি ও নাড়ু-৩২৬
কদমবুসি-১৭৭, ১৯১, ১৯৫, ২২৪, ৩০২
কদলীরাজ্যের ঐশ্বর্য-২২৬
কনে বিদায়-১১২, ১৭০, ২০৫
কনে সজ্জা-২৯৪, ৩০৭
কন্যা সম্প্রদান-১৯৪
কন্যর রূপ-২৩২
কন্যাস্নান-২৩১, ২৮১, ৩০৭
কর্পূরতাম্বুল-২৯৫
কবর-১২৬
কবরের বাঁশখণ্ড-১২৮
কবির জীবনবোধ ও ধর্মানুরাগ-২৬১, ২৬২
কর্মফল-১১২, ২১৩
করুণা ও মুক্তিপণ-২০২
কলহ-১১৪
কলিযুগের মানুষ-৩২৮
কলিকালের লক্ষণ-১০২, ১০৩
কয়েদির জীবন-২৭৭
কস্তুরী-২১০
কাজী দৌলত-২৩৫
কাঞ্চুলি-১৯৪, ২১১
কাফন-১২৬
কাফেরনিধন-১৭৬
কাব্যালঙ্কার-১০৫-১০৭
কাব্যিক ঐতিহ্য-২৮৯
কুটনীদূতী-২৯৬
কুদৃষ্টি নজর-২৯১
কুফরী-১৮৮
কুফরী আচার-১২৮
কুমারীর প্রথম ঋতু-১২৪

কুলধর্ম-৯৩
কুলাচার-৯৩, ৯৯
কেশবিন্যাস-৩৯৪
কেশশোভা-২২৬
কোরেশী মাগন ঠাকুর-২৪০
কোষ্ঠী-৩২১
কৌলীন্য, চেতনা (মুসলিম সমাজে)-১৯৩
ক্ষমার অযোগ্য পাপ-১৯৯
ক্ষেমা-১৫৮
ক্ষৌরকর্ম-২২৩

খ
খঞ্জন বাখান-১১৬
খদিজা-১৯৮
খাদ্য-২৪১, ২৭৮, ৩০৫, ৩০৬
খাদ্যবস্তু-১১১, ১৭৬, ৩০৭
খেলা-২৪৬
খোয়াজখিজির-২৯১

গ
গণক-৩০২
গন্ধর্ব-১৯৭
গন্ধর্ববিবাহ-২৯০
গর্ভকাল-১৭৫
গর্ভপাত-১৪৮
গর্ভবতী-৯৭
'গণ' পরিচয়-২৫২
গয়বী ফকির-৩২৮
গায়ে হলুদ-২৯৩
গীতনৃত্য-উৎসব-২৯৩, ৩১১, ৩৩০
গুরু-১৫৭, ২৪৮
গুরু আপ্যায়ন-৩২২
গুরুজন-২৯৫
গুরুনিন্দা-১৯২, ২০২
গুরুবাদ-২২০
গুরুসাধন-১৫৮
গেরুয়া-১২১, ১৩৩, ২১৭, ২৭৯, ৩৩৬, ৩৪১
গোরক্ষবিজয়-২২৫
গো-লাদ-১১৪, ১১৫
গৃহ-৮৭, ১১৬, ২৬৭
গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য)-১১৮
গ্রহ-শান্তি-২৭৪

ঘ
ঘর-জামাইর লজ্জা-২৫৬
ঘর লেপন-১২৩
ঘোমটা-১২৮

চ
চট্টগ্রাম-১৮৯, ২৩৫
চট্টগ্রাম বন্দর-১৮৯
চন্দ্রাবতী-২৪০
চল্লিশ সুখ-১৪৭, ১৪৮
চার অপাত্র-৯৯
চার অভাগা-৯৫
চার কর্ম-৯৩
চার পুণ্যবান-১০১
চারবস্তু-৯৩
চারবেদ-২৪১
চার শত্রু-৯৩
চার স্বর্গবাসী-১০১
চাঁদ-১১৭
চিকিৎসক-২৪৭
চিকিৎসা-২৭৫
চিত্র (হিঙ্গুল ও হরিতাল) অঙ্কন-৩২২
চিন্তামুক্তি-৯৫
চেষ্টা-৯৩
চৈতন্যমত-১৮৯
চৌগান খেলা-২৫১
চৌদ্দ শাস্ত্র-২৪১

ছ
ছড়িদার-১৭৪
ছদ্মযোগী-৩২৫
ছাতা-২১৮

জ
জতুগৃহে-২২২
জন্মউৎসব-৩০৬
জন্মভূমি-২০৩
জন্মরহস্য-২২৯
জন্মান্তর-১৭১
জন্মান্তরবাদ-২১৪
জলসা-৩০০
জলাশয়-২৪৫
জলুয়া-১২১, ১৩৩, ১৯৩, ২৬৩, ২৭৯, ৩৯৫, ৩৩৬-৩৩৯
জলুয়া-গেরুয়া-২৭৩
জাতিভেদ-১২২
জাতিগত আচার-৩১২
জাতিভেদে ধূমপান-১৩৭
জামগাছ-১২২
জায়েনউদ্দীন-২৩৩
জীবন-১৯৮
জীবনবৃক্ষ-১৯৯
জীবে ব্রহ্ম-১৫৮
জুয়া-১৪৬
জ্যোতিষ গণনা-২৪৯
জ্ঞাতিপ্রীতি-২০৩
জ্ঞান-২০২

ঝ
ঝাড়ফুঁক- ১৯২

ট
টঙ্গী-১৬৯, ১৭৫
টোটকা ঔষধ-২৭৫
টোটকা চিকিৎসা-২৫০
টোনা-২৬০, ২৭৫

ড
ডালি-৩২৯

ঢ
ঢুলনী-১৭৩

ত
তকবীর-২০৯
তত্ত্বকথা-২৭৮, ৩২৭, ৩২৮
তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালি-২৪২
তরুণের বৃদ্ধভার্যা-৯৭
তামাক-১৩৭, ৩২৯
তামাকু-১২২, ৩৪৪-৩৪৮
তামাকুপুরাণ-৩৪৪-৩৫১
তাম্বুল-২১৬, ২৩৭
তিথিলগ্ন-২১৭, ২৭২, ২৯৭
তেলোয়াই-১৯৩, ২০৮, ২৩২
তৈজসপত্র-১৭০, ২৬৭

দ
দক্ষিণদেশী নর্তকীর নৈপুণ্য-২৫১
দম্পতি-৯৭
দশটি চরিত্রদোষ-৩০৯
দরবারি সৌজন্য-২৭২
দস্যুতস্কর-২৩৫
দান-২৬৯
দান মাহাত্ম্য-২৫৮, ২৮২
দানসদকা-২২৩
দানসামগ্রী-২৩৮
দারিদ্র্য-৯৪
দারু-টোনা-১৯২, ২৮৮

দাম্পত্য-১৭৪, ৩০৭
দাস-১৪৫
দাসের কাজ ও খাদ্য-৩২৭
দাসী-১৭০
দাসী-সম্ভোগ-১৪০
দিনের শুভাশুভ-১৪৬
দুশ্চিন্তা-৯৫
দুষ্টমিত্র-৯৮
দুষ্টস্বামী-৯৮
দূতী-২৯৬
দেওতাড়ন-৮৮
দেওপরীরাজ্য-২৯৯
দেবধর্ম-২৩৯
দেবপূজা-১৭২
দেবীর পূজা প্রচার-২২৬
দেশাচার-৩০৬
দেশী উপমাদির ব্যবহার-২৩৪
দেশে ঝড়বৃষ্টির রূপ-২০৩
দেহতত্ত্ব-৩২৪
দেহতত্ত্ব পরিচয়-১৫৫, ১৫৯, ১৮০, ১৮১,২১৯,২২০
দৈবজ্ঞ-১৮৭
দৈববাণী-১৭৭
দ্বৈত-অদ্বৈততত্ত্ব-১৬০
দৌলত উজীর বাহরাম খান-২১২, ২২২, ২২৪

ধ

ধনমাহাত্ম্য-৯২
ধর্ম-১৬৭, ১৬৮
ধর্মাচার-২৭৩
ধর্মশালা-২৬০
ধুতুরা-২২৫
ধূমপান-১৩৬

ন

নজুমগণক-জ্যোতিষী-২৭২
নবজাতক-২৯৮
নবুয়ত-১৮৮
নরপতিগী-২৪০
নরমহিমা-২৩৭
নর্তকী-১৭৬, ২১৫
নর্তকীর সাজ ও অলঙ্কার-২২৭
নহস-১১৭
নাচ-৩০০, ৩৩০
নামকরণ-২৯৮, ৩২১
নারকীর তালিকা-২০০, ২০১
নারদ-১৯৭
নারিকেল খেলা-২৭৩
নারী-১৭৩
নারীর অলঙ্কার-২৫৬
নারীর আব্রু-২৬৬
নারীর আভরণ ও পোশাক-২৮৮
নারীর নাচগান-৩০০
নারীপদ্ম-১১৭
নারীবিক্রেতা-২৪৫
নারীর বিদ্যাচর্চা-২৮৮
নারীর পরিচ্ছদ-২৪৫
নারীমজলিশ-২০৭
নারীর স্থান-২৬৬
নারীশিক্ষা-১৯২
নাবালিকার বিবাহ ও গমনা-২৬১
নাস্তা ও খাদ্য-২৯৫
নিদ্রা-১০২
নির্ধন-৯৪
নিমন্ত্রণরীতি-২৩১, ২৩৮
নিয়তি-১৭১, ২৫৮
নিয়তি মৃত্যু-২৮৩
নীতি-২৮৯, ২৯১
নীতিকথা-২৯১, ২৯৫, ২৯৬
নীতিবোধ-২৭২
নীতিশাস্ত্র-১৭২
নূহনবীর বাণী-১৯৮
নৈতিক চেতনা-২৮৩, ২৮৪
নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য-২৮৬
নৌকা-২৩৬, ২৪৩

নৌকার বর্ণনা-২১১
নৃত্য-১৩৯, ৩২৬
নৃত্যগীত উৎসব-২৪১
নৃপ যাত্রা-২৯১

প

পক্ষী-১৭২
পক্ষী সম্বন্ধে জ্ঞান-২৮৮
পঞ্চ-শব্দ : বাদ্যরহস্য-২৫৩
পত্নীর দায়িত্ব-২৯৫
পদচারণা-১১৮
পদ্মিনী জাতীয়া নারী-২১৬
পরকীয়া সাধন-১৬০
পরিরাজ্য-২৯৯
পরিহার্য পঞ্চজন-৩৩০
পর্দা-১২৪, ২৫৬
পর্দাপথা-১৯১, ২৮৫
পড়শী-১৪৫, ২২৪
পাখি-২৪৫
পাঠ্যবিষয়-৩৪৪
পাতিব্রত্য-২৮৫, ২৮৯
পাতিল ডুবানো অনুষ্ঠান-৩২১
পাথেয়-৩০৫
পাদুকা-২১৮
পান সুপারি-১৭৩, ৩২৫
পাপ ও পাপী-১০০. ১০১
পাপ ও পেশা-৯৮
পারিতোষিক-১৭১
পার্বণ-২৭৩
পাশা-১৩৩, ৩২৪
পাঁচটি ভালো কর্ম-১০১
পাঁচ প্রকার নিদ্রা-১০২
পাঁজি-১৮৭
পিঙ্গলা-২২৮
পিতা-১৭৬
পিতৃভক্তি-১৯১, ১৯৬
পিণ্ডদান-২১৮
পিষুণ-১৪৬
পির গাজী-২২২, ২২৫
পিরবন্দনা-১৭৮, ১৭৯
পুকুর খনন-১৩১
পুণ্য পেশা-৯৮
পুতুল নাচ-১৭৪
পুত্রজন্ম-৯৬
পুত্রস্নেহ-২১৮
পুরুষ-১৭৩, ২১৮
পুরুষের শ্রেষ্টত্ব-৩২৩
পুরুষ পুরাণ-১৬৮
পুরোহিত-১২৩
পুস্পেলিখন-২৮৭
পূজা-১৮৭, ২৫০
পোশাক-১১২, ২১৮, ২০৪
পৌত্তলিকতা-১৭০
পৌরুষগর্ব-২৪১
প্রণাম-২৭১
প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা-২২৩
প্রতীক-১৮৮
প্রত্যুৎগমনে অভ্যর্থনা-২৭৭
প্রথম ঋতুস্রাব-১৩০
প্রশ্ন-উত্তর (বিভিন্ন বিষয়ক)-৩১৫-৩২১
প্রসাধন-১৭৩, ২৩৭, ৩২৪
প্রসাধন ও অলঙ্কার-১১২
প্রসাধনসামগ্রী-২০৪, ২১৮, ২৭৯
প্রসূতি-১২৪
প্রার্থনা-৩০৫
প্রাণের মর্যাদা-২০৩
প্রাসাদ-২৪৬
প্রাসাদ টঙ্গী-২৩৮
প্রেমতত্ত্ব-২৬৫, ৩০৬
প্রেমিক-৩০৬
প্রেমে বিরহীর দশ দশা-২৪৭

ফ

ফল-১৭২, ২৮৬
ফাগ ও কর্দম রঙ-২৭৫

ফাগুয়া-২০৮
ফাতেহা-১৩৬
ফাতেহাখানি-১৩৬, ১৯৫
ফারসি ও হিন্দি কাব্যের প্রভাব-২৮৫
ফুল-১১২, ১৭২, ২৪৫, ২৮৬, ২৯৫
ফুলের নাম-২০১

ব

বকুল বৃক্ষ-২২৬
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ-২২৫
বধূবরণ-১৪২
বধূ-২৯৭
বন্দনা-১৬৮, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪
বণিক-৩০৭
বণিকের মর্যাদা-২৯২
বর-কনের মিলন-২৯৫
বরের যৌতুক-২৯৬
বরকনের শুভদর্শন-২৫৬
বরযাত্রা-২৯৪, ৩০৯
বরবরণ-৩০১
বরসজ্জা-২৯৪, ৩০৭
বরস্নান-২৯৪, ৩২২
বরণডালা-১৩২
বরানুগমন-২১৭
বরের গস্ত ফিরানো-২০৮
বরের গুণ পরীক্ষা-২৯০
বরের পোশাক-২৬৯
বরের বাহন-১৭১, ১৭৪
বরের সাজ-২৬৩
বর্ণবিদ্বেষ-১৯৬, ৩২৩
বলবৃদ্ধি-৯৬
বলি-১৮৭
বলিপ্রথা-১৯০
বসন-১৭০
বস্ত্র-৮৮, ১১৬, ২৬৭, ২৬৮
বস্ত্র-অলঙ্কার-২৮৬
বস্ত্র পরিধান-১৪৪, ১৪৫
বস্ত্র-শাড়ি-২৪৭
বংশগৌরব-১৯৩, ১৯৬
বাউল-বৈরাগীর আধিক্য-২২৩
বাকমাহাত্ম্য-২৭৮
বাজি-২০৮, ২৫৫
বাদ্য-১৭০, ২০৭, ২১৫, ২৩৬, ২৮৪
বাদ্যযন্ত্র-১৭৪, ২১৫, ২৫৫, ২৭০, ২৯২, ৩০০, ৩৪১
বারোয়ারি টোলমাদ্রাসা-১৯২
বাল্যবিবাহ-৩২১
বাসর-১৭৫
বায়ু-১৫৮
বাহন-২৮৪
বিদেশী যোদ্ধা-২৬০
বিদেশী ভীতি-২৮৭
বিদ্যা-১৭৩
বিদ্যার্জনে দেশভ্রমণ-২৫৯
বিদ্যালয়-৩৪৪
বিদ্যাপরীক্ষা-২৭৯
বিদ্যা ও পাঠ্যশাস্ত্র-২৪৪
বিদ্যার বিচার-২৫২
বিদ্যার মাহাত্ম্য-২৮৮
বিদ্যাসুন্দর-২৩১
বিনয়-২৯৭
বিন্দু-১৫৭
বিবাহ উৎসবে বিধবা বর্জন-২৫৪
বিবাহ মঙ্গল-১৭৪, ২০৭
বিবাহানুষ্ঠান-২১৬, ২১৭
বিবাহের আসর সজ্জা-২০৭
বিবাহের বাজনা-১৩১
বিবাহোৎসব-১৯৪, ৩৩১
বিবাহোৎসব ও নিমন্ত্রণরীতি-২৫৪
বিবি হাওয়ার বারমাসী-২০৯
বিভিন্ন দিনে দেহতত্ত্ব-২২৮
বিভিন্ন বিদেশী-২৪৩
বিয়ে-১৪০
বিয়ের আচার-১৭১
বিয়ের খোৎবা-২০৯
বিয়ের পয়গাম-২১৭

বিয়ের বয়স-২৪৭
বিয়ের বাজনা-৩২২
বিয়ের সজ্জা-৩২২
বিলাপ-১২৫
বিষুস্নান-১৩১
বিষুব সংক্রান্তি উৎসব-১২২
বিষ্ণু তৈল-২৩৩
বিড়ম্বিত সত্য-৯৮
বীরব্রত-২০০
বুদ্ধিমান-৯৯
বেদ-১৮৫
বেনামাজি-১৩৪
বেশ্যা-১৭৬
বেশ্যাবৃত্তি-২৭৩
বেশ্যার সজ্জা-৩২৬
বৈদ্যের কর্তব্য-৯৯
বৈরাগীর বেশ-১৭২
বৈরাগী সাধকশ্রেণী-২৪৫
বৌদ্ধ অহিংসবাদ-১৮৭
বৃক্ষ ও ফল-২৪৪
বৃক্ষনাম-২৮৬
বৃক্ষের রূপক-২৬২
বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা-৯৭
ব্রহ্মাণ্ড-২৪৩
ব্রাহ্মণের বেশ-২২৬
ব্রাহ্মণ্যবাদ-২৭৫, ২৭৬

ভ

ভণ্ডযোগী-৩২৫
ভণ্ডফকির-৩২৯
ভবিষ্যৎগণনা ও কোষ্ঠী-২৮৩, ২৯৮ ৩২৯
ভারতিক উপমা-১৮৮
ভিখারির প্রতি কর্তব্য-১৪০
ভিখিরির ভেক-২১৮
ভূতদৃষ্টি-৩০২
ভূমিকম্প-১১৭
ভোজ-২০৬
ভৌতিক সংস্কার-২৫৭

ম

মক্কুল হোসেন-২৩৩
মঙ্গলগান-১৭৪, ২১১
মঙ্গলাচরণ-১৭৭
মণি-পণ্যদ্রব্য-২৪৫
মন্ত্রগুণ-৩১২
মনোহর মধুমালতী-২১০
মন্ত্রমাহাত্ম্য-৩০৪
মরূদ্যান-২১৪
মশা-১১৮
মৎস্য-২৯৮
মহররমের তাজিয়া-১৩৪
মহামুদ্রা-১৫৬
মহালক্ষ্মী ব্রত-১৩০
মাটি দেহতত্ত্ব-২৩৯
মাতাপিতা-১৬৯
মাতাপিতা ও গুরুর সম্মান-২৩৯
মাতৃস্নেহ-২০২
মানৎ-২৮৬
মানুষবিক্রয়-১৭৫
মা-বাপের অসহায়তা-২৫৮
মারফততত্ত্ব-১৯০
মারেফত-২১৯
মারোয়া-১২১, ১৩২, ১৯৩, ২১৭, ২০৮, ২৬৩, ৩০১,৩০৬
মারোয়া নির্মাণ-২৭১
মাংসের ব্যঞ্জন-২৯১
মিত্রতা-৯৮
মিষ্টখাদ্য-১৭৩
মিয়া সাধন (কবি)-২৩৫
মুখাগ্নি-২১৮
মুদ্রা-১৫৬, ১৭২
মুমিনের কর্তব্য-১৯৫
মুসলিম পুরাণ-১৯৫
মুসলিমদের পূজা-১৩০
মুসলিম নারীর অলঙ্কার-২১৩
মুসলিম বিবাহোৎসব-২০৬
মুহম্মদ-১৮৮

মুহম্মদ কবীর-২১০
মুহম্মদ খান (কবি)-১৯৩, ২৩৩
মুহম্মদের সিফত-২৩৫
মূর্তিপূজা-১৯২
মেহদি-২৬৯
মৌলানার পোশাক ও চরিত্র-১৩৩
মৃত স্নান-১২৭
মৃতের আত্মা-১২৭
মৃতের আত্মীয়ের ভোজ্য-১২৭
মৃতের সৎকার-২২৩
মৃত্যুর লক্ষণ-১৯৭

য

যক্ষ-উপাসক-২৫৯
যজ্ঞপূজা-২৭৪
যাত্রার অতিথি-১৪১
যাত্রার শুভাশুভ-২৪৯, ৩০১, ৩০৯
যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র-১০৯, ১১০, ২০৩, ২১২, ১৯৪, ২৩২, ২৩৯, ২৬০, ২৯৬
যুদ্ধবাদ্য-২৫৭
যুদ্ধবিদ্যা-২৭০
যুদ্ধসজ্জা-১৭৬, ৩০৬
যোগ-১৬০, ১৯০, ২১৯
যোগ ও যোগীর প্রভাব-২৬৭
যোগতত্ত্ব-৯৪, ১৫৬, ১৮০
যোগসাধনা-১৭৩, ২৪৭
যোগসিদ্ধ-৯৯
যোগিনী-১৯৭
যোগী-১৮৬, ২১৯, ২৩৭, ২৩৯
যোগিনীচাল-৩১১
যোগী ও যোগসাধনা-২৪৮, ৩২৫
যোগীবেশ-২২৫, ২৪১, ৩২২, ৩২৫
যোগীর অন্ন-২২৯
যোগীর গান-২২৯, ২৩০
যোগীর সাধ্য-২২৭, ৩২২
যোগীর গণনা-২৯৮
যৌতুক-২১৪, ২১৬, ২৬৯,
যৌতুক দান-১৯১, ৩২২

র

রঙ্গরস-২১৭
রক্তখানি দেও-১১৫
রজঃস্বলা-১২৪
রত্নসেন ও শুক-২৫০
রতি ও নারী-৩২৩
রথসজ্জা-১৭০
রণনীতি-২০০
রণবাদ্য-১১১, ২০৯
রমণ-৯৬
রমণবিধি-১৪২, ১৪৩
রসুলবিজয়-২৩১, ২৩১, ২৩৩
রসুলের বাণী-১৯৮
রসুলের বাৎসল্য-২০৩
রাউজান-২৪০
রাজকীয় আড়ম্বর-২৮৯
রাজকীয় নিশান-২৭৩
রাজটঙ্গী-২৯২
রাজদর্শনের কায়দা-১৭৫
রাজনীতি-৮৮, ৮৯, ৯০
রাজপুরুষের বেশ-২৩৯
রাজবেশ্যা-২৮৪
রাজব্রত-২০০
রাজসভা-১১২
রাজবাড়ি-২৯৯
রাজার আদর্শ-২৩৬
রাম-রাবণ-১৯৭
রাহাজানি-১৭২
রূপবতী-১১৩
রূপকথার ব্যক্তিনাম-২৯৯
রোগ-৮৭
রোগপ্রতিকার-১০১, ১১৫
রোসাঙ্গ-২৩৬

ল

লায়লী মজনু-২১২, ২১৩
লোকমান-২৯৯
লোকাচার-১৯৪
লোকশিক্ষা-৩১৪
লৌকিক বিশ্বাস-১৯৫, ২২৫
লৌকিক সংস্কার-১৪১

শ

শক্তিহ্রাস-৯৬
শপথ-২৭৮
শবদাহ-১৯৮
শবস্নান-১২৫
শয্যা১৭৩
শহীদ ও যুদ্ধ-২৬০
শয়ন-১৪৫
শহর-২৯৯
শা'বারিদ খান-২৩১
শামদেশ -২১৪
শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ-২৩৩
শাশুড়ি -৩৯৭
শাস্তি পদ্ধতি-২২৭
শাস্ত্র-২৮৩
শাড়ি-১৯৪
শিকারযোগ্য পশুপাখি-২৯৬
শিক্ষা-৩৪৪
শিব-১৮১, ১৮৪
শিবশক্তি-১৫৮
শিবির-১৭১
শিবের সজ্জা-২৫০
শিরনি-১২৯
শিষ্টাচার-২৯৭
শিক্ষা-২৬৬
শুক্র-১৫৭
শুক্ররহস্য-১৫৮
শুভকর্ম-৮৮
শুভলগ্ন-১৯৪
শুভাশুভ -১৪৬, ৩১৩
শূন্যতত্ত্ব-১৫৫. ১৫৮
শূন্যসিদ্ধি-১৫৯
শেখ ফয়জুল্লাহ-২২৫
শোকাকুলা-১১৩
শৃঙ্গার-২১৪
শ্রাদ্ধ-১৯৫
শ্বশুর-শাশুড়ি-২৯৭

স

সঙ-সজ্জা-২৩৩
সঙ্গম-১৪৮
সঙ্গম রীতি-২৩১
সঙ্গীত-১৪০
সঙ্গীতশাস্ত্র-১৬২-১৬৬
সজ্জা-১৭২, ৩৪২
সত্য-৩০৬
সতীত্ব-২৮৫, ২৯৭
সতীত্ববোধ-২১১
সতীত্ব ও স্বামী-২৬১
সতীময়না লোরচন্দ্রানী-২৩৫
সত্যপীর-২২৫
সত্যপীর পাঁচালি-২২৫
সাদো মঙদার-২৪০
সপত্নীবিদ্বেষ-২৯৭
সমাজে নারী২৯৬
সমাজনীতি-১৭১
সমাজ প্রতিবেশ-২৪০
সমাজে মদ-২২৭
সম্ভোগ-১০৯
সম্মানার্থ প্রদক্ষিণ প্রণাম-২৮৯
সরোবর-২৩৭
সর্বেশ্বরবাদ-২৬৫
সহস্রার-১৫৭, ১৫৮
সহেলা-১৩২, ১৯৬, ২০৭, ২১৭, ২৭৯
সংস্কার-২৭২
সংস্কৃতি-১৭০, ২৪১, ২৭১

সাধনতত্ত্ব-১৬০
সামুদ্রিক ঝড়ের চিত্র-২৪২
সায়রার স্বয়ম্বরসভা-২০৫
সিদ্ধি ভক্ষণ-৩২৫
সিন্দূর-১৮৭, ১৯৭
সুখ-১৪৭, ১৪৮
সুশাসন-২৭৭
সূতিকা আচার-১২৯
সুফিতত্ত্ব-১৬৯, ১৯৭
সুফিবাদ-২১৯
সুফিমত-২১৯
সুফি সাহিত্য ও তত্ত্ব-১৪৯, ১৬১
সূর্যপূজা-১৮৭, ১৯৭
সৃষ্টি ও স্রষ্টাতত্ত্ব-১৬০
সৃষ্টিতত্ত্ব-২১৯
সেনানী-২৫৯
সৈনিক-১৭৬
সৈনিকের রতিচর্চা-১৩৫
সৈন্যদল-২৪৪
সৈয়দ সুলতান-১৭৭, ১৮৬, ১৮৮
সৌজন্য ও সুব্যবহার-৩১২
সৌর সম্প্রদায়-১৮৭
স্নান-২৯৩
স্নান বাখান-১১৬
স্নানের উপকরণ-২৮৪
স্ত্রী-আচার-১২৪
স্ত্রীশিক্ষা-২৪৭
স্বপ্ন-১৪৫
স্বপ্ন বাখান-১১৭
স্বয়ংবর-১৭৭
স্বাজাত্য-২৫৯
স্বামী-২৫৮
স্বামীশাসন-২৮৮

ষ

ষট অগ্নি-৯২
ষষ্ঠীপর্ব-৩২১
ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম-২২৪
ষোলোশত নারীর ঐতিহ্য-২২৫

হ

হযরত মুহম্মদ মহিমা-২০০
হরি-১৮৫
হাজামত-১১৭
হাজারা-১৯৯
হাটের বর্ণনা-২৪৫
হানিফার দিগ্বিজয়-২৩১
হামশা নৃপতির দুর্নীতি-২০৪
হার্মাদ দৌরাত্ম্য-২৪৪, ৩০৭
হালচাষ সংসার-১৩৫, ১৩৬
হালপালন-১২২
হালুয়া তৈরি-৩৩৩
হিন্দুঐতিহ্য-১৮৮
হিন্দু কনেসজ্জা-২৫৬
হিন্দুকন্যা সমর্পণ-২৫৬
হিন্দুপুরাণ-১০৩, ১০৪, ১৮৮, ২১৪, ২২৪, ২৮৫, ২৯১
হিন্দুপুরাণে সতীত্ব-২৬১
হিন্দুপুরাণের ব্যবহার-২৭৭
হিন্দু পুরোহিতের প্রভাব-১৩৭
হিন্দুর পার্বণিক পূজাচিত্র-২০৪
হিন্দু বরসজ্জা-২৫৫
হিন্দুবিবাহ-২৫৪
হিন্দুবিদ্বেষ-২৫৯
হিন্দুবীর-২৪১
হিন্দু রাজসভা-২৪৬
হিন্দুসমাজ-২৩৭
হিন্দুয়ানি-১২৯
হিন্দুয়ানি উপমা-২৪৯
হিন্দুয়ানি দাম্পত্য-১৭৪
হিন্দুয়ানি সংস্কারের প্রভাব-১৯৬
হীনমন্যতা-১৮৭
হুক্কা ও হুক্কাপুরাণ-৩৪৪-৩৫১
হোলি উৎসব-১৯০, ৩৩১